আচার্য বিনোবা

বিধুভূষণ দাসগুপ্ত



আচার্য বিনোবা

[শ্রীশিবাজী ন. ভাবের ভূমিকা-সম্বলিত]

[illegible] দাশগুপ্ত

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
সম্পাদক,
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

প্রিণ্টার—শ্রীসূর্যকুমার মান্না
ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩, রাজেন্দ্র সেন লেন
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারী ১৯৫৫—৩৩০০

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬১—৩৩০০

মূল্য—দুই টাকা মাত্র
বোর্ড বাঁধাই—আড়াই টাকা

পরমশ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতীম

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর করকমলে—

আচার্য বিনোবার ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনের কাজে

যিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছেন।

शिवाजी नरहर भावे
गांधीतत्त्वज्ञानमंदिर
धुळे (पश्चिमखानदेश)
- महाराष्ट्र -

श्री. विधुभूषण दासगुप्तजी,

स० न० । आपके प्रूफ्स और पत्र सब मिल गये। मैंने प्रूफ सब तुम्हारे तरफ सुधार कर के भेजे हैं। आशा है अब प्रूफ आपको मिल गये होंगे। फोटो वगैरा यहां कुछ मिल नही रहे हैं इस लिये भेज नही सका। इस लिये क्षमा। भूमिका के रूप मे "दो शब्द" इसी पत्र के साथ भेज दी है। आप पढ़ कर देख लेंगे ही। "दो शब्द" का आप को बंगला अनुवाद करना होगा। "दो शब्द" मैंने डिक्टेट किये हैं। उसमे हिंदी की भूले दिखती हैं वे आपको तकलीफ देंगी नही। आशा है आप स्वस्थ होंगे। यहां सब कुशल।

भवदीय
शिवाजी न. भावे

দুটি কথা

শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত বাংলা ভাষায় পূজ্য বিনোবাজীর জীবনী লিখেছেন। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়ার মতো বাংলা ভাষা আমি জানি। এইজন্য পূজ্য বিনোবাজীর জীবনী (প্রথম সংস্করণ) আমাকে দেখার জন্য শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় দিয়েছিলেন এবং আমি তা দেখেও গেছি। এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে হিন্দী ভাষায় পূজ্য বিনোবাজীর যে কয়খানি জীবনী প্রকাশিত হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলোই দাসগুপ্ত মহাশয় দেখেছেন। ঐসব গ্রন্থে যে সকল ত্রুটি ছিল তা যাতে এই গ্রন্থেও না থাকে তার জন্য আমি তাঁকে বললাম।

প্রকৃতপক্ষে মহাপুরুষদের জীবনী লেখা হোক—এটাই একটা ত্রুটিপূর্ণ বিচার। কেন না মহাপুরুষদের অন্তর-জীবন এতই মহান হয়ে থাকে যে আমরা যত ভাল করেই লিখবার চেষ্টা করি না কেন পূর্ণ ন্যায় করা কখনও সম্ভব হয় না।

কিন্তু জনসাধারণের চিত্তে মহাপুরুষদের সগুণ-স্বরূপ এতই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে যে এ না হ'লে তাদের চলেই না। এই রকম পরিস্থিতিতে বিধুভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় এই জীবনী গ্রন্থ লিখে বাঙ্গালী জনসাধারণের যথেষ্ট সেবা করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

নিজের সীমার মধ্যে থেকে বিধুবাবু যা-কিছু লিখেছেন তাতে গ্রহণ যোগ্য বস্তু অনেক রয়েছে। লোকে মহাপুরুষদের পূজা ক'রে থাকেন, কতক পরিমাণে করা উচিতও বটে; কিন্তু তাঁদের উপদেশের সামান্য অংশও যদি অনুসরণ করা হয় তবে তা হয়ে ওঠে 'মহাপূজা'।

বাংলা দেশ প্রাচীনকাল থেকেই ভক্তি ভাবনায় অগ্রসর। শ্রীবিধুবাবু পূজ্য বিনোবাজীর এই জীবনী রচনা ক'রে সকলের জন্য যে মহাপূজার অবকাশ এনে দিয়েছেন, আমরা সকলে যেন সেই সুযোগ গ্রহণ করি।

মহাদেব-মন্দির, ধুলিয়া — বিনীত

২৬-২-৬১ — শিবাজী নরহর ভাবে

নিবেদন

'আচার্য বিনোবা'র প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল পূজ্য বিনোবাজীর প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে শুভাগমন উপলক্ষে—১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী। তখন তাড়াতাড়িতে ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে যা-কিছু লেখা পাওয়া গিয়েছিল তা অবলম্বন করেই প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

তারপর দীর্ঘদিন চলে গেছে। প্রথম সংস্করণের বই নিঃশেষিত হয়ে গেছে অনেক দিন আগে। পাঠকদের কাছ থেকে ক্রমাগত তাগিদ এসেছে কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে ৫ বছর কেটে গেল। এই বিলম্বের প্রধান কারণ এই, আমার মনে হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার আগে একবার বিনোবাজীর সম্বন্ধে ভাল ক'রে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর ছাপার কাজে হাত দেওয়া উচিত।

সে সুযোগ এসে গেল ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। বিনোবাজীর কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া গেল যে ভূদানের কাজে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য ও বিনোবাজীর কাছে সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কর্মীদল তাঁর সঙ্গে পদযাত্রায় ঘুরবে। বাংলাদেশের একটি দলের সঙ্গে আমিও গেলাম জঙ্গম বিদ্যাপীঠে যোগদান করবার জন্য, মহীশূরের ধারওয়ার জেলায়। সেবার তাঁর সঙ্গে ৮ দিন থাকার সুযোগ হয়েছিল, অবশ্য এর আগেও একবার তাঁর সঙ্গে পদযাত্রা করেছি, তা ছিল চাণ্ডিল সর্বোদয় সম্মেলনের (১৯৫৩) পর মানভূম জেলার পদযাত্রা। সে সময় তাঁর সঙ্গে ১৫ দিন থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তাঁর হিন্দী ভাষণ বাংলা ভাষায় তর্জমা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু সে সময় জীবনী লেখা সম্বন্ধে কোন কথা ওঠেনি। সেইজন্য সেই দৃষ্টিতে তখন কোন কিছু লক্ষ্যও করা হয়নি।

এবার আমি তাঁর জীবন কাহিনী সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে লাগলাম। পূজ্য বিনোবাজীর একান্ত সচিব শ্রীদামোদরদাস মুন্দরা কিছু কিছু বাংলা

জানেন। তাঁকে আমি প্রথম সংস্করণের বইখানা পড়ে শোনাই। তিনি কিছু কিছু সংশোধন ক'রে দেন এবং বইখানার খুব তারিফ করেন। তিনি এই বইটি বাংলাভাষায় নাগরী লিপিতে ছাপার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁর কাছ থেকে বিনোবা জীবনের যতটা সংবাদ পাওয়া গেছে তা নিয়েছি। এই সময় বিনোবাজীর পদযাত্রায় আমার সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীকুন্দর দিবাণও ছিলেন। তিনি কিশোর বয়স থেকেই বিনোবাজীর কাছে আছেন, তিনিও বইখানি দেখলেন।

বিনোবাজীর সঙ্গে আমাদের মণ্ডলীর শিক্ষাকাল সমাপ্ত হ'লে অন্যান্য কর্মীরা দেশে ফিরে এলেন কিন্তু আমি গেলাম বিনোবাজীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রীবালকোবাজীর কাছে—উরুলি কাঞ্চন (পুণার নিকট)। তাঁর কাছে কয়েকদিন থেকে যতটা পেরেছি বিনোবাজীর বাল্যজীবন ও পূর্ব পুরুষদের খবর নিয়েছি। বালকোবাজী বললেন,—'ছোটবেলার কথা আমার বেশী মনে নেই, আপনি আমাদের ছোট ভাই শিবাজীর কাছে যান। তিনি 'ধুলিয়া' আছেন, তাঁর কাছে অনেক খবর পাবেন। বালকোবাজী (বিনোবাজী সম্বন্ধে) তাঁর একটি মারাঠী লেখার হিন্দী অনুবাদ পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

বালকোবাজীর নির্দেশমত আমি শিবাজীর কাছে গেলাম। তাঁর কাছেও কয়েকদিন থাকলাম। তিনি বাংলা মোটামুটি ভালই জানেন ; তিনি তাঁর ছাত্রদেরও বাংলা পড়ান। আমার বইখানা আদ্যোপান্ত শুনে তিনি ছাত্রদের বললেন—আজ তোমরা আসল বাংলা শুনলে। এতদিন আমার কাছে যা শুনেছ তা ছিল 'মারাঠী বাংলা'। যাক্ তিনি বইখানির যে সব জায়গায় সংশোধন ও পরিবর্ধন করা প্রয়োজন তা ক'রে দিলেন। আমি বললাম—আপনি যে সব সংশোধন করলেন—তাতো আমি অনেক হিন্দী-ইংরাজী বই থেকে সংগ্রহ করেছি। আমার বইয়ে ঘটনার ব্যতিক্রম দেখলে পাঠক তো আমার লেখাই ভুল মনে করবে। তিনি

তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন—আমি লিখে দেব। বই যখন ছাপাবেন তখন আমাকে প্রুফ পাঠাবেন—আমি প্রুফও দেখে দেব আর ভূমিকাও লিখে দেব। শিবাজীর কাছ থেকে আমি তাঁর পিতৃদেবের একখানা ফটোও পেলাম। তা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হ'ল। আশাতিরিক্ত পুরস্কার লাভ ক'রে সেখান থেকে আমি সেবাগ্রাম ও পওনার গেলাম। সেখানেও আমি বিনোবা জীবনের তথ্যাদি জানবার জন্য বাবাজী মোঘে, গোপালরাও কালে, দত্তোবা দাস্তানে, ভাউ পানসে প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করলাম। প্রত্যেকের কাছে যেটুকু যা পেয়েছি টুকে নিয়েছি। সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে তথ্যাদি দিয়ে উপকৃত করেছেন।

এইসব মাল-মসলা নিয়ে আসার পরও সময়াভাবে বহুদিন বইখানা ছাপান সম্ভব হয়নি। এ বছর বিনোবাজীর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে পদার্পণ উপলক্ষে বইখানা ছাপার বিশেষ তাগিদ আসতে থাকে।

পূজ্য শিবাজী ভাবেকে আমি নিয়মিতভাবে প্রুফ পাঠিয়ে গেছি এবং তিনিও দেখে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। কিন্তু পোষ্ট অফিসের কারণেই হোক কিম্বা অন্য কোন কারণেই হোক কোন কোন প্রুফ সংশোধিত হয়ে আসতে বিলম্ব হওয়ায় ছাপার কাজ পূর্বেই শেষ করতে হয়। সেইজন্য পরবর্তী সংস্করণের জন্যও কিছু কিছু সংশোধন রয়ে গেছে।

সন্তপুরুষের জীবন অগাধ সমুদ্রের মতো। পূজ্য বিনোবাজীর মতো মহান সন্ত ও মহাজ্ঞানী পুরুষের জীবনী রচনার ব্যাপারেও যতই পরিশ্রম করা হোক না কেন তা সামান্যই হয়ে যায়। কিন্তু মহাপুরুষের জীবনী রচনা যেমন দুঃসাধ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদও বটে। এই জীবনী রচনাকালে আমি তা বারবার অনুভব করেছি।

বিনোবাজীকে আমার অনেকবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, বাংলা তথা ভারতের বহু লোকেরই তা হয়েছে। কিন্তু যতবারই দেখেছি ততবারই তাঁকে নতুন লেগেছে। মহাপুরুষগণ নিত্য-বিকাশশীল।

প্রথম যখন তাঁকে দেখি ১৯৫২ সালে সেবাপুরীতে তখন তাঁকে মনে হয়েছে আগুণের মতো প্রখর, কাছে যাওয়ার সাহস হয়নি—দূর থেকে দেখেছি। তারপর তাঁকে দেখলাম চাণ্ডিলে রোগমুক্তির পর। সে সময় তো সর্বোদয় সম্মেলনের পর ১৫ দিন সঙ্গেও ছিলাম। খুব কাছে থেকে তখন তাঁকে দেখেছি। তখন তাঁকে মনে হয়েছে হিমালয়ের মতো বিশাল ও দুরধিগম্য। তারপর তাঁকে বুদ্ধগয়ায়, পুরীতে ও দক্ষিণ ভারতে দেখেছি। কালাডি (কেরল) সম্মেলনের সময় তাঁকে মনে হয়েছে সমুদ্রের মতো ভয়ঙ্কর। তারপর দীর্ঘদিন পর তিনি বাংলা দেশে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করলেন। এবারও তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। এবার মনে হয়েছে তিনি গঙ্গার মতো পাবন—অনায়াসে কাছে যাওয়া যায়, অবগাহন করা যায়, পান ক'রে পরিতৃপ্তও হওয়া যায়। এখন তাঁর রূপ পরিপূর্ণ প্রেমের রূপ। বাংলাদেশে এবারকার তাঁর পদযাত্রা সত্য-সত্যই 'পরিপূর্ণ প্রেমযাত্রা'।

বিনোবাজী এ যুগের বিস্ময়—এ যুগের শ্রেষ্ঠ আচার্য তিনি। বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের তিনি সমন্বয় করেছেন। তিনি যে সর্বোদয়ের আদর্শ প্রচার করেন তার বিশ্লেষণ ক'রে তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান+আত্মজ্ঞান= সর্বোদয়। এই সর্বোদয় আদর্শের তিনি মূর্ত প্রতীক। তাঁর এই মহান চরিত-কথা ভাষায় প্রকাশ করার দুঃসাহস পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের মতোই অসম্ভব। তবুও এই প্রচেষ্টার দ্বারা যদি কোন জিজ্ঞাসুর কোমল চিত্তে মহাপুরুষের সৎপ্রেরণা লাভ হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

সুসাহিত্যিক অশোক গুহ মহাশয় এই দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদনায় আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন, এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

১লা বৈশাখ, ১৩৬৮
৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

নিবেদক
বিধুভূষণ দাসগুপ্ত

সর্বোদয়-সাহিত্য

আচার্য-বিনোবা

১।	গীতা প্রবচন	১·৫০
২।	স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন	১·৫০
৩।	শিক্ষা বিচার	৩·৫০
৪।	প্রেমময় বাংলা	১·৫০
৫।	সাধনা	·৫৬
৬।	স্বরাজ-শাস্ত্র	·৭৫
৭।	গ্রামে-গ্রামে স্বরাজ	·২৫

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

৮।	ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন	১·২৫
৯।	গ্রামদান	১·০০
১০।	যাত্রার পথে	·৯০
১১।	শান্তি সেনা	·৫০
১২।	কে এই বিনোবা	·৩০

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

১৩।	ভূদান-যজ্ঞ ও সর্বোদয় সমাজ	·২৫
১৪।	বিনোবা	১·০০

শ্রীনির্মল কুমার বসু

১৫।	গান্ধীজী কি চান	·৭৫

শ্রীমাখন লাল গুপ্ত

১৬।	মহাজীবন	·৪০
১৭।	সারথি	·৪০

বিষয়-সূচী

সোনার সিঁড়ি	...	...	১
আদিকথা	...	...	৯
বিজ্ঞান-সাধক পিতৃদেব	...	...	১৫
মার মতো মা	...	...	২১
কিশোর বিনায়ক	...	...	২৮
কলেজ জীবন	...	...	৩৭
পথের সন্ধানে	...	...	৪৪
আশ্রমে	...	...	৫৩
দাদার যোগ্য ভাই	...	...	৬৬
সবরমতী আশ্রমে	...	...	৭১
আশ্রম পরিচালক	...	...	৮২
সত্যাগ্রহী বিনোবা	...	...	৮৭
আশ্রম জীবনে বিভিন্ন প্রয়োগ		...	৯৫
লবণ সত্যাগ্রহ	...	...	১০০
গ্রামের পূজা	...	...	১১২
গঠনকর্মী বিনোবা	...	...	১২২
সংগ্রামের প্রথম সৈনিক		...	১২৭
গান্ধীজীর দেওয়া ভার	...	...	১৩৭
কাঞ্চন-মুক্তির সাধনা	...	...	১৪৩
সর্বোদয়ের পথে	...	...	১৪৮
ভূদান-যজ্ঞ	...	...	১৫৫
পদযাত্রায়	...	...	১৬৬

প্রেম যাত্রা (বাঁকুড়ায়)	…	…	১৮২
প্রেম যাত্রায় মেদিনীপুর	…	…	১৯১
ক্রান্তি যাত্রা	…	…	২০৬
কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর		…	২২০
ডাকাত অধ্যুষিত অঞ্চলে	…	…	২২৭
ইন্দোরে বিনোবা	…	…	২৩৯
আসাম যাত্রা	…	…	২৪৫
ভারতের শিক্ষাদাতা সংকটত্রাতা		…	২৫৬
আচার্য-বাণী	…	…	২৬৭

যাত্রীদল চলে…

ঘুরে ঘুরে মরে।

তিমির রাত। দিকে দিকে শুধু আঁধার। সেই আঁধারে তারা ঘুরে ঘুরে মরে। বুকে তাদের সাধ—এই তিমির পার হয়ে আলোর রাজ্যে গিয়ে পৌছবে।

প্রভাতের আলো যেখানে ঝলমল করে, যেখানে পাখারা গায় আনন্দে গান। যেখানে শুধু শান্তি—আকাশে-বাতাশে শুধু অনাবিল শান্তি—সেই রাজ্যে তারা পৌছতে চায়। কিন্তু কি করে পৌছবে তারা? তারা যে ভুলে গেছে পথ। তাদের যে নেই মশাল, নেই মশালচী।

তবু তারা চলে। আলোর স্বপ্ন তাদের চোখে, মশাল আর মশালচীর কামনা তাদের বুকে।

তাই তো তারা এগিয়ে যায়। আলোর খোঁজে ছুটে চলে। মনে আশা, এই বুঝি তিমির টুটল, বুঝি আগামীর দুয়ার খুলে গেল।

কিন্তু তিমির তো টোটে না, ঘুরে মরার তো শেষ হয় না। আলোর আশা মরু-মায়ার মতো দেখা দিয়ে পালিয়ে যায়।

আশা নেই, আশা মিলিয়ে যায় ছলনায়, আগামীকাল আগামীকালই থেকে যায়। তারা ফিরে যায়।

কোথায় ফিরে যায়?

অতীতে।

যুগ যুগ আগেকার অতীত, সে অতীত সোনার অতীত। স্বর্ণযুগ। সেদিন পাহাড়ের পাদদেশে, নদীতীরে, গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে জীবন ধারা বয়ে যেত। মাটি ছিল তাদের মা, আর সেই মায়ের সেবা করে তারা ধন্য হতো। মা বসুন্ধরা তাদের বিলিয়ে দিতেন শস্য। ছিল মুক্তবায়ু, মুক্ত প্রাণ—আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।

সেখানেও ছিল সমাজ। আর সে সমাজে সবাই ছিল সমান। ঋষি কবি তাই গেয়ে উঠতেন—

সমানি প্রপা সহ অন্নভাক্
সুভূত ধরণী।

সমান পানীয়, সমান অন্ন
মোদের পৃথিবী হবে যে ধন্য।

ধন্যই ছিল সেদিনের পৃথিবী। শস্যেভরা ছিল মাঠ, মানুষ ছিল স্বাধীন। কেউ ছোট, কেউ বড় ছিল না। তাই তারা সেদিন বলতে পারত—

আমরা মানুষ, আর মানুষই সত্য। তাই তো আমাদের পৃথিবী সত্য, শিব, সুন্দর।

কিন্তু সত্য, শিব, সুন্দর পৃথিবীতে একদিন ভরে উঠল মিথ্যা আর অমঙ্গল।

যে মানুষ ছিল ভাই-ভাই সে লোভে হল ঠাঁই-ঠাঁই। আবার লোভ থেকেই এল অন্যকে শাসন করার সাধ, শোষণ করার প্রবৃত্তি। সাম্য ছিল পৃথিবীতে, এল অসাম্য। এল বিভেদ।

যারা এই পাপ নিয়ে এল, তারা বললে, আমরা বড়, তোমরা ছোট। আমরা মহান, তোমরা হীন। আমাদের হুকুম মানতে হবে। আমাদের সেবা করতে হবে।

চমকে উঠল মানুষের দল। তারা প্রতিবাদ জানালে।

কিন্তু সে প্রতিবাদ শুনবে কে! লোভে তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে পাপীর দল। তারা হিংসার স্রোত বইয়ে দিলে, রক্ত-স্রোতে ভেসে গেল সুন্দর পৃথিবী। মানুষের সমান অন্নের ভাগ ছিনিয়ে নিলে, কেড়ে নিলে তাদের পানপাত্র, তাদের লাঙলের ফলা। চুরমার হয়ে গেল তাদের তকলী, তাদের চরখা। তারা হলো সর্বহারা। মানুষ হলো মানুষের দাস।

আশা বুঝি নেই! কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ তো আশ। তাই আশা করে নির্জাতিত মানুষের দল, তাদের নিজেদের মাকে আবার তারা ফিরে পাবে, নিজেরা আবার নিজেদের মালিক হবে। তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলেন দু-একজন মহাপুরুষ। তাঁরা এসে বলেন—

শোনো নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ; তোমাদের জন্য মুক্তির পথ খোলা। ধনী সেখানে ঢুকতে পারবে না।

আশায় তারা উন্মুখ হয়ে ওঠে।

কিন্তু হায়রে ভাগ্য! মহাপুরুষকে ধনীর দল পরায় কাঁটার মুকুট, ক্রুশে বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করে।

আবার হতাশা ঘিরে ধরে সর্বহারাদের—তারা আপন মনে শুধায়,

তিনি তো হত, তিনি তো মৃত—আর কে আমাদের পথ দেখাবেন? পথের সন্ধান দেবেন?

মনই উত্তর দেয়, যিনি হত হলেন অত্যাচারীর হাতে, তিনিই পথ দেখাবেন। যিনি মৃত, তিনিই অমৃত এনে দেবেন।

কি করে দেখাবেন পথ, কি করে এনে দেবেন অমৃত?

তাঁর বাণী তো তিনি রেখে গেছেন। তাঁর মন্ত্র তো দিয়ে গেছেন আমাদের। সেই বাণীই পথ দেখাবে। সেই মন্ত্র, অভয় মন্ত্র, অমৃত মন্ত্র হবে।

যাত্রীদল আবার চলতে শুরু করে।

বছরের পর বছর চলে যায়, যায় যুগের পর যুগ। অসাম্য আরো প্রবল হয়ে ওঠে, বিভেদ আরো বেড়ে যায়। আসে হিংসার তাণ্ডব। মারণাস্ত্র শানায় লোভী মানুষের দল। আগুনে বোমা, আণবিক শক্তির উল্লাসে গর্জন করে ওঠে। মানুষ মরে। কিন্তু থামে না সেই উন্মত্ত শক্তির গর্জন, এক সর্বনাশের পর আর এক সর্বনাশের হুমকি দেয়। বলে, ধ্বংস চাই, আরো ধ্বংস চাই!

যাত্রীদল কেঁদে ওঠে, বলে, কি উপায় হবে? কোথায় সেই সোনার

সিঁড়ি, যার ধাপের পর ধাপ পার হয়ে আমরা গিয়ে পৌঁছব সাম্যের যুগে—সত্যের যুগে ?

সে সত্যের যুগ কি ছিল অতীতে—না, সে আছে ভবিষ্যতে ?

রামরাজ্য তো সেকালে ছিল, ভবিষ্যতে কি আবার দেখা দেবেঁ ?

পুরাণ বলে, সে যুগ ছিল সেকালে।

সেকাল আমরা কি করে ফিরে পাব ? হতাশ হয়ে শুধায় যাত্রীরা।

পুরাণ বলে, চলে যাও অতীতে, বর্তমানের ঘড়ীর কাঁটাটা ঘুরিয়ে দিলেই তো হয়।

সে তো মৃত্যু—যাত্রীরা চীৎকার করে ওঠে।

মৃত্যু তো আমরা চাই নে, আমরা চাই জীবন—আমরা চাই বাঁচতে।

হতাশ যাত্রীদল।

মশালের আলোয় আলো করে আসেন সাম্যবাদী। বলেন, আমি তোমাদের সোনার সিঁড়ির সন্ধান দেব।

কোথায় সে সিঁড়ি, যাত্রীরা কলরবে মুখর।

সে সিঁড়ি আমাদেরই হেফাজতে—আমরা সেই সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে তোমাদের নিয়ে যাব। আগামীর সোনালী দিনে গিয়ে পেঁছিবে তোমরা। সেই তো সত্যের যুগ, সাম্যের যুগ। সেই তো রামরাজ্য। সেখানে শোষণ নেই, সেখানে পীড়ন নেই। সেখানে সবাই সমান।

দাও—সেই সিঁড়ি এনে দাও! অধীর আগ্রহে চীৎকার করে ওঠে যাত্রীদল।

সাম্যবাদী বলেন, সে সিঁড়ি তো বিপ্লবের রক্ত মাথা—সে সিঁড়ি পাততে হলে রক্ত দিতে হয়, রক্ত নিতে হয়। খুনের বদলে খুন দিয়ে তার ধাপ তৈরী করতে হয়। তবে তো সে সিঁড়ি পাতা যায়।

রক্তের নাম শুনে শিউরে ওঠে যাত্রীরা।

সাম্যবাদী বলেন, শিউরিয়ে উঠলে কেন সাথীরা! উপায়টা তো বড় কথা নয়, তার সফলতাই বড় কথা।

যাত্রীরা উত্তর দেয়, না-না, রক্ত নয়, খুন নয়, অন্য কোন উপায় থাকে তো বল! আমাদের সোনার সিঁড়ি রক্তে ভেজা জমিতে পাতা হবে না, মানুষের মৃতদেহ দিয়ে তার ধাপ তৈরি হবে না।

সাম্যবাদী বলেন, রক্তপাতের পরেই হবে নব-জীবনের প্রাণ সঞ্চার, রক্ত দেখে ভয় পেলে চলবে কেন বন্ধুরা!

যাত্রীরা হতাশ হয়ে বলে, রক্ত আমরা দেখেছি। রক্তের পথে কখনও মুক্তি আসতে পারে না। রক্তে রক্তের লোলুপতা বেড়েই যায়। দাস মানুষ আরও দাস হয়। ও গোলকধাঁধাঁর পথে আমরা যাব না।

সাম্যবাদী বলেন, তাহলে আমি নিরুপায়।

যাত্রীরা আবার চলতে শুরু করে। শ্রান্ত হয়ে বলে, আমাদের এ যাত্রার কি শেষ নেই? কেউ কি আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে না?

আমি পারি, আর একজন এগিয়ে আসেন।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়া দেখে যাত্রীরা।

এ কি মানুষ! একি সৌম্য মূর্তি! চোখে তাঁর অপার করুণা, ওষ্ঠে তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা, অধরে তাঁর মধুর হাসি। তাঁকে দেখে বেদীর উপরে আসীন আচার্য বলে মনে হয় না, মনে হয় তিনি তাঁদেরই একজন। তিনিও পদাতিক, তিনিও যাত্রী।

আশায় ভরে ওঠে মন, যাত্রীরা কোলাহল করে ওঠে—দাও, বলে দাও সেই পথের সন্ধান! আমরা তো চাই সেই পথ।

মরার পরে স্বর্গলাভের কথা যাঁরা বলেন, আমি তাদের দলে নই। মারার পরে স্বর্গলাভও আমার কাম্য নয়। আমার সত্যের যুগ সেকালে নয়, আগামী কালেও নয়, আমার সত্যের যুগ একালে—বর্তমানে।

আমি সেই সত্যের যুগ, ন্যায়ের যুগ, সাম্যের যুগ, একালেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই—আর তার জন্যে এনেছি এই সিঁড়ি?

যাত্রীরা বলে—দেখি, দেখি তোমার সিঁড়ি!

সবাই অবাক হয়ে বলে, এ সিঁড়ির যে একটি মাত্র ধাপ! এই এক ধাপ পার হয়েই পৌঁছব সত্যের যুগে, সাম্যের যুগে?

সন্দেহ-সংশয়ে দুলে ওঠে তাদের বুক।

দৃঢ়কণ্ঠ শোনা যায়—সন্দেহ করোনা, সংশয়ে আচ্ছন্ন হোয়ো না। হাঁ, আমার এ সিঁড়ির মাত্র একটিই ধাপ। এ বড় সোজা—আবার বড় কঠিন ধাপ। মালিকানা বিসর্জনের ধাপ। তোমাদের যার কাছে যা-কিছু আছে, সব বিসর্জন দিতে হবে, বিলিয়ে দিতে হবে, মিলিয়ে নিতে হবে। সাগরের দিকে চেয়ে দেখ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু এক হয়ে কি বিশ্বপ্লাবিনী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। কেমন দুলে দুলে তালে তালে চলেছে সব। মিলে মিশে আছে তাই তারা বড়। পৃথক হতে চাইলেই যাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে। পৃথক হয়ে, ক্ষুদ্র হয়ে কেউ থেকো না, বৃহৎ হ'তেও কেউ চেয়ো না। সকলের সঙ্গে সমান হয়ে যাও। সাম্যের আগুনে সব দীনতা সব হীনতা পুড়িয়ে দিয়ে এস আমরা মহৎ হয়ে উঠি। এস আমরা সকলে মিলেমিশে এক বৃহৎ পরিবার গড়ে তুলি।

যাত্রীরা একে অন্যের দিকে তাকায়। উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তাদের মন।

সাম্যযোগী বলতে থাকেন—আমরা কেউ ছোট নই, কেউ বড় নই, আমরা সকলে অমৃতের পুত্র, ভূমাতার সন্তান।

এস ভাই, যার ভূমি আছে, ভূমি দাও! যার শ্রমশক্তি আছে, সে সেই শ্রম দাও। যার বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, সে তাই দাও! এস—সব বিলিয়ে দিয়ে আমরা একাকার হয়ে যাই। ভেদাসুরের বিনাশ হলেই আসবে শিবের মঙ্গল করস্পর্শ। তুষ্ট হবেন অন্নপূর্ণা। সুভূত হবে ধরণী। এই তো আমার সোনার সিঁড়ি, এই তার একটিমাত্র

ধাপ—আর এই সেই ধাপ পার হবার অমৃত মন্ত্র। পারবে—সে ধাপ পার হতে!

পারব—পারব, আমরা অমৃতের পুত্র—ভূমাতার সন্তান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালিকানা নিয়ে পৃথক হয়ে থাকব না আমরা, মিলে যাব জন-সমুদ্রের মধ্যে, দুলে-দুলে কল-কল ছল-ছল করে আমরা এগিয়ে যাবো।

মানুষটির হাতের মশাল জ্বলে উঠল, সহস্রগুণ তেজে। তিমির দূরে গেল।

যাত্রীরা বলে উঠল, তুমি আমাদের গুরু, আমাদের ক্ষুদ্রত্বের মোহ তুমি দূর করে দিয়েছ। তুমি আমাদের নেতা, আমাদের সোনার সিঁড়ির সন্ধান দিয়েছ। আমরা ভূত চাইনে, ভবিষ্যৎ চাইনে, আমাদের বর্তমানের সত্যের যুগে নিয়ে চল! জয় হোক তোমার!

না, না, আমার জয় নয়, বলে উঠলেন মানুষটি। বল—জয় হোক মানুষের! জয় হোক চিরজয়ী—সত্যের।

যাত্রীদল গেয়ে ওঠে—

কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো
পাগল ওগো, ধরায় আস।

আদিকথা

মহারাষ্ট্র

পর্বতে ঘেরা রাজ্য। মারাঠা জাতির আবাসভূমি।

তারই এক ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম গাগোদেঁ।

গ্রামের তিন দিকে পাহাড়, একদিকে নিবিড় বন। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চলে গেছে গিরি পথ। সেখানে ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের কত স্মৃতি। মারাঠার গৌরব গাথা মিশে আছে গিরি কন্দরে কন্দরে, বনানির লতায় পাতায়।

এই গাগোদেঁ গ্রামে থাকেন একঘর কোঙ্কণী ব্রাহ্মণ। উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ, মহামানী। পেশোয়াদের কাছ থেকে ইনাম পেয়েছিলেন এই গ্রাম। ইংরেজ না আসা পর্যন্ত এ গ্রাম তাঁদেরই ছিল।

এই বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন শিবাজীরাও। মহারাষ্ট্রের নেতার নামে ছিল তাঁর নাম। তাঁরই ছেলে শম্ভুরাও। তিনি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে দিলেন, যৌবনে গ্রহণ করলেন বানপ্রস্থ। কৌপিন পরে মৃগচর্মে বসে কোটেশ্বর মহাদেবের পূজো করতেন। গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন তিনি। তাঁর পায়ে আপনা থেকেই মাথা লুটিয়ে পড়ত মানুষের। শুধু কি তাই, চিকিৎসা বিশারদও ছিলেন তিনি। কিন্তু বলতেন, ওষুধের কোন গুণ নেই, ভগবানকে ডাকলেই ওষুধে গুণ যুক্ত হয়।

তাঁর নাতি বালকোবা বলেন, "তাঁর নাড়িজ্ঞান ছিল অসাধারণ বিনামূল্যে তিনি করতেন চিকিৎসা। দিনে একবার মাত্র আহার করতেন। এই ভাবে সাঁইত্রিশ থেকে বিরাশী বছর অবধি তাঁর কাটল। তারপরে তিনি মারা গেলেন। সেটা ছিল ১৯২৩ সাল।

শম্ভুরাও মানুষটি ছিলেন আত্মভোলা। পূজা-অর্চনা নিয়েই থাকতেন। জাত-বিচারের বালাই ছিল না। সমাজে যারা ঘৃণিত, অবহেলিত, যারা অচ্ছুৎ, তাদের ডেকে এনে জড়ো করতেন, খাওয়াতেন। বলতেন, যাদের খাবার নেই তাদেরই তো খাওয়াতে হয়। যাদের ঘরে প্রচুর খাবার তাদের খাইয়ে কি লাভ! আবার কখনও তাদের ডেকে বলতেন—নে, নে, পূজো কর্! এই ঠাকুর তো তোদেরই।

একবার তিনি এক কাণ্ড করে বসলেন।

এক মুসলমান গায়ক এসেছেন গ্রামে। তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন কোটেশ্বরের মন্দিরে, ভজন গাইতে ফরমায়েস করলেন মন্দিরে বসে।

গায়ক গাইতে লাগলেন।

এদিকে গ্রামে রটে গেল—শম্ভুরাও মন্দিরে মুসলমান ঢুকিয়েছেন। গোটা গ্রামের মানুষ ছুটে এল। সবাই বলে—ছিঃ ছিঃ; এ কি করেছ ঠাকুর! মুসলমান ঢুকিয়েছ মন্দিরের মধ্যে। ও যে বিধর্মী!

শম্ভুরাও উত্তর দিলেন—ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান। সকলেই তাঁর সন্তান—তাঁর কাছে না আছে হিন্দু না আছে

মুসলমান, না আছে ধনী না আছে গরীব। এই মুসলমান গায়কও তাই। কাজেই আমি কোন অন্যায় করেছি বলে মনে করিনে। গ্রামবাসীরা জানত শম্ভুরাও খাঁটি ঈশ্বরভক্ত, তাঁর কাছে কোন ভেদাভেদ নেই ; তাই তারা যে যার বাড়ী চলে গেল। অন্য কেউ যদি একাজ করত তবে গ্রাম তোলপাড় হয়ে যেত।

শম্ভুরাওয়ের নিষ্ঠাও ছিল অসামান্য। টাট্‌কা ঘি আরতির জন্য রেখে বাসী ঘি খাবার জন্য ব্যবহার করতেন।

শম্ভুরাও ব্রত-উপবাসও খুব পালন করতেন। চান্দ্রায়ণ ব্রতের সময় শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস মাত্র খেয়ে ব্রত আরম্ভ করতেন ও পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতি দিন একগ্রাস করে বাড়িয়ে যেতেন। আবার কৃষ্ণ প্রতিপদের দিন থেকে এক গ্রাস করে কমিয়ে অমাবস্যার দিন এক গ্রাসে ফিরে আসতেন। চান্দ্রায়ণ ব্রতে চন্দ্রোদয় দেখে ও তাঁর পূজো দিয়ে তবে আহার করার নিয়ম। চাঁদ তো আর রোজ একই সময়ে ওঠে না, কোন দিন সন্ধ্যায় কোনদিন মধ্য রাত্রে আবার কোনদিন বা শেষ রাত্রে। চাঁদের পূজোর সময় ঘরের ছেলেমেয়েদের ডাক পড়ত। সবাই চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে চাঁদ দেখত পূজা-আরতি দেখত তারপর প্রসাদ গ্রহণ করত। এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করে নাতি বিনোবা বলেছেন 'আমার মধ্যে যদি কিছু পবিত্রতা থাকে তো তা পেয়েছি আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে। এ তাঁর বড় দান! বড় উপকার!'

শম্ভুরাও সারাদিন কোটেশ্বরের মন্দিরে পূজা অর্চনায় নিমগ্ন

থাকতেন। কখনও বিগ্রহের সঙ্গে কথা বলতেন কখনও কাঁদতেন কখনও বা হাসতেন। শম্ভুরাও এমনই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

কিন্তু শম্ভুরাও নিজে বানপ্রস্থ গ্রহণ করলেও তার ঘর ছিল জনে ভরা। আছেন স্ত্রী গঙ্গাবাঈ আর তিন ছেলে—বড় ছেলে গোপাল রাও মেজো নরহরি বা নরহর পন্ত ও ছোট গোবিন্দ রাও। নরহর খুব বুদ্ধিমান ছেলে। তিনি শুধু সংস্কৃতই শিখলেন না, এণ্ট্রান্স পাশ করে কলেজে ভর্তি হলেন ; কিন্তু বাপ শম্ভুরাও ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী, তাই নরহরকে পড়া ছাড়তে হলো। তিনি শিখতে লাগলেন বয়নশিল্প—টেকস্‌টাইল টেক্‌নোলজি।

বড় ভাইয়ের আগেই বিয়ে হয়ে ছিল, এবার নরহরের বিয়ে দিতে হবে। বিয়ের পাত্রী ঠিক হয়েই ছিল।

কর্ণাটক প্রদেশ, আজকাল যার নাম মহীশূর—সেই মহীশূরের ধারওয়ার জেলার তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে জামখণ্ডি গ্রাম। সেই গ্রামে আছেন সঙ্গীত বিশারদ বলবন্ত রাও, তাঁরই মেয়ে বেণু তাঈ। শুধু সঙ্গীতজ্ঞই নন, তিনি আবার কর্ণাটকের রাজবৈদ্য। তাঁর সঙ্গে শম্ভূরাওয়ের মিতালি, সেই সুবাদে তাঁর মেয়ে বেণুকে তিনি দিয়েছিলেন কোটেশ্বরের মন্দিরে সেবার কাজে। কথা ছিল, নরহরের সঙ্গে বিয়ে হবে।

বিয়ে হয়ে গেল নরহরের তখন ৯ বৎসর বয়স। বেণু তাঈ এলেন শম্ভুরাওয়ের পরিবারে বধূ হয়ে। শ্বশুরালয়ে এসে নাম হলো রুক্মিণী বাঈ বা রখুমাঈ। রূপে গুণে অতুলনীয়া তিনি।

বাপ নিজে শিখেছিলেন অনেক কষ্ট করে গান। ছেলে-

বেলায় ইন্দোরে গিয়ে গুরুর কাছে নাড়া বাঁধেন। তারপরে ভৃত্যের মত ফাই-ফরমায়েস খেটে মরেন, গান আর পান না। এই নিয়ে গুরুপত্নী অনুযোগ করেন, গুরুকে বলেন—আপনি এই ছেলেটিকে দিনরাত কেন খাটাচ্ছেন, আপনি একে তো কিছুই শেখাচ্ছেন না। দেশে গিয়ে এ কি বলবে? গুরু তবুও নীরব। বলবন্তরাও মুখবুজে কাজ করে যান। অবশেষে ইন্দোরের রাজা হোলকারের একদিন নজরে পড়লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখানে কি কর, কদ্দিন হয় এসেছ? কি কি গান শিখেছ? উত্তরে বলবন্তরাও বললেন—আমি নতুন এসেছি, এখনও বিশেষ কিছু শিখতে পারিনি। নীরব সেবা কর্মের ফল পেলেন বলবন্তরাও। হোলকাররাজ গুরুকে বলে দিলেন—ছেলেটি খুবই চমৎকার, একে তাড়াতাড়ি গান শিখিয়ে দিন।

অল্পদিনের মধ্যেই সংগীতে পারদর্শী হয়ে উঠলেন বলবন্তরাও।

মাতামহের কথায় নাতি বালকোবা বলেন—বলবন্তরাও কতবড় সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সে সম্পর্কে 'ভারতীয় সঙ্গীত' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রে কি গভীর জ্ঞান ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রুক্মিণী বাঈ এহেন বাপের কাছে শিখলেন সঙ্গীত। দেবতার পূজা আর সঙ্গীত-চর্চা এই ছিল তাঁর শিশুকালের কাজ।

তিনি গাইতেন ভজন, তন্ময় হয়ে যেতেন। সবাই ধন্য ধন্য করত।

রখুমাঈ-এর আর-আর শিক্ষার ভার নিলেন শাশুড়ী

গঙ্গা বাঈ। তিনি ছিলেন সেরা গৃহিণী, ধর্মেকর্মেও তাঁর খুব মন, আবার স্নেহে মায়া-দয়ায়ও কম যান না। স্নেহ যেমন করেন, আবার শাসনও তেমন করেন।

তাঁর লেখাপড়ায় খুব শখ, অথচ অক্ষরটি চেনেন না। শেষে ছেলে গোবিন্দকে ধরে অক্ষর পরিচয় হল। রান্নাঘরের দেয়ালে লিখিয়ে নিলেন অ, আ, ক, খ আর শিখেও ফেললেন অল্প-দিনের মধ্যে। শিবলীলামৃত, পাণ্ডবপ্রতাপ, ভক্তিবিজয় প্রভৃতি পড়ে ফেললেন।

কৌতুকপ্রিয়াও কম ছিলেন না গঙ্গাবাঈ। পাহাড়ি দেশ। জল থাকে কুয়োর তলায়। রুক্মিণী জল তুলতে পারেন না। বড় কষ্ট হয়। গঙ্গাবাঈ এসে পড়েন, বলেন, আয় তোকে এক রকমের নাচ শিখিয়ে দিই! নাচতে-নাচতে ঘড়া তুলে নিয়ে যাবি।

সত্যিই আর ঘড়া তুলতে কষ্ট হয় না। এ যেন এক মজার খেলা। দড়ি বাঁধা ঘড়া ফেলে দেন কুয়োয়, আবার নাচতে নাচতে তুলে আনেন, নাচতে-নাচতে মাথায় তুলে নিয়ে চলে যান।

৮৫ বৎসর বয়সে গঙ্গাবাঈ কাশীতে দেহত্যাগ করেন।

বিজ্ঞান-সাধক পিতৃদেব

নরহর পন্ত আধুনিক রুচির শিক্ষিত মানুষ। গণিতে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, হিন্দী জানেন, মারাঠী তো মাতৃভাষা। উর্দুও শিখেছেন। আবার ইংরেজী ভাষায়ও পারদর্শী।



৺নরহর পন্ত

বালকোবা বলেন, বাবা তাঁর ছেলেদের নিজেই পড়াতেন। আমরা তাঁর কাছেই পড়েছি।

ডাইং-এর কাজ শেখার জন্য এক বছর তিনি কারখানায় কাজ করেন। তখন রঞ্জনবিদ্যা (Dying) র গবেষণাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। আবার মজহুর থেকে ম্যানেজার সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। কারখানা ছেড়ে যখন আসেন, সকলের আসতে দিতে ঘোর আপত্তি। তিনি বললেন, রঞ্জন বিদ্যা তো আমি অর্থ উপার্জনের জন্য শিখিনি, শিখেছি জ্ঞান অর্জনের জন্য।

কারখানা ছেড়ে তিনি হলেন বরোদার মহারাজার ব্যক্তিগত অফিসের হেডক্লার্ক। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন, অথচ পদোন্নতি বা বেতনবৃদ্ধির কথা কখনো বলতেন না। তাঁর উপরে ছিলেন একজন মার্কিণী মহিলা। তিনি সবই দেখতেন একদিন শুধালেন—

আপনি এত কাজ করেন, অথচ মাইনে বাড়াবার কথা তো কখনও বলেন না!

নরহর হেসে উত্তর দিলেন, আমি আমার কর্তব্য বুদ্ধিতে কাজ করি। যা পাই, তাইতেই চলে যায়। বেশি টাকার তো দরকার নেই।

ডলারের দেশের মহিলা শুনলেন, শুনে চমৎকৃত হলেন। তিনি নিজে রাজাকে বলে মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

বরোদায় চাকরী করার সময় রুক্মিণী স্বামীর কাছেই থাকতেন। কোন উৎসব বা বিয়ে কিম্বা পৈতের সময় তিনি গাগোদেঁ ফিরে আসতেন এবং কিছু দিন থাকতেন।

পিতার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিনোবা বলেন—তিনি খুব পরিশ্রমী ছিলেন। পরিচ্ছন্নতা ও মার্জিতরুচি ছিল তাঁর মজ্জাগত।

তিনি নিজের কাজে যেমন কঠোর বাস্তবধর্মী ছিলেন তেমনি চাইতেন আমরাও তাঁর মতো হই।

তিনি চাইতেন তাঁর ছেলেরা আধুনিক রীতি অনুসারে চলুক কিন্তু বিনোবা খালি পায়ে ঘুরতেন, বিছানায় শুতেন না, কন্‌কনে শীতেও গরমজলে নয় ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন। এসবের জন্য তিনি কখনও কখনও অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ছেলেদের প্রহারও করতেন। নরহর চাইতেন বিনোবা ইংরেজী পড়ুক, ফরাসী ভাষা শিখুক, লেখাপড়া শিখে বিলেত যাক্‌, জার্মানী যাক্‌, সেখান থেকে বড় ব্যারিষ্টার কিম্বা বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে আসুক।

নিজের জীবনে তিনি যা করতে পারেননি, ছেলের জীবনে তাই দেখতে চাইতেন।

কিন্তু বিনায়কের রুচি ছিল এর বিপরীত। তিনি ইংরেজীর পরিবর্তে মারাঠী পড়তে বেশী ভাল বাসতেন। বুদ্ধি ছিল তাঁর ক্ষুরধার কিন্তু তিনি অর্থ উপার্জনের পথে পা দিতে রাজী হতেন না। তিনি বলতেন—"বাবা ব্রাহ্মণের ধর্ম বিস্মৃত হয়ে বণিকের মতো পয়সার কথাই ভাবেন। আমি ঠিক করেছি, আমি এভাবে নিজের জীবন নষ্ট করবো না।"

নরহর পন্ত বিষয়াসক্ত ছিলেন না কিন্তু তিনি তাঁর বাবা শম্ভুরাওয়ের মতো বিষয়বিরাগী আত্মভোলাও ছিলেন না। তিনি ছিলেন আধুনিক রুচির মানুষ এবং বিজ্ঞানের উপাসক। তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা তাঁর কাছে ধোঁয়ার মতই অস্পষ্ট বোধ হতো। রাজনীতি ও স্বাদেশিকতার দিকেও তাঁর প্রবল

ঝোঁক ছিল। বাড়ীতে নানা রকমের স্বদেশী পত্রিকা রাখতেন এবং খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেগুলো পড়তেন।

পিতার সম্বন্ধে উল্লেখ করে বিনোবা এক জায়গায় বলেছেন—"আমরা তিন ভাই, আমি বালকোবা ও শিবাজী—তিনজনেই আমরা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। এ উদাসীনতা আমরা লাভ করেছি আমাদের পিতৃদেবের কাছ থেকে।"

নরহর অফিসের ছুটির পরেও কাজ করেন, টাইপ করে যান দ্রুত, আবার তাতে ভুলচুকও কম থাকে। অফিসের কর্ত্রী মার্কিণ মহিলাটি বলেন, আপনি অতিরিক্ত সময় কাজ করবেন না। অফিসের পরের সময় আপনার নিজের, নিজের কাজেই তা ব্যয় করবেন। আপনার অতিরিক্ত সময় নেওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি।

নরহর অফিসের কাজ সেরে বাড়িতে এসে আবার নিজের কাজে মন দিতেন। রঞ্জন বিদ্যার গবেষণায় ডুবে যেতেন। খাওয়ার সময়ও ভাবতেন ঐ কথা। খেতে ভুলে যেতেন।

বালকোবা বলেন, "আমরা বলতাম, বাবা, ভাত দেওয়া হয়েছে। তাঁর হুঁশ হোত। তিনি ভাতে হাত দিতেন।"

বাড়ীতে কাপড় কাচাও ছিল তাঁর এক শখ। নানা রকম য়্যাসিড দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করতেন। কিসে কতটা সাফ হয় তার হিসেব রাখতেন। স্কুলের ছেলেমেয়েদের রুমাল রং করে তাতে সূর্যরশ্মি প্রয়োগ করে অ, আ, ক, খ এমন কি নামও তুলে দিতেন।

রুক্মিণী বাঈ মারা যেতে নরহর বড় আঘাত পেলেন। এরপর

তিনি রঞ্জনবিদ্যার গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত চর্চায়ও গভীর মনোনিবেশ করলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় তিনি চারখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ঠুংরী সংগ্রহ তিন ভাগ ও মৃদঙ্গবাজ। সঙ্গীতের পুথির তাঁর ছিল এক বিরাট সংগ্রহালয়। দেশী রং প্রস্তুত প্রণালীরও তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন এবং বিদেশী রংয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখতেন।

স্ত্রী মারা যেতে নরহর আপন সেবার ভার কারো হাতে দিলেন না। নিজের হাতেই সব কাজ করতেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বরোদায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিনোবার কোন এক বন্ধু তাঁকে খবর দেন। খবর পেয়ে বিনোবা ছোট ভাই শিবাজীকে পাঠান বাবার সেবার জন্যে। ধুলিয়া থেকে শিবাজী গেলেন বরোদায়। কিন্তু অসুস্থ হলেও নরহর কারুর সেবা নিতে রাজী হলেন না। শিবাজী সেখানে কয়েকদিন থেকে চলে যান সবরমতী আশ্রমে বেড়াতে। সেখান থেকে তিনি ফিরে এসে দেখেন য়্যাসিডে তাঁর পা পুড়ে গেছে। শিবাজী তাঁকে ধুলিয়ায় নিজের কাছে নিয়ে আসতে চাইলেন। নরহর অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা রাজী হলেন কিন্তু আপন বিজ্ঞানশালা ও লাইব্রেরীটি তিনি সঙ্গে নিলেন। সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা ক'রে ষ্টেশনে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু বয়েম থেকে কিছুটা য়্যাসিড ঢেলে পড়ায় ষ্টেশনমাষ্টার ওসব জিনিস• গাড়ীতে তুলতে দিলেন না। অবশেষে বিজ্ঞানশালার যাবতীয় জিনিসপত্র বরোদা কলেজের গবেষণা বিভাগে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু লাইব্রেরীটি নিয়ে আসা হলো ধুলিয়ায়।

ধুলিয়াতে মাত্র ২১ দিন জীবিত রইলেন নরহর। বিনোবা এসে দেখা করলেন শেষ সময়ে। ধুলিয়াতেই রয়ে গেলেন নরহর চিরদিনের মতো। শরদীয়া পূর্ণিমা তিথিতে তিনি চলে গেলেন অমর ধামে!

ছোট্ট একটি সমাধি তৈরী হলো আর তার উপর উৎকীর্ণ করা হলো—**अवघेची सुखी असावे ऐसी वासना**—অর্থাৎ সকল প্রাণী সুখী হোক্ ইহাই আমার বাসনা।

এই বাসনা নিয়েই নরহর সারা জীবন বেঁচেছিলেন। নিজের সুখের কথা একবারও ভাবেন নি।

ছেলেরা একটির পর একটি সংসার ছেড়ে চলে যেতে লাগল, এ নিয়ে তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—আমার দুঃখ কিসের! যার যা ভাল লাগে সে তাই করুক। আমি মনে করি আমার ছেলেই হয়নি! আমি আমার কাজ নিয়েই তন্ময় হয়ে থাকি।

পিতৃদেবের সংসারের প্রতি উদাসীনতা ও আপন কাজে একাগ্রতা সম্বন্ধে শিবাজী বলেছেন—"আমরা যখন একের পর এক ভাই সংসার ছেড়ে আশ্রম জীবন গ্রহণ করতে লাগলাম বাবা তাতে একটুও বিচলিত হননি বা আমাদের নিষেধ করেননি। আমরা সব কিছু করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছি। তিনি তাঁর বিজ্ঞান সাধনা নিয়েই তন্ময় হয়ে থাকতেন।"

পিতার মৃত্যুর পর তিন ছেলে পিতৃ সম্পত্তির কি করবেন চিন্তায় পড়লেন, কেননা তাঁরা তিনজনেই সংসারত্যাগী—অকিঞ্চন। অবশেষে ঠিক হলো ব্যাঙ্কের ২৭ হাজার টাকা নলওয়ারী

গ্রামসেবা মণ্ডলকে দেওয়া হবে এবং দেশের বাড়ীতে যে ২৫ একরের মতো জমি আছে তাও বিলি করে দেওয়া হবে গ্রামের ভূমিহীনদের মধ্যে।

বালকোবা বলেছেন—আমরা তিন ভাই সেই দানপত্রে সই করে দিয়েছি।

পিতৃদেবের প্রিয় লাইব্রেরীটি ওয়ার্দ্ধায় এনে অখিল ভারত চরখা সংঘকে দান করা হলো।

পৈত্রিক সম্পত্তির এক কপর্দকও গ্রহণ করলেন না বিনোবা কিম্বা তাঁর ভাইয়েরা। অপূর্ব এক কাহিনী রচনা করল ভাবে পরিবার।

মার মতো মা

মার মতো মা। লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু কত মারাঠী ভজন তাঁর মুখস্ত। শাশুড়ীকে গান শোনান রোজ সন্ধ্যায়। শাশুড়ী গঙ্গাবাঈ বলেন—আমার রখুমাঈয়ের মতো এমন ভজন গাইতে কেউ পারে না। তিনি ভজন শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলতেন। রান্নার সময়ও গুণগুণ করে গাইতেন রখুমাঈ। তাই কখনো বা নুনেপোড়া, কখনো বা আলুনি হয় রান্না। বিনায়ক বসে-বসে গান শোনে, ভাবরসে ডুবে যায়।

খাবার সময় ছেলেমেয়েরা গোল বাঁধায়, বলে, মাগো কি নুনে-পোড়া! আবার কখনো বলে, মা একদম আলুনি!

মা বলেন, কেনরে, বিন্যা তো খেয়ে গেল। সে তো কিছু বললে না!

ছেলেমেয়েরা বলে, সত্যি মা, সত্যি!

মা হাসলেন। তিনি জানেন, তাঁরই মতো বিন্যার মন। খাওয়া পরাটা কিছু নয় তার কাছে।

মা সংসারী নন, তাই বলে ছেলেমেয়েদের দিকে নজর আছে। খেতে যাবার সময় রোজ সবাইকে বলেন, যাও, তুলসী গাছে জল দিয়ে এস। তারপর খাবার দেব।

কেন মা? ছেলেমেয়েরা শুধায়।

অন্যকে না খাইয়ে খেতে নেই বাছা। তাইতো তুলসী গাছকে জল খাওয়াতে বলি। তোমাদের যেমন ভাত, ডাল, চাপাটি না হলে চলে না, গাছগুলোরও তেমনি জল না হলে চলে না।

ভিখারী এলে মা ফিরিয়ে দেন না। একদিন দোরে এক ভিখারী এসে হাজির। তার বেশ জোয়ান চেহারা। বিন্যা মার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, মা, এমন জোয়ান ভিখারীকে ভিক্ষে দেওয়া মানে তো কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেওয়া।

বিন্যা তখন বেশ বড়। সে গীতা থেকে শ্লোক আওড়ালে—দেশে কালে চ পাত্রে চ.........ইত্যাদি।

মা বললেন, অতোশতো বুঝিনে বাপু। দুয়ারে যিনি এসে দাঁড়ান, তিনি তো আমাদের কাছে ভগবান। ভগবানকে নিয়ে কি বিচার চলে! আমাদের সে অধিকারই নেই। আমার কাছে ঐ ভিখারীই ভগবান।

বিন্যা এর কোন জবাব খুঁজে পেলে না। বড় হয়ে মার একথা সে বার বার যাচাই করে দেখেছে, কিন্তু মার কথাই তার কাছে সত্যি মনে হয়েছে।

পরের সেবা করতেও মার জুড়ি মেলে না। পড়শীদের কারো বাড়িতে বিপদ, হাঁড়ি চড়াবার মানুষ নেই। তিনি গিয়ে রেঁধে-বেড়ে দিয়ে আসেন। আগে ঘরের রান্না সেরে তবে যান তাদের বাড়ীতে। বিন্যা একদিন মাকে বললে, মা, আমাদের রান্না সেরে তারপর তুমি যাও ওদের রান্না করতে—এটা তো স্বার্থপরের মতো কাজ!

মা হেসে বললেন, না এ বরং পরের স্বার্থ বেশি করে রক্ষা করার মতো কাজ। ওদের রান্না আগে করলে ওরা খাবে ঠাণ্ডা আর তোরা খাবি গরম। কিন্তু এখন তোরা খাস্ ঠাণ্ডা আর ওরা খায় গরম।

বিন্যা এযুক্তি উড়িয়ে দিতে পারলে না।

এমনি কত পরের জন্য করেন মা। বাড়ীতে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। কাঁঠাল পাকলে মা গ্রামের সব বাড়ীতে কিছু কিছু পাঠিয়ে দিয়ে যা বাকি থাকে তাই ছেলেমেয়েদের দেন।

আবার বাড়ীতে কেউ আশ্রিত থাকলে, তাদেরও ঘরের মানুষের মতোই সেবা করেন। বাড়ীতে থাকতেন আশ্রিত একটি লোক। অন্ধ মানুষ। আত্মীয় নন, তবু তিনি ছিলেন পরিবারেরই একজন। ছেলেমেয়েরা তাঁকে আপন কাকা বলেই জানত। কাকাদের জন্য যেটুকু করতেন মা, অন্ধ বলে তাঁর জন্যে তার চেয়ে ঢের বেশিই করতেন। সেই কাকা একদিন

মারা গেলেন। বিন্যা তখন বরোদায়। সে বাড়ী এসে বললে, কই, কাকা মারা গেলেন, তোমরা তো সূতক পালন করছ না? মারাঠী ভাষায় অশৌচকে বলে সূতক।

মা বললেন, তিনি আমাদের আপনজন ছিলেন বটে, কিন্তু রক্তের তো কোন সম্পর্ক ছিল না তাঁর সঙ্গে, তাই সূতক পালন করা হয় নি।

শুনে বিন্যা অবাক হয়ে গেল। এই তার মা! সেইদিন থেকে সে শিখলে, আপন পরের বিভেদ ঘুচিয়ে যে সেবা, সেই তো আসল সেবা।

এমন মা বলেই তো এমন ছেলে। মা-বাপের যেমন শিক্ষা, সন্তানের হয় তেমনি দীক্ষা। সেই শিক্ষা আর দীক্ষা পেয়ে বিন্যা বেড়ে উঠতে লাগল। শুধু বিন্যা কেন, বালকৃষ্ণ আর শিবাজীও তো এমনি মা-বাপেরই ছেলে। দাদার সঙ্গে তাতা আর আবাও শিক্ষা পেয়ে বেড়ে উঠতে লাগল।

ভারী দুরন্ত বিন্যা।

...প্রাণ শক্তিতে উচ্ছল, তাই তো দুরন্ত।

বাপ নরহর ছেলেকে দুরন্তপনার জন্য মাঝে মাঝে প্রহারও করেন। কিন্তু ছেলের দুরন্তপনা কমে না। ভারী জেদী ছেলে, একবার যদি 'না' বলে, শত মারলেও সেটি আর 'হা' করানো যায় না।

কিন্তু এমন দুরন্ত বিন্যা, মার কাছে শান্ত। মার কাছেই থাকে। মাকে গম পিষে দেয়। কখনো বা মার সঙ্গে যায়

মন্দিরে। মা আস্তে আস্তে জল ঢালেন শিবের মাথায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বিন্যা। ভাবে, আচ্ছা, এক সঙ্গে সবটা জল ঢেলে দিলেই তো হয়—এতে তো অনেক সময় যায়।

মাকে শুধালে, মা বলেন, পূজার এই তো নিয়ম।

বিন্যা এবার বোঝে। বিন্দু বিন্দু করে এই যে জল পড়ে, এরই নাম সাধনা। একবারে অনেকটা ঢেলে দিলে তা হয় না।

মনে তার জেগে উঠল ধর্মের প্রতি অনুরাগ। ভক্তি কি তা শিখলে, পড়লে পরম ভক্তদের কথা। মা তো তেমন পড়তে জানেন না। তাই ছেলে পড়ে, তিনি শোনেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিন্যা পড়ে ফেললে শংকরাচার্য, জ্ঞানদেব আর রামদাস স্বামীর রচনা। ভক্তিমার্গ প্রদীপ, ভক্তি বিজয়ও পড়া হয়ে গেল।

বিন্যা বলে, মা, এমন সাধুসন্ত আর একালে দেখা যায় না, তাই না?

মা উত্তর দেন, তা কেন হবে? একালেও সাধুসন্ত আছেন। আমরা তাঁদের চিনতে পারিনে এই যা।

মা ও ছেলে যেন সাথী। ছেলে মার আটা পিষে দেয়, বই পড়ে শোনায়, ফাই ফরমাস খাটে। একদিন গীতার কথা উঠল। মা বলেন, আমাকে গীতা পড়ে শোনাতে পারিস্ বিন্যা? বিন্যা বলে, আমি তো তেমন সংস্কৃত জানিনে।

মার সাধ গীতা পড়বেন। ছেলে একখানা গীতার মারাঠী অনুবাদ কিনে নিয়ে এল। সহজ-সরল নয় অনুবাদ, পড়ে ভাল করে বোঝা গেল না। মা বললেন, বিন্যা তুইই গীতার অনুবাদ

করে ফেল্ না ? ছেলের ওপর অগাধ বিশ্বাস মার। বিশ্বাসের শক্তি কাজ করলো। বিন্যা বললে, মা, আমি বড় হয়ে সরল করে সহজ মারাঠী ভাষায় গীতার অনুবাদ লিখব। মা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, তাঁর স্নেহাশীর্বাদ ঝরে পড়ল।

বিন্যা আজ বিনোবা ভাবে। গীতার অনুবাদ তিনি করেছেন। কিন্তু মা তা দেখে যেতে পারেন নি। তিনি গীতার নাম দিয়েছেন গীতাঈ, গীতা-মা। মারাঠী ভাষায় আঈ মানে মা। গীতার সঙ্গে আঈ জুড়ে দিয়ে মার স্মৃতির তিনি এমনি করেই পূজো করলেন!

পরবর্তীকালে বিনোবা তাঁর গীতার ব্যাখ্যায় বলেছেন, আমি যখন গীতার অর্থ খানিকটা বুঝতে আরম্ভ করলাম, তখনি মা চলে গেলেন। আমার মনে হ'ল—মা আমাকে গীতা-মার কোলে সঁপে দিয়ে গেলেন। মা-গীতা! তোমার বুকের দুধে আজ পর্যন্ত পুষ্ট হয়েছি। এর পরেও তুমিই আমার অবলম্বন।

বিনায়ক মার কাছ থেকে পেল ধর্মে দীক্ষা, সাধক হয়ে উঠল সে। ব্রহ্মচারীর কঠোর জীবন কাটাতে লাগল।

মা বলেন, বিন্যা, বংশে একজন সদ্গৃহস্থ হলে এক পুরুষ উদ্ধার হয়, আর একজন সদ্ব্রহ্মচারী হলে সাত পুরুষ উদ্ধার হয়।

মার কথায় বিন্যা আরো শক্তি পেল, সে হলো কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী। জীবনধারা একেবারে বদলে গেল। পায়ের জুতো খুলে রাখলো, মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দিল, নরম বিছানা ছেড়ে কম্বল পেতে শুতে আরম্ভ করল।

মা শুধালেন, একি—কম্বল পেতে শুয়েছিস্ যে ?

বিন্ধ্য উত্তর দিলেন, মা, ব্রহ্মচারীর তো নরম বিছানায় শোওয়া বারণ।

মা শুনে খুশি হয়ে বললেন, ওরে বিন্ধ্য, ভগবান আমাকে মেয়ে করে গড়েছেন, তাই আমি নিরুপায়। তিনি যদি আমাকে পুরুষ করে পাঠাতেন, তবে দেখতিস্ কত কঠোর জীবন আমি কাটাতাম।

বিন্ধ্য মার দিকে তাকিয়ে ভাবে, সত্যি—মা তা পারতেন বই কি?

মাঝে মাঝে গুরুজনদের কথায় দ্বিধা আসে ছেলের, সন্দেহ দেখা দেয়। বলে অমুকে যা বলছেন তা তো সাধুরা বলছেন না, তারা বরং উল্‌টোটাই বলেন।

মা অমনি উত্তর দেন, যাঁরা সাধুসন্ত তাঁদের কথাই ঠিক। তাঁদের উপরই বিশ্বাস রাখা উচিত। অন্য অনেক লোকের কথায় থাকে সত্য-মিথ্যে মেশানো। ওঁরা সত্য কথাই বলেন।

শুধু ধর্ম নিয়েই পাগল নন মা আর ছেলে। দুনিয়ার সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবরও রাখেন। অচ্ছুৎদের কথা ওঠে মাঝে মাঝে।

মা বলেন, অচ্ছুৎরা তো হীন নয় বিন্ধ্য। যদি তা হোত, তাহলে তাদের ঘরে জন্মাতেন না মহাপুরুষ বিঠোবা।

আবার এক-একদিন ছেলে পড়ে শোনায় লোকমান্য তিলকের কাগজ 'কেসরী'। বলে, মা, তিলক-মহারাজের কাগজ। দেখ, কি লিখেছেন!

মা তন্ময় হয়ে শোনেন সেই অগ্নিময়ী বাণী, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে। ইংরেজ দেশকে করেছে পদানত,

তাকে অত্যাচারে উৎপীড়নে ধ্বংস করছে! আর সেই দেশের জন্য প্রাণ আহুতি দিচ্ছে তরুণের দল। তাঁদের নেতা মারাঠী-বীর তিলক মহারাজ। বিনায়ক পড়া শেষ করে বলে, মা, কেমন লাগল!

মা বলেন, দেশ ভক্তিই ঈশ্বর ভক্তি। কিন্তু তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে ঈশ্বর ভজন। তবে তো সে ভক্তি সার্থক হবে।

বিনায়কের কথাটা মনে ধরল। মনের পটে আঁকা হয়ে গেল।

মার কাছ থেকে এমনি করেই বিনায়ক শিক্ষা পেল, মা হলেন তার গুরু, আবার তার সাথীও।

কিশোর বিনায়ক

এমনি পরিবারে, এমনি পিতার ঔরসে, এমনি মাতার গর্ভে জন্মালেন বিনোবা। ১৮৯৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম হলো। তিনিই প্রথম সন্তান। তাঁর নাম হলো বিনায়ক নরহর ভাবে। মা ডাকতেন বিন্যা। (গান্ধীজীর আশ্রমে যখন গেলেন তখন তিনি আদর করে নাম রাখলেন বিনোবা।) সেই নামেই আজ তিনি পরিচিত। বিনোবার অন্য তিন ভাইয়ের নাম বালকৃষ্ণ, শিবাজী ও দত্তাত্রেয়। আর বোনের নাম শান্তা। দত্তাত্রেয় ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যান। শান্তাও আর ইহলোকে নেই। তাঁর তিনটি মেয়ে আছে। মামাদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই।

কিশোর বয়সে বিনায়ক ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলেন। গুরু-গৃহে বাস নয়। সমিধ আহরণ নেই। তবু আছে অধ্যয়ন-তপস্যা—আছে জীবনের কঠোর নিয়ম পালন।

গাগোগেঁর পাঠশালায় ভর্তি হলেন বিনোবা। দু' বছর পাঠশালায় পড়লেন। তারপর তিন বছর পড়লেন বাবার কাছে বাড়ীতে। বাবা ছিলেন পরম শিক্ষাদানকুশলী। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়নও ছিল যথেষ্ট। আবার ছাত্রও বিনায়ক ভাল। তাই শিক্ষা বেশ তাড়াতাড়ি এগুতে লাগল। সব বিষয়েই ভাল, অঙ্কে তো তাঁর খুবই মাথা। আঁক কষতে ভালও বাসেন।

বাবা মাকে ডেকে বলেন, ওর যা অঙ্কে মাথা, ওকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াব। ও হবে মস্ত ইঞ্জিনিয়ার।

মার চোখ গৌরবে ছলছল করে ওঠে।

বিন্যা এবার একদিন হাই ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে গেল। মাষ্টার মশাইরা তো অবাক তাঁর বুদ্ধি দেখে। তারিফ করেন—ভাষায় জ্ঞান আছে বেশ, আর অঙ্কে তো পণ্ডিতই বলতে হয়। শক্ত শক্ত আঁক মুহূর্তে কষে ফেলে। ওপরের ক্লাসের ছেলেদের আঁকও কষে দিত। অঙ্কের প্রশ্নে পকেট বোঝাই থাকত।

একদিন অন্য বিষয়ের ক্লাসে মাষ্টার মশাই নোট দিচ্ছিলেন। বিন্যা নোট না টুকে তখন আঁক কষতে ব্যস্ত। মাষ্টার মশাই সেটা লক্ষ্য করলেন। নোট দেওয়া শেষ হলে বললেন, তুমি পড় তো কি লিখেছ বিনায়ক? বিনায়কের বিষয়টি জানা ছিল, সে একটা খাতা তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরে গড়গড় করে বলে গেল।

মাস্টার মশাই অবাক হলেন, খাতা দেখতে চাইলেন।

বিনায়ক বললে, ও আপনি পড়তে পারবেন না স্তর।

তিনি তবু খাতা দেখতে চাইলেন। দেখলেন,—সাদা পাতা, কোথাও পেন্সিল বা কালির আঁচড় নেই। তাঁর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল।

বিন্যা এখন বিনোবাজী। আজও তাঁর এমনি স্মরণশক্তি আছে। তিনি বলেন থাকবে না কেন? আমি তো আর নিজের স্বার্থে স্মরণশক্তি ব্যবহার করিনি।

অঙ্কে এখনো তার নেশা। তিনি বলেন, ভগবানের পরে যদি আর কাউকে ভাল বেসে থাকি তো তা এই গণিত-শাস্ত্র।

অঙ্কে পণ্ডিত বলে অন্য বিষয়ে যে আনাড়ি তা নয়। মারাঠী তাঁর মাতৃভাষা তাতেও তাঁর জ্ঞান অসাধারণ। যিনি মারাঠী পড়ান, তিনি বলেন, দুই পেপারে একশোর মধ্যে একশোই পেতে পারে বিনায়ক কিন্তু তা দেওয়ার রীতি নেই। তাই উনপঞ্চাশ ক'রে আটানব্বই দিয়ে থাকি।

স্কুলের পড়াই সব নয়। সে তারপরে লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়ে। আবার সঙ্গীসাথীও তার কম নয়। তাদের সঙ্গে গল্প করে, বলে দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা। আবার রঙ্গরসও করে।

তার মাথায় বড় বড় চুল, হাত-পায়ের নখও বড় বড়। কেউ যদি বলে, কি রে বিন্যা, অত বড় বড় চুল আর নখ রেখেছিস্ কেন?

বিন্যা হেসে বলে, ওঃ তুই বুঝি পরামাণিক, তাই চুল আর

নখের দিকে তোর নজর—তূ ন্হাভী আহিস্ কায় (তুই কি নাপিত) ?

কেউ বা ইংরেজী বিদ্যা ফলাতে যায়। কথায় কথায় ইংরেজী বলে। বিন্যার তা সয় না। সে অমনি ফস্ করে ব'লে ফেলে, তোর মা বুঝি মেম রে—তুঝী আঈ মডম্ হোতী কায় ?

ছেলেরা আর কথা কয়না। দোষ ত্রুটি দেখলে রক্ষে নেই, বিন্যা ঠুকবেই ঠুকবে।

আবার সে বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতেও যায়। নানা বিষয়ে আলোচনা করে। বলে বাংলার কথা। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ভূমি, সেই বাংলাকে দু ভাগ করে দিতে চায় ইংরেজ। তাইত আজ দেশের মানুষ ক্ষেপে উঠেছে। বাংলার কবি বাংলাকে এক করবার জন্যে বাণী দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন ;—

বাংলার মাটী, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
এক হউক, এক হউক—এক হউক
হে ভগবান !

বাংলা গর্জন করে উঠেছে, আর সেই গর্জনে যোগ দিয়েছে মারাঠা ভূমি। তিলক মহারাজ তার নেতা। তাই সে সবাইকে নিয়ে গড়তে চায় এক কিশোর বাহিনী। তার নাম হবে বিদ্যার্থী মণ্ডল। ছেলেরা রাজী হলো—গড়ে উঠল বিদ্যার্থী মণ্ডল। ছেলেরা পড়লে দেশের কথা, দশের কথা। বিনায়ক তাদের নেতা। কিন্তু নিজে হলেন না মণ্ডলের সম্পাদক। বললেন—আমি কোন পদ নেব না। আমি সব কাজেই সাহায্য

করব। আর তা করতেও লাগলেন। মণ্ডলের জন্য ১৬০০ বই সংগ্রহ করলেন আর সে বইগুলো নিজে পড়লেন, বন্ধুদের পড়ালেন, তাই নিয়ে আলোচনাও করতে লাগলেন।

বন্ধুদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেরিয়ে বেড়াতেন বিনায়ক। দেখতেন সুন্দর পৃথিবী। ধূসর সুন্দর মাটি, তারই ওপরে সবুজ ঘাসের বিছানা। গাছ পালাও সবুজ। আর আছে উপরে নীল আকাশ। পৃথিবী মার বুকের উপর দিয়ে চলেছে তারা।

কিন্তু মাঠ শেষ হয়ে যায়, দেখা দেয় গ্রাম। শান্ত জীবনধারা। কিন্তু এ কি শান্ত জীবন! উদাস চোখে গাঁয়ের মানুষ বসে আছে, মুখে শতাব্দীর লাঞ্ছনা আঁকা। এরা তো মানুষ নয়, জীবন্ত নয়, এরা যে মৃত!

বিনায়ক ভাবে, এই কি আমার দেশ—সেই পুবের সোনার পাখী। এ যে পালক-ছাড়ানো পাখী! এই কি আমার দেশের মানুষ? এরা যে কায়া নয়, ছায়া!

অথচ এরা সেই মানুষ যারা একদিন উচ্চচূড় মন্দির গড়েছে, যারা পাহাড়ের পাথরকে রূপ দিয়েছে মূর্তিতে। এরা সেই মানুষ—যাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের বন্যায় নতুন জোয়ার এসেছে এশিয়া মহাদেশে—সারা বিশ্বে।

কেন এমন হ'ল? কে এমন দশা করলে?

ইংরেজ—ইংরেজ!

তারা বিজয়ী, আমরা তাদের শিকার।

আমাদের নিয়ে তারা পুতুল খেলে।

হিন্দুকে মুসলমানের, মুসলমানকে হিন্দুর, রাজাকে রাজার

বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। আর আমরা তাদের ফাঁদে ধরা পড়ি।

এই ত ইংরেজ, এই ইংরেজের দেশে গিয়ে সে হবে ইঞ্জিনিয়ার। কাকে সেবা করবে? ইংরেজকে? সাহেবকে?

বিন্যা বন্ধুদের বলে সব কথা। বলে, ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টি ক'রে আমাদের এমনি দশা করেছে। এই বিভেদ তো সব চেয়ে খারাপ। অথচ আজকের দুনিয়ার এই তো রীতি। ধনী দরিদ্রে বিভেদ, উঁচু নীচুতে বিভেদ, ছুঁৎ আর অচ্ছুতে বিভেদ। এই বিভেদের অর্থ ভালবাসারই অভাব। ভালবাসার অভাব হ'লে আসে মৃত্যু! ভাবতে ভাবতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে তার কণ্ঠ—

মা আমার! দেশ আমার!

তুমি কি মরে গেছ? না, না, মরনি তো।

না, না, মৃত নও তুমি। আমি তোমার সন্তান, আমি তো এখনো জীবন্ত।

বন্ধুদের বলে, আমরা সবাই জীবন্ত, শুধু ঘুমে বিভোর হয়ে ছিলাম। আমাদের জাগিয়ে তুলেছেন তিলক মহারাজ।

বন্ধুদের নিয়ে ফিরে আসে, ছোটে লাইব্রেরীতে। বসে বসে পড়ে ভারতের যত কাব্যকাহিনী, পড়ে নানা দেশের ইতিহাস। মনে আগুন ধরে যায়। ভাবে, না, না, ও বিপ্লব আমদানী করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের বিপ্লব, দেশী নেহাইয়ে দেশী হাতিয়ার দিয়ে গড়ে-পিটে তুলতে হবে।

কিন্তু কে সে বিপ্লবী!

বিনায়ক প্রার্থনা করে, হে রঘুপতি রামচন্দ্র ! দাও সে বীরকে পাঠিয়ে, তোমারই মতো দু'বাহুতে থাকুক তার অমিত শক্তি। সে প্রতিশোধ নিক, মুক্তদাতা হিসেবে আসুক ! আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ুক ! আমরা তো শুকনো কাঠ, সে ক্রোধের আগুণে আমাদের দাউ দাউ ক'রে জ্বালিয়ে তুলুক !

আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, আহা সেই বীর যদি আমি হতাম !

বিপ্লবের আগুণ তার বুকে। সে মেতে ওঠে, সবাইকে মাতিয়ে তোলে এক অপূর্ব উন্মাদনায়।

এক সাহেব বিনা অনুমতিতে তাঁবু খাটিয়েছে এক বন্ধুর জমিতে। বন্ধু এসে বলে, জান বিন্যা, তাঁবুটা ফেলে দিয়েছি উপ্‌ড়ে।

বিন্যা খুশি হয় না, বলে, তাঁবুর মালিককে বাদ দিলি কেন ?

এমনি তার ঘৃণা ইংরেজের প্রতি, এ ঘৃণা শুধু মাত্র বিদ্বেষ নয়, এ ঘৃণা অন্তরের আগুণে পুড়ে পুড়ে খাঁটি। এ এক শক্তি ! বিন্যা সেই শক্তি পেয়েছে।

শিবাজী জয়ন্তী এসেছে। মারাঠার নব জাগরণের ঋষি ছত্রপতি, তাঁরই জয়ন্তী উৎসব পালন করবে দেশের মানুষ। সুদূর বাংলা থেকে মহারাষ্ট্র ভূমি পর্যন্ত সেই উৎসাহে অধীর। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠেছেন—

মারাঠীর সাথে আজি
হে বাঙালী এক কণ্ঠে বল
জয়তু শিবাজী।
মারাঠীর সাথে আজ
হে বাঙালী এক সঙ্গে চল
সে মহোৎসবে সাজি।

তাই আজ সারা মহারাষ্ট্র আর বাংলার ঘরে ঘরে উৎসব। বিন্যা বন্ধুদের জড়ো করে বলে, আমরাও শিবাজী উৎসব পালন করব।

বন্ধুরা রাজি। কিন্তু কোথায়, কি ভাবে হবে উৎসব?

বিন্যা উত্তর দেয়—কেন, ঐ পাহাড়ের তলায় গহন বনে! ঐখানে বসেই আমরা উৎসব করব, দেয়াল ঘেরা হলঘরে নয়।

যে কথা সেই কাজ।

অমনি ইস্কুল পালিয়ে সবাই এসে জুটল পাহাড়ের তলায়। শিবাজী উৎসব পালন করা হ'ল।

পরদিন ইস্কুলে মাস্টার মশাই সবাইকে শুধালেন, কাল তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

বিন্যা উত্তর দেয়—আমরা কাল বনে শিবাজী জয়ন্তী পালন করতে গিয়েছিলাম।

—কেন? ইস্কুলেই তো করতে পারতে।

—গোলামখানায় বসে কি শিবাজী জয়ন্তী পালন করা যায়?

মাস্টার মশাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ব'লে উঠলেন—তোমাদের সবাইকে চার আনা করে জরিমানা করলাম।

বিন্ধ্যা আগেই সবাইকে একটা করে সিকি সঙ্গে আনতে বলেছিল। সেই সিকি তারা টেবিলের ওপর ফেলে দিলে। মাস্টার মশাই ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

ইস্কুলের পড়া এমনি করেই শেষ হয়ে এল। বিন্ধ্যা অনেক বেশি এগিয়ে গেল। সে পড়লে মহাকবিদের কাব্য, পড়লে ইতিহাস, দর্শনের বই! ম্যাট্রিক পরীক্ষা এবার ঘনিয়ে এল। সব বিষয়ই জানা, শুধু ফরাসী ভাষাটাই রপ্ত নেই। বইগুলোও একবার ছুঁয়ে দেখে নি বিন্যা। বইগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলে, আর তাতেই ভাল ভাবে পাশ করে গেল।

পরবর্তী সময়ে বিনোবা বলেছেন, আমি ইস্কুলে এক মুহূর্তও নষ্ট করিনি।

সেকথা ঠিক। তা না হলে কি এত পড়তে পারতেন! শুধু তাই নয়, স্কুলজীবনের এই অভ্যাস তিনি সারা জীবনে ত্যাগ করেন নি। তাইত তিনি বহু ভাষায় পণ্ডিত, বহু শাস্ত্রজ্ঞ মণীষী!

এবার এল আর এক জীবন। জীবন দেবতা তাকে নিয়ে চলেছেন, কৈশোরের পালা শেষ হ'ল। এবার যৌবনের দিন। জীবন দেবতা তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন কে জানে!

কলেজ জীবন

বিনায়ক ভর্ত্তি হ'ল কলেজে।

ঘর ছাড়ার ইচ্ছে ছিল, হ'ল না। মামুলি জীবনের গণ্ডী ভাঙার সাধ ছিল, তা হ'ল না।

কলেজে তার প্রচুর নাম। গণিতে তার মাথা দেখে বিস্মিত হলেন অধ্যাপকগণ। দুরূহ সব গণিতের প্রশ্ন আসতে লাগল বিনায়কের কাছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন! বিনায়ক তবু অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে না। দু পকেট বোঝাই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায়।

কিন্তু শুধু আঁক কষা নয়, আছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। অগ্নিযুগ যে স্বাধীনতার কামনা বুকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, সে স্বাধীনতা আনতে হলে চাই চিত্ত-শুদ্ধি। বিপ্লবীদলের সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল। তাদের সঙ্গে সে নিজের মিল খুঁজে পেল। এরা তারই মত ভাবে। বিদ্যার্থী মণ্ডলও জাঁকিয়ে উঠল।

নিস্তব্ধ দুপুরে গোপনে বসতে লাগল বৈঠক। সে বৈঠকে একদিন বিনায়ক বললে বিপ্লবের ঋষি ম্যাৎসিনির কথা। ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডী তখন বিপ্লবের ঋষি ও পুরোহিত, তরুণ ভারতের প্রাণে তাঁরা আগুণ জ্বালিয়ে তুলেছেন। সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলে। এমন উদ্দীপনা কোথা থেকে এল বিনায়কের মনে। এমনি তো সে শান্ত মানুষ। কিন্তু শান্ত হলে কি হবে, বিপ্লবের আগুণ তাকে স্পর্শ করেছে, তার মনকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি ক'রে তুলছে।

আজকের বিনোবাজীকে দেখে সেদিনকার সেই তরুণ

বিনায়ককে কল্পনাও করা যায় না। এখন তাঁর বাণী শান্ত, গম্ভীর।

বিনায়ক বৈঠক বসায়, কলেজে যায়, বিপ্লবীদের সঙ্গে মেশে—আবার ছুটে ছুটে যায় বরোদার বিরাট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে।

সেদিন ছুটির দিন। গরম কাল। বিনায়ক জামাটি কাঁধে রেখে আদুল গায়ে বসে বসে পড়ছিল গ্রন্থাগারে। এমন সময় গ্রন্থাগারের দারোয়ান এসে রুক্ষ স্বরে বললে, আপনার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? এমন অসভ্যের মতো লাইব্রেরীতে পড়তে এসেছেন?

বিনায়ক উত্তর দিলে, ভগবান আমাকে যেমন কাণ্ডজ্ঞান দিয়েছেন, তেমনই তো পোষাক পরেছি।

সে আবার বইয়ে মন দিল।

দারোয়ান রেগে গিয়ে গ্রন্থাগারিককে খবর দিলে। তিনি ছিলেন ইংরেজ সাহেব, খাপ্পা হয়ে হুকুম দিলেন—যাও ডেকে নিয়ে এস আমার কাছে।

বিনায়ক দারোয়ানের সঙ্গে নির্ভয়ে সেখানে গিয়ে হাজির।

গরমের দিন। সাহেব খাস কামরায় হাফ প্যাণ্ট পরে বসেছেন। কোট গায়ে, টুপীটা টেবিলের উপর। মাথার উপর বনবন করে ঘুরছে পাখা। বিনায়ক এসে দাঁড়াতেই মার-মুখো হয়ে উঠলেন সাহেব, বললেন—

সভ্যতা জান না তুমি?

বিনায়ক শান্ত স্বরে উত্তর দিলে, কেন জানব না মশাই?

আমাদের দেশের সভ্যতা জানি। আর সেই সভ্যতার এই নমুনা—গরমকালে আমরা খালি গায়েই থাকি।

সাহেব বলে উঠলেন, তোমার দেশের এ সভ্যতা তো অসভ্যতারই সামিল।

বিনায়ক তীব্র হয়ে উঠল, জবাবে বললে, কতগুলো শার্ট-কোট গায়ে চাপালেই মানুষ সভ্য হয় না। আমাদের দেশের সভ্যতা হলো অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও অনাবশ্যক জিনিস ব্যবহার না করা। উল্টো, আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে নিজে চেয়ারে বসে, অপরকে ডেকে এনে যে দাঁড় করিয়ে রাখে, তাকে আমরা সভ্য মনে করি না।

সাহেব স্পষ্ট জবাবে চটলেন না, লজ্জিত হলেন। চেয়ার টেনে বসতে দিলেন।

তার পরে কত কথা!

কি বই পড়ে বিনায়ক, কত বই পড়েছে! তার মুখে বইয়ের নাম শুনে সাহেবের তো আক্কেল গুড়ুম। বিনায়ক বললে—এ লাইব্রেরীর বই পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ গল্প করে সে চলে এল।

সেদিন থেকে বিনায়কের লাইব্রেরীতে অবারিত দ্বার। কিন্তু এতে তো মন ওঠে না। কলেজ পারে না তৃপ্তি দিতে, পারে না বিদ্যার্থী মণ্ডলের বৈঠক আর বন্ধুর দল। বিরাট গ্রন্থাগারও তার এই প্রাণশক্তিকে আটকে রাখতে পারে না, এমন কি পারেন না বিপ্লবীদলের নেতারাও। তাঁদের তো সেই ধরতাই বুলি। সেই অস্পষ্ট পরিকল্পনা—আর মতবাদে আছে

নানা ত্রুটি। একটা আর একটার বিরোধী। কোন্‌টা সে মেনে নেবে ঠিক করতে পারে না।

বিনায়ক ভাবে, এ কি গোলকধাঁধা জীবন দেবতা তার জন্যে রচনা করলেন !

এ কি হেঁয়ালী !

বিনায়ক পথ খোঁজে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করে। অধ্যাপকদের সঙ্গেও তর্কে যোগ দেয়।

একদিন এক অধ্যাপকের সঙ্গে শিক্ষাশাস্ত্র নিয়ে তর্ক বেধে গেল। অধ্যাপক কথায় কথায় বলে বসলেন, আমার যুক্তির ভিত্‌ পাকাপোক্ত, আঠারো বছর ধ'রে আমি এই কাজ করছি।

বিনায়ক অমনি উত্তর দিলে, আঠার বছর যদি কোন বলদ একটা যন্ত্রের সঙ্গে বাঁধা হয়ে ঘোরে, সে কি সেই যন্ত্রের পণ্ডিত হবে? শিক্ষা এক জিনিস, আর শিক্ষার বোঝা বয়ে বেড়ানো অন্য জিনিস। যিনি যন্ত্রবিদ্‌, তিনি ছ' মাসে যা শিখবেন, আঠারো বছর বোঝা বয়ে বেড়ালে তা শেখা যাবে না।

অধ্যাপক লজ্জিত হলেন, আর কিছু বললেন না।

বন্ধুরা তো তার নাম দিলে—তর্ক-ন্যায়-চঞ্চু !

বিনায়ক হাসে, কিন্তু তর্কের বাই তার কমে না, আরো বেড়ে যায়।

একদিন এক বন্ধু এসে বললে, বিন্যা সিনেমা দেখবি ?

ছবি নড়ে-চড়ে বেড়ায়। চল্‌, আজ সিনেমা দেখতে যাই !

বিন্যাকে সে জোর করে নিয়ে গেল।

তাঁবু পড়েছে। সিনেমা হচ্ছে।

নীচে মাটিতে আসন। বিনায়ক একখানা সতরঞ্চ নিয়ে গেল। সেইখানা দিব্যি পেতে সে বসল। ছবি শুরু হ'ল। কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল বিনায়ক শুয়ে পড়েছে।

বন্ধুকে সে বললে, সিনেমা শেষ হলে আমাকে তুলে নিয়ে যেয়ো, আমি একটু ঘুমোই।

সেই তার প্রথম ও শেষ সিনেমা দেখা।

মনে এসেছে বৈরাগ্য, সব কিছুতেই গেরুয়া রং দেখে বিনায়ক। হালকা রং-তামাশায় কি মন ভরে!

একদিন মনে পড়ে গেল দূর শতকের ইতিহাসের কাহিনী।

সিংহগড় দুর্গে হানা দিয়েছেন শিবাজী।

এমন সময় অস্ত্রের আঘাতে লুটিয়ে পড়লেন চির সুহৃদ তানাজী।

সৈন্যেরা মহাপ্লাবনের মতো দুর্গ প্রাকারের উপর উঠে এল। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল প্লাবন, তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে তাদের হতাশার ছাপ। বুঝি তারা ছত্রভঙ্গ হয়।

কে সৈন্যদের আশ্বাস দেবেন, অভয় বাণী শোনাবেন? তানাজীর ভ্রাতা সূর্যাজী এগিয়ে এলেন।

তানাজী দড়ির মই বেয়ে দুর্গ প্রাচীরে উঠেছিলেন সৈন্যদের নিয়ে। সেই দড়ির মই তখনো ঝুলছে। কিছু সৈনিক এখন প্রাকারের উপর যুদ্ধে রত।

সূর্যাজী হঠাৎ উপায় খুজে পেলেন। তলোয়ার খাপ থেকে খুলে দু'টুকরো করে ফেললেন সেই দড়ির মই।

পালাবার পথ রুদ্ধ, যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই।

মরিয়া হয়ে সৈন্যরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনি ক'রে জয়ী হল তারা। দুর্গের বুরুজে উড়ল শিবাজীর জয়ের নিশান।

বিনায়ক ভাবলে, সূর্যাজীর যে পথ, সেই তো আমার পথ। আমিও রশি কেটে ফেলব—দু'টুকরো করে ফেলব!

পরীক্ষা এসে গেল এরই মধ্যে। বিনায়ক পরীক্ষা দেবে না।

মা রান্না করছিলেন। সে এসে দাঁড়াল তাঁর কাছে। হাতে তার ক'খানা কাগজ।

উনুনের কাছে এসে সেই কাগজগুলো গুঁজে দিলে।

মা চমকে উঠে বললেন—কি রে, কি করছিস?

—সার্টিফিকেট পোড়াচ্ছি।

—কেন?

—কি হবে রেখে? আমি তো আর চাকরী করব না, ব্যবসাও করব না।

—তাহলে কি করবি?

—দেশের জন্য কাজ করব মা!

—তা সার্টিফিকেট ঘরে পড়ে থাকলে ক্ষতি কি? পোড়াচ্ছিস্ কেন?

ছেলে বললে—পোড়াচ্ছি কেন? যে পথে আমি যাব না, সে পথই বা রাখব কেন?

মা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অবাক্ হয়ে আর ভাবতে লাগলেন, ছেলে তাঁর কত বড় হয়েছে!

বিনায়কও চেয়ে আছে মার দিকে। সে জানে না কি

দেশের কাজ সে করবে। শুধু তার মনে জ্বলছে আগুন, সেই আগুন তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

মার চোখে জল। ছেলের চোখও ছল ছল করে উঠলো।

মনে এসেছে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য। পড়ার বইয়ে পর্যন্ত নাম লেখে না। ভাবে, ওতে বইয়ের উপর আসক্তি জন্মে। এবার সার্টিফিকেটও পুড়িয়ে ফেললে বিনায়ক। তবে কি সন্ন্যাসীই হবে!

হাঁ সন্ন্যাসীই বটে। তবে কেবল আত্মমোক্ষের জন্যে নয়, জগৎ কল্যাণের জন্যেও।

ঐ যে সমর্থ বিদ্যালয়ের একটি ছেলে বিপ্লবী হয়ে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলে, তাঁর আগুণের ছোঁয়া লেগেছে বিন্যার বুকে। আবার গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর সংসারত্যাগী মনও আছে তার। নেচে উঠল মন। আর নয় ঘর ছাড়তে হবে; ঘর না ছাড়লে কিছু হবে না!

সংসারের রশি কেটে ঘর ছেড়ে সে চলবে তার পথে—লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে একদিন। স্বামীজীর পথই হবে তার পথ।

পথের সন্ধানে

সূর্যাজীর পথই তার পথ।

কিন্তু কোথায় সে পথ?

কোথায়?

বিনায়ক ভাবে, মনে ওঠে প্রচণ্ড ঝড়। সংসারের সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়।

এরই মধ্যে এসে গেল ফার্স্ট আর্ট পরীক্ষা।

বন্ধুরা এসে বলে, বিন্যা, পরীক্ষা দিতে যাবিনে!

বিন্যা উত্তর দেয়, সার্টিফিকেট পুড়িয়ে ফেলেছি আবার কেন?

সে কিরে? তারা অবাক হয়ে ওঠে।

বিন্যা বলে, সূর্যাজীর সেই রশি কাটার গল্প জানিস্‌নে! আমিও তেমনি যে পথে যাব না তার রশি কেটে দিয়েছি। এখন ফিরে তাকানো তো আর যায় না!

তবু সবাই পেড়াপীড়ি করে।

১৯১৬ সালের মার্চ মাস।

বন্ধুদের সঙ্গে বোম্বাইয়ে পরীক্ষা দিতে রওনা হ'ল বিনায়ক।

সুরাট জংশনে গাড়ি থেমেছে।

লোকজনের ভিড়, কুলীদের হৈ-হল্লা।

হঠাৎ বন্ধুরা দেখে, বিনায়ক নেমে পড়েছে। হাতে তার ছোট্ট পুঁটলিটি।

কিরে, যাচ্ছিস্‌ কোথায়? গাড়ি যে এখুনি ছেড়ে দেবে—সবাই চেঁচিয়ে ওঠে।

তোরা যা, আমি আর বোম্বাই যাব না। বিন্ধ্যা উত্তর দেয়।

—তবে কোথায় যাবি ?

—যাব প্রথমে কাশী তারপর হিমালয়ে।

—কেন ? বন্ধুরা শুধায়।

বিন্ধ্যা হেসে বলে—অথা তো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা !

ব্রহ্মকে আমি চাই, তাঁরই খোঁজে যাব।

বন্ধুরা বলে, তা পরীক্ষাটা দিয়ে গেলেই তো পারিস্।

বিন্ধ্যা একগুঁয়ে, হেসে বলে, না, তোদের মত আর আমার মত এক নয়। আমি রশি কেটে দিয়েছি।

গাড়ি হুইশেল দিলে, বন্ধুরা উঠে পড়ল।

গাড়ি ছেড়ে দিলে !

সংসার পথের রশিটা বুঝি তখনো ঝুলছিল, এবার টুকরো টুকরো হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ভুসওয়ালের গাড়ি ধরলে বিনায়ক। সেখান থেকে কাশীর গাড়ি। পথে বাবাকে লিখলে—

পরীক্ষা দিতে বোম্বাই যাওয়া হ'ল না। অন্যত্র যাচ্ছি। আশাকরি, আমার ওপর আপনার বিশ্বাস আছে—নীতি বিরোধী কোন কাজই আমি করব না।

চিঠিখানা যথা সময়ে পেলেন নরহর। ভাবলেন, ছেলে বাংলাদেশে গিয়ে হয়ত বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশে ফাঁসীর মঞ্চেও ঝুলতে পারে। কিন্তু তিনি অবিচলিত রইলেন। মুখে বললেন—ক'দিন আর বাইরে থাকবে ? দু-চারদিন এদিক-সেদিক ঘুরে ঘা খেয়ে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।

কিন্তু রুক্মিণীর মন তো ওকথায় সায় দেয় না। তিনি তো জানেন তাঁর বিন্যাকে।

পাড়াপড়শীরা এসে শুধায়, ওগো রুক্‌মা, তোমার বেটা কোথায় গেল গা ?

রুক্মিণী উত্তর দেন—আমার ছেলে থিয়েটারে তামাশা দেখতে যায়নি। সে গেছে ভগবানের খোঁজে, দেশকে আপন করে নিতে, সেবা করতে। তাকে গর্ভে ধ'রে আমি ধন্য ! আমি ধন্য !

সবাই অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে। মুখে কারও রা নেই।

এদিকে কাশীতে এসে গেছে বিন্যা।

এই সেই বারাণসী ! তীর্থের সেরা তীর্থ। জ্ঞানী আর সাধুজনের বাস। গঙ্গা বয়ে যায় তার পা ধুয়ে দিয়ে। মন্দিরময় নগরী, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গঙ্গার বুকে স্বমহিম ছায়া।

কাশীতে এসে ঠিক করলে সংস্কৃত শিখবে, তারপর হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করবে।

অন্নসত্রে খায় বিন্যা, টোলে পড়ে। আর এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কিছুদিন তাঁতিয়া টোপের কোন এক আত্মীয়ের বাসায়ও থাকল। রাত হলে যায় গঙ্গার ধারে।

কবিতা লেখে। যখন তা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, তখন ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সমর্পণ করে মা গঙ্গার চরণে।

শান্ত নিস্তব্ধ রাত ! ছলছল-কলকল করে বয়ে যায় গঙ্গা, তার বুকে ঝলমল করে ওঠে তারকারাজি। নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

দেবাদিদেব শংকর, তাঁরই জটাজাল বয়ে এসেছে গঙ্গা। এই গঙ্গার তাইত এত মহিমা। রাজ্যপাট ত্যাগ করে রাজারা এসে যুগে যুগে এরই তীরে সাধন-ভজন করেছেন। গঙ্গা দেখে তাইতো মন সহজেই শান্ত হয়ে যায়। এ প্রশান্তি বর্ণনা করা যায় না।

কাশীতেই আছে বিনায়ক। টোলে পড়ে, অন্নসত্রের খাওয়া চুকিয়ে দিয়েছে। একটা ছাত্র পড়ানো জোগাড় হয়েছে, মাইনে দু' টাকা! সেই দুটি টাকায়ই কোনরকমে চালিয়ে নেয়। একাহারী সে, তাও চর্ব্যচোষ্য খায় না। দই আর রাঙাআলু দিয়েই পেট ভরায়। তারপর ছোটে মুর সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে। সেখানে আলমারীতে-আলমারীতে ঠাসা ধর্মীয় গ্রন্থ। বসে বসে পড়ে আপন মনে, আবার কখনও বা পণ্ডিতদের বিতর্ক সভায়ও যোগ দেয়। সে শ্রোতা, বক্তা নয়।

একদিন কিন্তু বক্তৃতা দিতে হ'ল।

সেদিন এক জায়গায় বসেছে সভা। বিষয়ঃ—দ্বৈতবাদ বনাম অদ্বৈতবাদ। কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক। অদ্বৈতবাদীরা দলে ভারী। দীর্ঘ বিতর্কের পর তাদেরই জয় হ'ল।

সভা ভঙ্গ হয় হয়, এমন সময় বিনায়ক উঠে দাঁড়িয়েছে, কিছু বলতে চায়।

সভাপতিমশাই তবু তার আরজি মঞ্জুর করলেন। বিনায়ক উঠে এল মঞ্চে, বললে—সমবেত সুধীবৃন্দ! অদ্বৈতবাত আজ যে কিভাবে পরাস্ত হল তা আপনারা দেখলেন!

পণ্ডিতেরা এতক্ষণ তাকে আমল দেননি, এবার কান পেতে রইলেন, ছোক্‌রা বলে কি দেখা যাক্ !

বিনায়ক বলতে লাগল, অদ্বৈত মানে যার দ্বিতীয় নেই। কিন্তু সেই অদ্বিতীয় মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি অন্য কোন মত এনে হাজির করতে হয়, তবে অদ্বৈত আর রইল কোথায় ? অদ্বৈতের ভিতরেই তো সব মত রয়েছে। অন্যান্য মতবাদ তো তার মধ্যে থেকে থেকে পরিপাক হয়ে গেছে। তাই ভাবছি, তারা ঝগড়া করবে কি করে ? তাদের তো নিজেদের কোন সত্তাই নেই।

বিনায়ক নেমে পড়ল মঞ্চ থেকে। পণ্ডিতেরা হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন ! ভাবলেন, এতক্ষণ তবে কি নিয়ে তর্ক করলেন তাঁরা !

বিনায়ক ব্রহ্মের সন্ধান করতে লাগলো। আবার দেশের কথাও আছে অন্তরের মণিকোঠায়। বাংলা দেশভক্তির কেন্দ্রভূমি, সেই বাংলায় ছুটে যায় তার মন। বাঙালী বিপ্লবী দেখলেই আলাপ করে। কিন্তু মন ভরে ওঠে না। মা বলেছেন—দেশের সেবা আর ঈশ্বরের সেবা এক, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে দেশের সেবা হয় না। কিন্তু এরা তো তা চায় না !

মনে শান্তি নেই। হিমালয়ের চূড়ায় সাধন-ভজন করবে, না, দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে ? দুয়ে কি মিল হয় না ! দেশসেবার সঙ্গে কি মিলিয়ে দেওয়া যায় না হিমালয়ের শান্তি ! ক্রান্তি আর শান্তি কি একই মোহনায় মিলতে পারে না !

প্রশ্নে মন জর্জর, দ্বিধায় আকুল। তারই দোলায় দুলতে লাগল বিনায়ক।

এমন সময় এল কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। উনিশ শো ষোলো সাল তখন।

দেশের জ্ঞানী-গুণীরা মালব্যজীর নিমন্ত্রণে এসেছেন কাশীতে। বড়লাট এসেছেন, বিখ্যাত নেত্রী য়্যানিবেসাণ্ট এসেছেন, আর এসেছেন দেশীয় রাজারাজড়ারা। গান্ধীজীও এসেছেন।

শ্রীমতী য়্যানিবেসাণ্ট সভানেতৃ। বড়লাট থেকে শুরু ক'রে রাজা মহারাজারা অনেকেই ইংরেজীতে ভাষণ দিলেন। করতালিতে সভা গৃহ কেঁপে কেঁপে উঠল।

এবার উঠলেন গান্ধীজী। তিনি তখন কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন, আশ্রম গড়েছেন আহমেদাবাদের সবরমতী নদীর তীরে।

হিন্দী ভাষা ঝরে পড়ল, জ্বালাময়ী সে ভাষা। ছত্রে ছত্রে তার উৎসারিত হয়ে পড়ল পরাধীন ভারতের মর্মবেদনা। বলতে লাগলেন গান্ধীজী। কণ্ঠস্বরে তাঁর তীব্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল—

প্যারীর কোন জহুরীর নয়ন লোভন সজ্জায় সাজিয়ে রাখা অট্টালিকা—সেখানে উৎসবের আয়োজন ক'রে, হিরা-মণি-মুক্তা খচিত পোষাক প'রে গরীবের জন্য দুঃখ করা নির্মম পরিহাস মাত্র! ……

দেশীয় রাজারা যদি সত্যই গরীবের জন্য দরদী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের এই বহুমূল্য আভরণ, সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ, দেশের দরিদ্রনারায়ণের সেবায় লাগিয়ে দিন, নইলে ভারতের কল্যাণ নেই………

সভাতল মন্ত্রমুগ্ধ, নিস্তব্ধ। শুধু রাজাদের চোখে ভ্রূকুটি।

বড়লাট বাহাদুরের মুখে অসন্তোষের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু গান্ধীজীর ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি বলে চললেন—

ভারতের শতকরা ৭৫ জন চাষী। তাদের মেহনতের ফল যদি তারা ভোগ করতে না পায়, তবে উৎপাদন শক্তি তো বাড়বে না। দূর হবে না অন্নের অভাব।……ভারতের মুক্তি এই কোটি কোটি চাষীর হাতে, জনকয়েক আমীর-ওমরাহ বা ডাক্তার কিম্বা উকিলের হাতে নয়। ……

গান্ধীজী এবার হিংসাপন্থী বিপ্লবীদের কথায় এলেন—
হিংসাপন্থীরা আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন, এতে ভারতের লাভ হবে না। ভারত যদি বিজেতাকে জয় করতে চায়, তবে তাকে নির্ভিকতার পথে চলতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে ভয় আমরা কাউকে করব না। কাউকে না! রাজামহারাজাদের নয়, বড়লাট বাহাদুরকে নয়, গোয়েন্দা পুলিশকে নয়—এমন কি স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জকেও নয়। দেশপ্রেমের জন্য বিপ্লবীদের আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁদের শুধাই—খুন করায় কি কিছু বাহাদুরি আছে?

গান্ধীজীর অগ্নিময়ী বাণী সভায় শ্রোতাদের মনে আগুন ধরিয়ে দিলে। পরাধীনতার বেদনার বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। বিব্রত সভানেত্রী শ্রীযুক্তা য়্যানিবেসাণ্ট গান্ধীজীকে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু সভাগৃহ হতে ধ্বনিত হ'ল চিৎকার—

আমরা শুনতে চাই, শুনতে চাই!

গান্ধিজী বলে চললেন। পরাধীন ভারতের বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠে। শুনতে লাগল ভারতের নিপীড়িত

মানুষের দল। কিন্তু শুনতে পারলেন না দেশীয় রাজারা। ভারতের অগণিত মানুষের থেকে নিজেদের পৃথক করে রেখেছেন তাঁরা। পরভোজী পরগাছা! আর শুনতে পারলেন না বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি। ভারতের মানুষ নন তিনি। ব্রিটিশ সিংহের প্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুর ও দেশীয় রাজারা একে একে চলে গেলেন। সভা ভেঙে গেল। কিন্তু ক্ষমতামত্ত বৃটিশ সিংহকে সেদিন আঘাত হানলেন ভারতের এক পরাধীন মানুষ। সেই তাঁর প্রথম আঘাত। উত্তাল জনতা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। ভাবলে ইনিই সেই আগামী দিনের পুরুষ। যাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে দেশমাতৃকা। দিকে দিকে ধ্বনিত হলো—

গান্ধীজী কী জয়! গান্ধীজী কী জয়!

ভারতের দিকে দিকে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। খবরের কাগজে বহু আলোচনা সমালোচনা হতে লাগল।

খবরের কাগজে সেই জ্বালাময়ী ভাষণ পড়ল বিনায়ক। সে আগুন যেন তার মন ছুঁয়ে গেল। বলে উঠল, পেয়েছি, পথ আমি পেয়েছি! ক্রান্তি আর শান্তির যিনি মিলন ঘটাবেন তাঁর সন্ধান আমি পেয়েছি, তিনি গান্ধীজী! মন নেচে উঠল। মনে হলো তিনি বড় কাছের মানুষ!

গান্ধীজীকে লিখলেন চিঠি। বক্তৃতা পড়ে মনে জেগেছে প্রশ্ন—তার সমাধান চাই।

উত্তরের আশা করে বসে আছে বিনায়ক, উত্তরও এল।

আবার চিঠি, আবার উত্তর।

কিন্তু প্রশ্নের সমাধান তো চিঠিতে হয় না। পরিসর সেখানে বড় কম, তাই গান্ধীজী লিখলেন—

যে শঙ্কা প্রকাশ করেছ, আশ্রমের রোজকার জীবনে আমরা তা পালন করছি। তুমি বরং কয়েকদিনের জন্য এখানে চলে এসো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি তোমার সঙ্গে কথাও বলতে পারব।

প্রস্তাবটি মনে ধরল বিনায়কের, সঙ্গে সঙ্গে সে রওনা হলো গান্ধীজীর আশ্রমে। যিনি শান্তি আর ক্রান্তির মহাসঙ্গম, সেই মহাসঙ্গমে সে অবগাহন করতে ছুটে চলল।

জীবন দেবতা তাঁর হাসলেন!

পথ পেলে বিনায়ক, এবার পথে চল।

তারপর আসবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা!

আশ্রমে এল বিনায়ক। আশ্রমের সহজ সরল জীবন, কাজ-কর্মের চঞ্চলতা, কথায় ও কাজে অভিন্নতা তাঁকে অভিভূত ক'রে ফেলল। বার বার মনে হলো, এই তো পথ খুঁজে পেয়েছি। এই পথেই চলতে হবে। এই তার অন্তরের কামনার বাস্তবরূপ। মনে যত প্রশ্ন ভিড় করেছিল, সব নিরসন করে দিলেন গান্ধীজী।

একদিন তিনি বললেন, যদি তোমার আশ্রমের জীবন পছন্দ হয় ও দেশের সেবায় নিজেকে লাগাতে চাও, তবে এখানে থাক—আমি তাতে খুশিই হব।

বিনায়ক এক কথায়ই রাজি। কাশীতে ফিরে এসে সঙ্গীদের কাছে বিদায় নিলেন। সংস্কৃত পড়া আর হ'ল না।

রওনা হবার আগে নিজের লেখা যত পাণ্ডুলিপি ছিল সব টুকরো টুকরো ক'রে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে দিল।

পিছু টান সে কিছুই রাখবে না—শেষ রশিটুকুও কেটে দিল। সাধনা করতে চলল গান্ধীজীর কোচরব আশ্রমে।

তারপর বহু দিন চলে গেছে, যুবক বিনায়ক হয়েছেন বিনোবাজী। হিমালয় যাওয়ার সাধও পড়ে রইল বহু দূরে। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

১৯১৬ সালে ঘর ছেড়ে ব্রহ্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি। কাশী যাই। সেখান থেকে হিমালয়ে যাব এই ছিল আকাঙ্ক্ষা, বাংলাদেশে ঘুরে আসার কল্পনাও ছিল মনের মধ্যে। কিন্তু দৈবগতিকে দুয়ের কোনটিই ঘটল না। গেলাম গান্ধীজীর কাছে। সেখানে দেখলাম হিমালয়ের শান্তি আর বাংলার ক্রান্তির সংগম। মনে মনে বললাম—উভয় বাসনাই আমার পূর্ণ হয়েছে। ব্রহ্মের অনুসন্ধান তো আজও চলছে!

আশ্রমে

রশি কেটে আশ্রমে এসে হাজির।

এখন আর সে বিন্যা নেই, গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য। আদর করে বিনায়ক আর বিন্যা পোষাকী আর আটপৌরে নাম মিশিয়ে গান্ধীজী নাম দিলেন, তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন বা অক্ষরটি। এই বা অক্ষরটি মারাঠী ভাষায় যে-সে নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় না। যে-নাম শ্রদ্ধা জাগায়, ভক্তির উদ্রেক করে সেই নামের সঙ্গে এটি জুড়ে দেওয়ার রীতি। যেমন জ্ঞানদেবকে মহারাষ্ট্রের মানুষ বলে জ্ঞানোবা, পরম ভক্ত তুকারামকে বলে তুকোবা।

গান্ধীজীও তেমনি তাঁর নাম দিলেন বিনোবা। তার মানে—পরম প্রিয়, পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আশ্রমে এসে বিনায়ক হলেন বিনোবা।

গান্ধীজীর দেওয়া নাম পেলেন, আর পেলেন তাঁর পথের হদিশ। সে-হদিশ নিজের পথের সঙ্গে মিলে গেল। বিনোবা আশ্রমের কাজে নিজেকে ঢেলে দিলেন। মনে হলো তিনি যেন আশ্রমের জন্যেই জন্মেছেন। নিজের কোন সত্তা নেই, আশ্রমের সত্তাই তাঁর সত্তা। তিনি যেন সেই জড়ভরত। যা কর্তব্য তাই করেন। রান্নাবান্না, পড়ানো, গাছে জল দেওয়া—সবই করে যান। মুখে অপূর্ব প্রশান্তি। তিনি শূন্য হতে চান, সংখ্যা হতে চান না! ভাব হতে চান, ভাষা হতে চান না।

সন্ধ্যের সময় প্রার্থনা করেন আশ্রমিকরা সবাই মিলে। তারপরে পড়াশুনো, আলোচনা, প্রশ্ন আর উত্তর প্রদান।

বিনোবাও প্রশ্ন করেন, কিন্তু খুব কম। যখন প্রশ্ন করেন, বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে প্রশ্নগুলি। সবাই ভাবেন, বয়েস অল্প হলে কি হবে, মানুষটি সাধারণ নন। তাই আশ্রমের সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। তাঁর উপরেই পড়লো শিক্ষকতার ভার, তিনি জড়ভরত, যে কাজ আসে অমনি তুলে নেন। শিক্ষার ভারও তুলে নিলেন নিজের হাতে।

বাপুজী একদিন শুধালেন, বাড়িতে চিঠি দিয়েছ তো?

—না, চিঠি তো দেওয়া হয়নি।

বাপুজী বললেন, বাড়িতে তোমার বাবা-মা ভাবছেন।

তাঁদের কুশল সংবাদ দেওয়া ছেলের ধর্ম। কাউকে ভাবনায় ফেলে রাখাও একরকমের হিংসা।

অহিংসার পূজারী বাপু এবার নিজেই লিখতে বসলেন। নরহর ভাবেকে লিখলেন—

আপনার ছেলে আমার কাছে আছে। এই অল্প বয়সে তার মধ্যে যে তেজস্বিতা আর বৈরাগ্যের বিকাশ হয়েছে, আমার তা লাভ করতে বহু বছর কেটে গেছে।

বিনোবাও লিখলেন চিঠি পিতার কাছে মারাঠীতে কবিতার ভাষায়।

সত্যাগ্রহ আশ্রম
১-১-১৯১৭

"তাতেলা মাতেলা বন্দন করতো তদীয় মী,
তদনন্তর প্রভুচে, চরণাচা হীন দীন দাস নমী।
তুমচা আশীর্বাদ কৃপা কটাক্ষে তসা প্রভু চা হী,
কুশলী নাদত সে হা সুত তুমচা আশ্রমী জসা গেহী।
শ্রেয়োভূমি গৃহাতে সোড়ু নিয়া শ্রেয় আশ্রম স্থানী।
মাতেচে মন সন্তত চিন্তুনী দীনা মলাস সকল কলতে।
চিন্তা ব থা কশালা? মায় জগাচী তিলা সকল কলতে।
প্রার্থিত সে যাস্তব কী কধি ন ধরাবেঁ তম্হী বিষাদাস।
কিমপি মদাশীর্বাদী সামর্থ নসে পরন্তু রীতীলে।
অনুসরুনি প্রেমানে অর্পী শিবকৃষ্ণত্ত শান্তি তে।"

—বিনায়ক

অর্থাৎ—

প্রথমে আমি মাতাপিতা ও ভগবানের বন্দনা করিতেছি, তদনন্তর জানাইতেছি আপনাদের এবং ঈশ্বরের কৃপায় আমি বাড়ীর মতোই আশ্রমেও কুশলপূর্বক আছি। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার দীন হীন পুত্রের জন্য হয়ত সর্বদা চিন্তা করিতেছেন ও দুঃখ পাইতেছেন। তিনি যেন নিরর্থক চিন্তা না করেন। তিনি তো জগতের মাতা, তিনি সবই জানেন। সুতরাং মিছামিছি যেন দুঃখ না করেন। যদিও আমার শব্দের এমন সামর্থ্য নাই যে তদ্বারা আপনারা চিন্তামুক্ত হইবেন তবুও আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি যেন আপনাদের শান্তি দেন।

বিনোবা আশ্রমেই আছেন। সারাদিন কাজে বিভোর হয়ে থাকেন। রান্না বান্না, গাছে জল দেওয়া, শিক্ষকতা, তাঁতবোনা সব কাজেরই কাজী তিনি। সেই সকাল থেকে রাত অবধি শুধু কাজ আর কাজ! এ ছাড়া সকাল-সন্ধ্যা শোনেন বাপুজীর প্রার্থনা প্রবচন।

সি. এফ্. এ্যাণ্ডরুজ পাদ্রী সাহেব। সাহেব হলেও ভারতের মানুষ বনে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। দেশের মানুষ তাঁর নাম দিয়েছে দীনবন্ধু এ্যাণ্ডরুজ। তিনি এসেছেন আশ্রমে। বিনোবাকে দেখলেন। সারাদিন খাটছে মানুষটি। বেশ লাগল দেখে, শ্রদ্ধায় ভরে যায় মন, ভালবাসতে ইচ্ছে করে। গান্ধীজীকে একদিন সে-কথা বললেন। গান্ধীজী হেসে বললেন—

আশ্রমে দু-চারটি রত্ন আছে। বিনোবা তাঁদের একজন। কৃতার্থ হতে এঁরা আশ্রমে আসেন না, আসেন আশ্রমকে কৃতার্থ করতে। নিতে এঁরা আসেন না, আসেন দিতে।

আশ্রমকে বিনোবা দিতে গিয়েছিলেন, দিলেনও প্রচুর, কিন্তু তিনি কি কিছু পেলেন না ?

পেলেন বইকি !

তাই তিনি বলেছেন, "আশ্রম থেকে কি পেয়েছি তা এক আমিই জানি। ছেলেবেলা থেকে মনের একমাত্র সাধ ছিল, দেশের কাজে হিংসাত্মক কিছু করে জীবন সার্থক করব। বাপু আমার সে মনোভাব দূর ক'রে দিয়েছেন। আগ্নেয়গিরির মধ্যে যেমন আগুণ জ্বলে, তেমনি আমার মনে ক্রোধ আর অন্য রিপু-গুলো দাউ দাউ করে জ্বলত। বাপু তা নির্বাণ ক'রে দিয়েছেন। আশ্রমে প্রতিদিন আমি এগিয়ে গেছি। প্রতি বছর এক-একটি মহাব্রত আমি উদ্‌যাপন করেছি।"

কঠোর পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ল। বিনোবা ছুটি চাইলেন। এক বছরের ছুটি। বাপুজীও সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

ছুটি নিয়ে শরীর সারাতে চললেন। কিন্তু মনে আর একটি সাধও আছে—সংস্কৃত ভাষাটা ভাল করে চর্চা করবেন।

ওয়াই !

মহাবালেশ্বর পর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারই তলায় ওয়াই। তারই গা ঘেঁসে বয়ে যায় কলকল ছলছল করে নদী। জায়গাটি বড় সুন্দর। জল-হাওয়া ভাল, তার ওপর আবার তীর্থস্থান।

ভাবেদের পূর্বপুরুষ এখানে বাস করত। এখানে তাদের একটা বাড়ি ছিল। এরই সঙ্গে ছিল কোটেশ্বরের মন্দির।

বিনোবা এসে উঠলেন সেই বাড়িতে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। আবার এখানকার প্রজ্ঞা-পাঠশালার নারায়ণ শাস্ত্রী মারাঠের কাছে সংস্কৃতও পড়তে লাগলেন।

ওয়াইতে ছু-তিনমাস থাকবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু থাকতে হলো অনেক বেশী। বাপুজীকে তাই লিখলেন—

"পরমপূজ্য বাপুজী,

এক বছর আগে স্বাস্থ্যহীনতার জন্য আশ্রম থেকে ছুটি নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ছু-তিন মাস 'ওয়াই' এ থেকে আশ্রমে ফিরে আসব, তা হলো না। এতটা সময় বাইরেই কেটে গেল—আশ্রমে ফেরা হয়নি। কাজেই আশ্রমে আমি আদৌ ফিরব কি-না কিম্বা জীবনে বেঁচে আছি কি-না এবিষয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। এর জন্য সব দোষ আমারই। মামা (ফড়কে) কে চিঠি দিয়েছিলাম, সত্যাগ্রহ করবার আবশ্যক হলে আমায় যেন অবশ্যই জানানো হয়। সব ফেলে আমি চলে আসব। নইলে যে লোভে এতদিন আশ্রমের বাইরে পড়ে আছি তা পূর্ণ হওয়ার পরেই ফিরব। আশ্রম ছেড়ে চলে গেছি এমন ধারণাও যদি কারুর মনে হয় সে দোষও আমারই। চিঠি না লেখাই আমার অভ্যাস। কিন্তু একটা কথা আজ লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে, আশ্রম আমার হৃদয়ে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। কেবল তাই নয়, আমার জন্মই আশ্রমের জন্য—এই ধরণের বিশ্বাস জন্মেছে। কাজেই প্রশ্ন ওঠে তাহলে এক বছর বাইরে রইলাম কেন?

'যখন আমি দশ বছরের ছিলাম তখনই আজীবন ব্রহ্মচর্য ধারণ ক'রে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করি। তারপর হাইস্কুলে ভর্তি হই, তখন গীতা পড়বার বিশেষ আগ্রহ জন্মে। কিন্তু বাবা আমাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফ্রেঞ্চ নিতে আদেশ করেন। সংস্কৃত ছেড়ে ফ্রেঞ্চ

পড়তে হয় তবুও গীতা মাতার প্রতি প্রেম আমার কমে যায়নি। ঘরে বসে নিজে নিজে সংস্কৃত পড়তে থাকি। স্থির করলাম বেদান্ত ও তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও অধ্যয়ন করব। তারপর আপনার অনুমতি নিয়ে আশ্রমে ভর্তি হই। অবিলম্বে বেদান্ত অভ্যাসের উত্তম সুযোগ এসে গেল। 'ওয়াই'এ নারায়ণ শাস্ত্রী মারাঠে নামে একজন আজন্ম ব্রহ্মচারী পণ্ডিত আছেন, ছাত্রদের তিনি বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়ান। তাঁর কাছে উপনিষদ পড়বার লোভ হ'ল। এই লোভের জন্যেই 'ওয়াই' এ বেশীদিন কাটিয়েছি। এ সময়টা কি কি পড়েছি তা লিখে জানাচ্ছি।

(১) উপনিষদ (২) গীতা (৩) ব্রহ্মসূত্র ও শংকর ভাষ্য (৪) মনুস্মৃতি (৫) পাতঞ্জল যোগদর্শন—এ গ্রন্থ কখানি অধ্যয়ন করেছি। এছাড়া (১) ন্যায়শাস্ত্র (২) বৈশেষিক সূত্র (৩) যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি—এ গ্রন্থ সমূহ পড়েছি। এখন আর আমার বেশী শিখবার মোহ নেই। যা পড়বার নিজেই পড়ে নেব।

দ্বিতীয় কাজ ছিল স্বাস্থ্য উদ্ধার—যার জন্য আমার 'ওয়াই'এ আসা। সে সম্বন্ধে লিখছি। স্বাস্থ্যলাভের জন্য প্রথমে রোজ ১০।১২ মাইল বেড়াতাম। তারপর ৬ থেকে ৮ সের গম পিষতাম। এখন ৩০০ সূর্য-নমস্কার ও বেড়ানো আমার ব্যায়াম। স্বাস্থ্য এখন ভাল হয়ে গেছে।

আহারের বিষয়ে—প্রথমে ৬ মাস লবণ খেয়েছি। তারপর ছেড়ে দিয়েছি। মসলা একেবারেই খাইনি। সারাজীবন মসলা ও লবণ না খাওয়ার ব্রত নিয়েছি। দুধ খেতে আরম্ভ করেছি।

অনেক রকম পরীক্ষা কররার পর স্থির জেনেছি যে দুধ বাদে বরাবর চলে না। তবুও যদি ছাড়া যায় তো ছেড়ে দেবার ইচ্ছে রইল। একমাস কেবল কলা, দুধ ও লেবুর ওপর ছিলাম। এতে শরীরের শক্তি কমে গেছে। এখন আমার দৈনিক খোরাক নীম্ন-

রূপ ঃ—দুধ—৬০ তোলা, ভাখরি—২ খানা (বিশ তোলা জোয়ার দিয়ে), কলা—৪।৫টি, লেবু—১ (পাওয়া গেলে)।

আশ্রমে পৌঁছে আপনার পরামর্শ মত খাদ্য ঠিক করে নেব। স্বাদের জন্য কোন জিনিস খাওয়ার ইচ্ছেই হয় না। তবুও ওপরে যা লিখেছি তাতে আমার খাদ্য খুবই আমিরী ধরণের মনে করি।

প্রতিদিনকার খরচ ঃ—কলা ও লেবু ৴০, জোয়ার—৲১০, দুধ—৴৫, মোট—৵১৫। এতে আর কি কি পরিবর্তন করা দরকার লিখে আমাকে জানাবেন।

এ পর্য্যন্ত কাজ যা করেছি ঃ—

[১] গীতার ক্লাস চালিয়েছি (কিছু না নিয়ে) ৬ জন বিদ্যার্থীকে অর্থ সমেত সমস্ত গীতা শিখিয়েছি।

[২] জ্ঞানেশ্বরীর ৬টি অধ্যায়—এ ক্লাসে ৪ জন বিদ্যার্থী ছিল।

[৩] উপনিষদ ৯ খানা—এ ক্লাসে ২ জন বিদ্যার্থী ছিল।

[৪] হিন্দী প্রচার—আমি নিজে হিন্দী ভাল জানি না। তবুও বিদ্যার্থীদের হিন্দী-পত্রিকা পড়বার ও পড়াবার ব্যবস্থা করেছি।

[৫] ইংরেজী—২ জন বিদ্যার্থীকে শিখিয়েছি।

[৬] প্রায় ৪০০ মাইল হেঁটেছি। রাজগড়, সিংহগড়, তোরণগড় প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুর্গ দেখেছি।

[৭] প্রবাসকালে গীতা ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেওয়ার কাজও ছিল। আজ পর্যন্ত ৫০টি ভাষণ দিয়েছি। এখন এখান থেকে আশ্রমে ফেরার পথে পায়ে হেঁটে বম্বে যাব। সেখান থেকে ট্রেনে আশ্রমে পৌঁছব।

[৮] 'ওয়াই' এ বিদ্যার্থীমণ্ডল নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেছি ও একটি পাঠাগার খুলেছি। আর তার সাহায্যের জন্য গম পেষার এক ক্লাস চালিয়েছি। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলেরাও এ ক্লাসে

যোগ দিয়েছিল। ওয়াই পুরাতন পন্থীদের স্থান এবং আমরা সব স্কুলেপড়া ব্রাহ্মণ সন্তান। সবাই আমাদের মনে করেছে মহামূর্খ। তা সত্ত্বেও এ ক্লাস দু মাস চলেছে এবং পাঠাগারের জন্য চারশ বই সংগৃহীত হয়েছে।

[৯] সত্যাগ্রহাশ্রমের তত্ত্ব প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

[১০] বরোদায় ১০।১৫ জন বন্ধু আছেন। তাঁদের মধ্যে লোকসেবার বৃত্তি আছে। তিন বছর আগে মাতৃভাষা প্রসারের জন্য এক সংস্থা সেখানে স্থাপন করেছিলাম। সেই সংস্থার বার্ষিক উৎসবে গিয়েছিলাম (উৎসব মানে সংস্থার সভ্যগণ একত্র হয়ে কি করেছেন ও ভবিষ্যতে কি করতে চান, তা নিয়ে আলোচনা)। এখানে আমি হিন্দী প্রচারের প্রস্তাব করেছি। আমার বিশ্বাস এ সংস্থা একাজ অবশ্যই করবে। আপনি হিন্দী প্রচারের জন্য যে চেষ্টা করছেন বরোদার এই সংস্থা সে কাজে সব সময় সাহায্য করবে।

অবশেষে সত্যাগ্রহাশ্রমবাসী হিসেবে আমার আচরণ কেমন ছিল তা বলা দরকার।

(১) অস্বাদ ব্রত—এ বিষয় ভোজন সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গে উপরে লিখেছি।

(২) অপরিগ্রহ—কাঠের থালা, বাটি, আশ্রমের একটি ঘটি, ধুতি কম্বল ও পুস্তক—পরিগ্রহের মধ্যে এই কটি জিনিস আছে। ফতুয়া, কোট, টুপি প্রভৃতি না পরার ব্রত নিয়েছি। সে জন্য গায়েও ধুতিই জড়িয়ে থাকি।

(৩) সত্য-অহিংসা-ব্রহ্মচর্য—ব্রতসমূহের পালন জ্ঞাতসারে ঠিক ভাবেই করেছি বলে আমার বিশ্বাস।

বেশী কি লিখব, যখনই স্বপ্ন দেখি তখনই মনে এই এক চিন্তার উদয় হয়—ঈশ্বর আমার কাছ থেকে কোন সেবা নেবেন কি? পরিপূর্ণ

শ্রদ্ধা নিয়ে একথা আমি বলতে পারি যে আশ্রমের নিয়মানুসারে (একটি বাদে) আমার আচরণ আমি ঠিকই রেখেছি। আমি আশ্রমেরই, আশ্রমই আমার সাধ্য। যে ত্রুটির কথা উপরে লিখেছি তা হলো ভোজন (অর্থাৎ ভাখরি, রুটি) নিজের হাতে তৈরী করে না নেওয়া। এরও চেষ্টা আমি করেছি ; কিন্তু প্রবাসে তা সম্ভব হয়নি।

সত্যাগ্রহ অথবা অন্য কোন কাজে আবশ্যক হলে অবিলম্বে আশ্রমে ফিরে আসব। নইলে, ওপরের লেখা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছব।

এর মধ্যে আশ্রমে কি কি পরিবর্তন হয়েছে, কতজন বিদ্যার্থী আছে, রাষ্ট্রীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে কি-না, আমার আহারেই বা কি কি পরিবর্তন করা দরকার—জানবার জন্য আমার আকুল আগ্রহ। আপনি আমায় নিজের হাতে লিখবেন। এ বিনোবার, আপনাকে পিতার সমান মনে করে, এমন আপনার পুত্রের নিবেদন। ২।৪ দিনের মধ্যেই এ স্থান ছেড়ে চলে যাবো।

বিনোবার প্রণাম"

চিঠিখানা পড়ে 'গোরখ্ নে মছন্দর্ কো হরায়া, ভীম হ্যায় ভীম।' অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে ছাড়িয়ে গেছে, ভীমকর্মা পুরুষই বটে—এই উক্তি গান্ধীজীর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে উত্তরে তিনি লিখলেন—

"চিরঞ্জীব বিনোবা,

"কি বিশেষণ তোমাকে দেব তা বুঝতে পারছি না। তোমার প্রেম, তোমার চরিত্র আমাকে অভিভূত করে ফেলে। তোমার পরীক্ষা নিতে অসমর্থ আমি। নিজেই তোমার যে পরীক্ষা তুমি করেছ তাই আমি স্বীকার করে নিলাম আর তোমার পিতার আসনও গ্রহণ করলাম। আমার লোভ তুমি প্রায় পূর্ণ করে দিয়েছ। আমি বিশ্বাস করি, খাঁটি

পিতা নিজের চাইতে শ্রেষ্ঠতর পুত্র উৎপন্ন ক'রে থাকে। খাঁটি পুত্র পিতার কৃতি আরও বাড়িয়ে দেয়। পিতা সত্যবাদী, দয়ালু ও দৃঢ়চিত্ত হলে পুত্রের চরিত্রেও তা ফুটে ওঠে।

"তোমার মধ্যে এসব গুণ দেখতে পাচ্ছি। আমার চেষ্টায় তুমি এ জিনিস লাভ করেছ তা তো নয়। সুতরাং তুমি যে আমাকে পিতার আসনে বসিয়েছ তা তোমার ভালবাসার দান বলেই গ্রহণ করলাম এবং ঐ পদের যোগ্য হবার চেষ্টা করব। আর যখন আমি হিরণ্যকশিপুর মত ব্যবহার করব তখন ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় স্বচ্ছন্দে আমার অনাদর ক'রো।

"ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তোমার হাতে ভারতের কল্যাণ হোক, এই আমার কামনা। আহারে পরিবর্তন করার মত কিছু দেখি না। দুধ এখনই যেন ছেড়ো না, দরকার হলে মাত্রা আরও বাড়িয়ে নিও।

"রেল সত্যাগ্রহের প্রয়োজন এখনও মনে করছিনে, সে জন্য জ্ঞানী প্রচারকের দরকার। সম্ভবতঃ খেড়া জেলায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ হতে পারে। এখন তো আমার ভ্রমণ-পর্ব চলছে। দু এক দিনের মধ্যেই দিল্লী পৌঁছব।

"আর যা রইল তা দেখা হ'লে বলবো। সবাই তোমাকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে।

বাপুর আশীর্বাদ"

উত্তর লিখে পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বললেন বাপুজী—ওরে মস্ত মানুষ! বরাবরই দেখছি, মারাঠী ও মাদ্রাজীদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বড় ঘনিষ্ঠ হয়। মাদ্রাজী কেউ এখন আর কাছে নেই। মারাঠীরা কেউ কখনো আমাকে নিরাশ করেনি। আর তাদের মধ্যে বিনোবা তো চূড়ান্ত দেখালে!

একবছর এমনি করেই কেটে গেল। বিনোবা এই একবছর শুধু ওয়াইতেই কাটালেন না। তিনি এদিক-ওদিক ঘুরেও এলেন।

বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুণা ঘোরা হ'ল। যেখানেই যান, দু-একজন জ্ঞানীগুণীর সঙ্গে দেখা হয়। শাস্ত্রের আলোচনা হয়। নিজের যুক্তিগুলো পরখ করে দেখেন, অন্যের যুক্তি শোনেন, দুয়ে মিলে জ্ঞান গভীর হয়ে ওঠে। এমনি করেই দিন কাটে।

এই সময়ে গীতার প্রচার করতে গিয়ে গীতার মর্ম তিনি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন—

'গীতা মুখে মুখে (পাপ পুণ্যের) জমাখরচের শাস্ত্র নয়। গীতা আচরণ-শাস্ত্র। আচরণ ছাড়া গীতার প্রচার কোন মতেই হতে পারে না। গীতার প্রচার মানে নিষ্কাম কর্মের প্রচার, গীতার প্রচার মানে ভক্তির প্রচার, গীতার প্রচার মানে ত্যাগের প্রচার। এই প্রচার প্রথমে নিজের আত্মার মধ্যে হওয়া চাই। যেদিন এই ভাবধারা আত্মাকে পরিপূর্ণ করবে, সেদিন জগতে তা প্রবাহিত না হয়ে পারবে না।'

পুণায় এসেই বিনোবা ছুটলেন তিলক মহারাজের কাছে। তিলক মহারাজ তাঁর শৈশবের গুরু, অগ্নিযুগের হোতা, পরম পণ্ডিত। গীতাকে তিনি দিয়েছেন রাজনৈতিক ব্যাখ্যা।

তিলক-মহারাজের সাক্ষাৎ মিলল।

তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন বিনোবা—আপনি সত্য কি তা উপলব্ধি করেছেন?

তিলক-মহারাজ উত্তর দিলেন, না।

—জন্ম-মৃত্যুর ভয় আপনার দূর হয়েছে ?

—এ সম্পর্কে তেমন কিছু আমার বলার নেই।

—অমৃতের অনুভব হয়েছে ?

—না।

তিলক-মহারাজের স্পষ্ট উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন বিনোবা। এই তো সত্যিকারের পণ্ডিত! যা জানেন না, তাও নির্ভয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার করতে পারেন। এই তো পরম জ্ঞানী!

তিলক মহারাজকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন বিনোবা।

প্রথমে তিনি এক বছরের ছুটি নিয়েছিলেন পরে আরও দু'মাস বাড়িয়ে এক বছর দু'মাস কঠোর তপস্যায় কাটিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। এমনই আশ্চর্য যে এক বছর দু'মাস আগে যে মুহূর্তে তিনি আশ্রম ছেড়েছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই চুপচাপ আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেন। গান্ধীজী প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন আজ তাঁর ফেরবার কথা। বিনোবার সত্যনিষ্ঠা দেখে গান্ধীজী অভিভূত হয়ে গেলেন! একদিন কথাপ্রসঙ্গে সে কথা তিনি বললেনও—'তোমার সত্যনিষ্ঠাই তোমাকে সময়নিষ্ঠ করে তুলেছে।'

নম্রভাবে বিনোবা বললেন, 'বরঞ্চ আমার গণিত-নিষ্ঠাই আমাকে এমন করেছে।'

গান্ধীজী হাসলেন, বললেন—'গণিত কি কখনও সত্যের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে?'

———

দাদার যোগ্য ভাই

বিনায়কের গৃহত্যাগের ঘটনায় পরিবারে ও বন্ধু মহলে বিশেষ চঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। সকলেরই কি-করি কি-করি ভাব। অথচ তাঁর কোন সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে একদিন হঠাৎ দুখানি চিঠি একসঙ্গে এসে গেল। এ কি ব্যাপার মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন বিনায়কের পিতার কাছে! বিনায়কও লিখেছে। চিঠি পেয়ে সবাই তো মহাখুশি। বন্ধুরা একে একে আশ্রমে এসে দেখা সাক্ষাৎ করতে লাগল।

একদিন ছোটভাই বালকৃষ্ণ এসে হাজির। বললেন—আমিও আশ্রমে থাকব।

বিনোবা বললেন, আশ্রম জীবন অত্যন্ত কঠিন। তুমি এ জীবন কাটাতে পারবে না। তোমার এখানে থাকা চলবে না। বড় ভাইয়ের আদেশ অমান্য করার সাহস তাঁর ছিল না। বাড়ী ফিরে গেলেন বালকৃষ্ণ। কিন্তু আশ্রম জীবন যাপন করার সাধ তার গেল না? বাড়ী গিয়ে আরও কঠোরভাবে আশ্রম নিয়ম পালন করতে লাগলেন। শরীর ভেঙ্গে পড়ল, তবুও তিনি অবিচলিত রইলেন।

ইতিমধ্যে ১৯১৮ সালে মা ও ছোটভাই দত্তাত্রেয় মারা যান। বালকৃষ্ণ তখনও আশ্রম নিয়মে অটল রইলেন।

অবশেষে ১৯১৯ সালে গান্ধীজী যখন বরোদা সফরে যান বালকৃষ্ণ তখন স্টেশনে এসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর অনুমতি নিয়ে আশ্রমে চলে আসেন। এবার আর বিনোবা কিছু

বললেন না। আশ্রমের অন্যান্য বিদ্যার্থীদের মতো তাঁরও থাকার এবং কাজের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

আশ্রমে আসার পর বালকৃষ্ণের নাম হলো বালকোবা।

বালকোবা আর বাড়ী ফেরেন না দেখে পিতা নরহর পন্ত চিঠি দিলেন,—"কেবল শরীর সাড়ানর উদ্দেশ্যেই কি গিয়েছ, না স্থায়ীভাবে আশ্রমে থাকবার ইচ্ছে,—শরীর তো বরোদায়ও সাড়ান যায়।"

বালকৃষ্ণ লিখলেন—তিনি স্থায়ীভাবেই আশ্রমে থাকবেন, সংসারে আর ফিরবেন না!

নরহর আর কিছু লিখলেন না। তিনি তাঁর বিজ্ঞানচর্চা ও সংগীতশাস্ত্র নিয়ে ডুবে রইলেন।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বালকোবা সবরমতী আশ্রমেই কাটান। এই সময় তিনি আশ্রমের সব রকমের কঠোর শ্রমের কাজ করেন। আশ্রমে পায়খানা সাফাইয়ের কাজ তিনিই প্রথম আরম্ভ করেন। এর আগে আশ্রমের পায়খানা সাফাইয়ের কাজ বাইরের মেথর দিয়ে করান হ'ত। একদিন সেই নির্দিষ্ট লোকটি নিজে না এসে তার ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়। ছেলেটি যেমন ছোট তেমনই খুব দুর্বল ছিল। সাধ্য কি তার অতবড় বালতি বয়ে নিয়ে যায়। সে কেঁদে কঁকিয়ে অস্থির।

বালকোবা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে বালতিটা ধরলেন। তিনি সেদিন ছেলেটির সঙ্গে পায়খানা সাফাইএর কাজ করলেন। বিনোবা শুনে মহাখুশি। তিনি নিজেও পরদিন থেকে পাইখানা সাফাইয়ের কাজে মহা উৎসাহে লেগে গেলেন।

১৯৩১ সালে বালকোবা সবরমতী থেকে ওয়ার্ধা আসেন। ওয়ার্ধায় কয়েক মাস থাকার পর তিনি টি, বি, রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি টিবিতে ভোগেন। ওয়ার্ধার নিকট একটি নির্জন স্থানে তিনি বিশ্রাম ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসরণ করতে থাকেন। অবশেষে দীর্ঘ প্রযত্নের ফলে ১৯৪৫ সালে তিনি কঠিন টি, বি, রোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। এই সময় তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্পর্কে বহু অধ্যয়ন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং যন্ত্র সংগীতে গভীর উৎকর্ষতা লাভ করেন।

১৯৪৬ সালে গান্ধীজী বালবোবাকে পুণার নিকট উরুলি কাঞ্চন প্রাকৃতিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠান।

সেই থেকে বালকোবা উরুলি কাঞ্চনেই থেকে যান এবং উরুলি কাঞ্চন প্রাকৃতিক চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালক হন। বালকোবা কেবল প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিদ্যায়ই পারদর্শী নন তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সংগীত বিশারদও বটেন। সংগীত বিদ্যায় তাঁর দক্ষতা মাতামহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বরোদা থাকাকালে তিনি মৃৎশিল্প সম্বন্ধেও উপাধি লাভ করেন। মৃৎশিল্পেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করেছিলেন। গান্ধীজী বালকোবাকে বিলেত পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ জেলে যাওয়ায় সে ইচ্ছে আর পূর্ণ হয়নি। বালকোবাও স্বরাজ সংগঠনে মনোনিবেশ করেন।

বালকোবার গৃহত্যাগের পর শিবাজীও আর ঘরে থাকতে পারলেন না। এবার তাঁর পালা। একটি বছর কোন রকমে

কাটিয়ে তিনিও বেড়িয়ে পড়লেন। তিনি কিন্তু আশ্রমে না এসে চলে গেলেন আবু পাহাড়ে। আবু পাহাড়ে তিনি যোগীর সন্ধানে নানাস্থানে ঘুরলেন কিন্তু সত্যিকারের কোন যোগীর দেখা পেলেন না। তারপর তিনি ঘরে না ফিরে সোজা চলে আসেন সবরমতী আশ্রমে। কয়েক মাস সবরমতী আশ্রমে থাকার পর শিবাজী শ্রীরামনিকলাল মোদীর সঙ্গে ওয়ার্ধা আসেন ১৯২১ সালে। যমুনালাল বাজাজ ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর আদর্শে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চান। বৎসর খানেক আশ্রম চালাবার পর শ্রীমোদী বললেন তিনি আর আশ্রম পরিচালনা করতে পারবেন না। তখন গান্ধীজী বিনোবাকে ওয়ার্দ্ধা পাঠান। দাদার কাছে থাকার সৌভাগ্য হলো শিবাজীর। কঠোরভাবে তিনি আশ্রম জীবন যাপন করতে লাগলেন। সুতাকাটা, তাঁত বোনা, ঝাড়ু দেওয়া, পায়খানা সাফাইয়ের কাজ চলতে লাগল পূর্ণ উদ্যমে।

১৯৩২ সালে ধুলিয়া জেলেও শিবাজী বিনোবার কাছে থাকেন। ঐ জেলেই গীতাঈ পুস্তকের জন্ম হয়। এই গীতাঈ প্রণয়নে শিবাজী বিনোবাজীকে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

১৯৩৪ সালে বিনোবার সঙ্গে শিবাজীও জেল থেকে মুক্তি পান। বিনোবা বললেন মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে গীতাঈ প্রচার করতে হবে। দাদার আদেশ শিরোধার্য করে ভাই লক্ষ্মণের মতো শিবাজী বেরিয়ে পড়লেন আশ্রম থেকে। সঙ্গে ২।৩টি সাথী যোগাড় করে নিলেন। একটানা আট বছর মহারাষ্ট্রের ১৮টি জেলার ১৫০০ গ্রামে ঘুরলেন শিবাজী। গ্রাম থেকে

গ্রামান্তরে যান গীতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন, গীতাঈয়ের প্রচার করেন। এই যাত্রাকালে তিনি প্রায় তিন লক্ষ গীতাঈ বিক্রয় করেন!

এর পর তিনি ধুলিয়ায় আসেন এবং মহাদেব দেশাই স্মৃতি গান্ধী তত্ত্বজ্ঞান মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি জ্ঞানেশ্বর দর্শন ও জ্ঞানেশ্বরী কোষ প্রণয়ন করেন। এই কোষ প্রণয়নে তাঁকে প্রায় দশ বছর সময় দিতে হয়। রামদাস স্বামীর মনাচী শ্লোকেরও তিনি ভাষ্য রচনা করেন। অতঃপর ধর্ম সার (বুদ্ধদেবের ধম্মপদ পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সার) ও শ্রমদান পুস্তক প্রণয়ন করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধেও শিবাজী যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছেন এবং এ সম্বন্ধে একখানা পুস্তকও প্রণয়ণ করেছেন। গীতাঈ কোষ প্রণয়নেও তিনি বিনোবাজীকে সাহায্য করেন।

১৯৫৮ সালে শিবাজী ধুলিয়া থেকে পওনার পরমধাম আশ্রমে আসেন। সেখানে তিনি 'ব্রহ্ম বিদ্যামন্দির' পরিচালনার কাজে ব্যাপৃত হন।

শিবাজী সন্ত সাহিত্যের প্রগাঢ় পণ্ডিত। অত্যন্ত সাদা সিধা জীবন, তাঁকে দেখলে প্রাচীন ঋষিদেরই একজন বলে মনে হয়।

বিনোবার চুম্বকী আকর্ষণে বালকৃষ্ণ (আশ্রমে আসার পর নাম হয় বালকোবা) ও শিবাজী সংসার ছেড়ে আসেন ধর্মের পথে। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরাও তাঁদের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন—যোগ্য দাদার যোগ্য ভাইয়ের পরিচয় দেন।

ধন্য রুক্মিণী! ধন্য তোমার শিক্ষা! তিনটি ছেলে তিনটিই হলেন সংসার ত্যাগী—দেশ সেবাব্রতী কঠোর সন্ন্যাসী—কর্মে সেবায় জ্ঞানে আর্য ঋষিদের সুমহান ঐতিহ্যের সার্থক উত্তর অধিকারী।

সবরমতী আশ্রমে

এক বছর দুই মাসের ছুটি বিনোবা কিভাবে কাটিয়েছেন তা তাঁর মর্মস্পর্শী চিঠিখানা থেকেই জানা যায়। আশ্রমে ফিরে এসে আবার তিনি কাজে ডুবে গেলেন।

সাড়া দিনের চব্বিশটি ঘণ্টা ছকে বাঁধা। একটি মুহূর্তেরও অপব্যয় নেই। আশ্রমের ফলের বাগানটি বেশ বড়। বালতি বালতি জল এনে সেখানে গাছের গোড়ায় ঢালা বড় সহজ কাজ নয়। অনেকেই এ-কাজ এড়িয়ে চলতে চাইত। বিনোবা এ কাজটি নিজের হাতেই নিলেন। নদী থেকে বালতি বালতি জল এনে ঢালতে লাগলেন গাছের গোড়ায়। চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে রোজ এই কাজই করতে হ'ত।

আবার ছ'মাস ধরে কেবল রান্নাবান্নার কাজই চলল। সুতোকাটা, তুলোধোনা, তাঁত বোনা এসব কাজও চলতে লাগল।

এ যেন গুরু গৃহের সেই আরুণী, উপমন্যু, উতঙ্ক। কঠোর পরিশ্রম করছেন, শ্রমকেই ভগবান বলে মেনে নিয়েছেন।

বাপুজী মাঝে মাঝে বলেন—দুর্বল শরীর তোমার, এত কাজ কি করে কর ?

বিনোবা উত্তর দেন, কাজ করবার ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে।

কিন্তু এ-কঠোরতা তো সবাই বরণ করে নিতে পারে না। তাই আশ্রমের বাসিন্দাদের সংখ্যা কমে যেতে লাগল।

আশ্রমের পরিচালক মগনলাল ভাবনায় পড়লেন। তিনি

বিনোবাকে বললেন,—আশ্রমের এই কঠোর জীবন ওদের সহ্য হচ্ছে না, তাই ওরা চলে যাচ্ছে।

বিনোবা উত্তর দিলেন,—যে যেতে চায়, সে যাক্ না! কিন্তু তাই বলে আশ্রমের নিয়মে ঢিলেমি দিলে চলবে না। নিয়ম মেনে চলবে ও কঠোর জীবন যাপন করবে এমন দু-চারজন লোকও শত শত ঢিলে লোকের চেয়ে ভাল।

কথাটি মগনলালের মনে ধরল, তিনি বললেন, তাহলে আশ্রমের নিয়ম যেমন ছিল, তেমনি থাক্!

বিনোবা বললেন,—নিশ্চয়ই।

গান্ধীজী আশ্রমের বাইরে গেছেন। এমন সময় একদিন বালকোবা পাইখানা সাফাইয়ের কাজ আরম্ভ করেন। পরদিন থেকে বিনোবাও পাইখানা সাফ করার কাজে মহা উৎসাহে লেগে গেলেন।

আশ্রমে নানা রকমের মানুষ। সবার মত তো সমান নয়। কেউ কেউ উৎসাহই পেলেন ব্যাপারটায়। কেউ বা আবার ছিঃ ছিঃ ক'রে উঠলেন। বর্ণের সেরা ব্রাহ্মণ হয়ে একি অনাসৃষ্টি কাণ্ড!

তারা বিনোবা আর তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে বসে খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু বিনোবার ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তাঁর কাজ করে চলেছেন এক মনে।

গান্ধীজী আশ্রমে নেই, চারিদিকে অসন্তোষ ফেটে পড়তে লাগল। শেষে সবাই তাঁর কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলে।

—বিনোবা এক কাণ্ড ক'রে বসেছে!

—কি কাণ্ড ?

সে মেথরের কাজ আরম্ভ করেছে।

গান্ধীজী ফিরে এলেন আশ্রমে। নিজেই এবার বললেন, —পাইখানা সাফ করা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। এ কাজ চলতে থাকবে। যদি কারুর তা সহ্য না হয়, তবে তাঁর আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার স্বাধীনতা আছে।

অভিযোগকারীরা চুপ। দু-এক জন বিরক্ত হয়ে আশ্রম ছেড়ে চলেও গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গান্ধীজীর এক বোন। বাপুজী তাঁর আদর্শে দৃঢ় রইলেন।

বিনোবার মানবতাবোধেরই জয় হ'ল।

মেথর সে তো অশুচি নয়—

নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল!
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ;
আর তুমি? তুমি তারে করেছ নির্মল।

এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে—
কল্যাণের কর্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

মেথরের কাজ করে নিজে সেই শক্তি অর্জ্জন করলেন বিনোবা।

বিনোবা মেথরের কাজ করেন, আবার পড়ানোর ভারও তাঁর উপর। আশ্রমের ইস্কুলের পাশে ছাত্রদের থাকবার বোর্ডিং। বিনোবার ওপরই তাদের দেখাশুনোর ভার। সূর্য

উঠতে না উঠতেই ঘণ্টা বাজে। ঘণ্টা ঘোষণা করে,—সবাই ওঠ, জাগ, দিনের কাজের জন্য তৈরী হও!

কিন্তু ছোট ছোট ছেলে—ঘুম-কাতুরে—উঠতে পারে না। এর জন্য গালমন্দ শোনে আশ্রমের কর্মীদের কাছে।

বিনোবা শুনে বললেন,—না, না, ভোরবেলা মঙ্গলবেলা! তখন কি কাউকে গাল মন্দ দিতে আছে। বেশ তো, আমিই ওদের জাগিয়ে দেবার ভার নিলাম।

সত্যই ভার নিলেন বিনোবা। রামায়ণে বর্ণিত বিশ্বামিত্রের রামচন্দ্রকে জাগাবার কথা মনে পড়ল তাঁর। আঁধার থাকতে-থাকতে ছাত্রদের বোর্ডিঙে এসে হাজির হলেন তিনি।

প্রথমে ধীরে ধীরে ডাকেন, তারপরে একটু জোরে। কণ্ঠে মধু ঢেলে জাগিয়ে তোলেন ছাত্রদের।

—ওঠ, ওঠ, বেলা যে হ'ল।

সবাই উঠে পড়ে।

কারুর উঠতে দেরী হ'লে আবার কাছে গিয়ে ডাকেন,—ওঠ, ওঠ!

তাতেও যদি কেউ না ওঠে, সেদিনকার মত তাকে রেহাই দেন। কাল আবার দেখা যাবে। বিনোবার আশা, কাল সে ঠিক সময়মতো জাগবে।

ছেলেদের ঘুম ভাঙানো এমন কি কাজ, শাসানি-ধমকানি দিয়েই তা চিরদিন চলে, কিন্তু বিনোবা সে-কাজকেও অন্য রূপ দিলেন। শাসানি-ধমকানি নয়, ভালবাসা দিয়ে ঘুম ভাঙানো—

এ তো সোজা কাজ নয়। সাধারণ কাজকে এমনি করেই অসাধারণ ক'রে তুললেন বিনোবা।

ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে তাদের তিনি নতুন চোখে দেখলেন। কবি বলেন, শিশুরা তো জগতের পিতা। তিনি সেকথায় মানে বুঝতে পারলেন। এরা তো প্রভুরই প্রতি মূর্ত্তি! ওদের মনকে দাবিয়ে রাখলে চলবে না হুকুমের হুঙ্কারে, ওদের মনকে মেনে চলতে হবে। তিনি বুঝতে পারলেন শিশুদের শাসন না ক'রে ভালবেসেই শিক্ষা দিতে হবে। কখনও এমন বলা উচিত হবে না—চলে যাও এখান থেকে! একঘন্টা দাঁড়িয়ে থাক! হাত তুলে দাঁড়াও! কি নোংরা কাপড়—নাক মুখের কি ছিরি!

বরঞ্চ মিষ্টি কথায় বোঝাতে হবে। নাকমুখ অপরিষ্কার দেখলে নিজের হাতে সাফ করে দিতে হবে, ময়লা কাপড় কেচে দিতে হবে, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করে দিতে হবে। এমনি ব্যবহার করলে, ওরা বুঝতে পারবে। ওদের দোষগুলো শুধরে নেবে। এ কত সুন্দর, মারপিট ক'রে কি কিছু হয়!

সত্যই এ পথে কাজ হ'ল। গুরুর স্বভাব শিষ্যে দেখা গেল।

বিনোবা বলেন,—বালকদেরও কর্তব্য—এই দিব্য ভাবনায় গুরুকে দেখা। গুরু ভাবুন, শিষ্য হরিমূর্ত্তি। আবার শিষ্যও ভাবুন গুরু হরিমূর্তি। দু-জনেরই যদি এমনি মনের ভাব থাকে, তাহলে বিদ্যা আরো কত মহান হয়ে ওঠে! তেজ আরও কত বেড়ে যায়! তাই বলি—ছাত্রও ভগবান, শিষ্যও ভগবান। এইভাবে গুরু শিষ্যে মিলন হয়। এমনি করে সৃষ্টি হ'ল নঈ তালীমের ভিত্তি। বিনোবা হলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ আচার্য।

এদিকে প্রতিদিন নিয়মিত তাঁর নিজের পড়াশুনোও চলছে। চোখ খারাপ হয়ে গেল কিন্তু চশমা নেবেন না। শেষে গান্ধীজী বললেন, চশমা নিতে হবে। অবশেষে চশমা নিলেন বিনোবা।

আশ্রমে কর্মীর অভাব নেই। বিনোবার বন্ধুবান্ধব আসেন। তাঁকে দেখেন, তারপরে আর ফিরে যেতে চান না। আশ্রমের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেন। এমনি বন্ধু গোপালরাও কালে, রঘুনাথ শ্রীধর ধোত্রে, বাবাজী মোঘে, দ্বারকানাথ হরকারে প্রভৃতি।

এঁরা বিনোবারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কঠোর জীবন বরণ করে নিলেন।

বেশ আছেন বিনোবা। একদিকে ঝাড়ুদার, রাধুনী, মেথর, অন্যদিকে শিক্ষক, ধর্মউপদেষ্টা।

এমন সময় একদিন খবর এল, মার খুবই অসুখ!

বিনোবা স্থির, অবিচল। সবই তো তিনি ব্রহ্মকে উৎসর্গ করে বসে আছেন—তাঁর আবার ভয়টা কিসের! সুখ দুঃখ—দুই তো তাঁর কাছে সমান।

আবার খবর এল, মার অবস্থা খুবই খারাপ। বন্ধুরা গান্ধীজীকেও চিঠি লিখলেন। গান্ধীজী ডেকে বললেন,—

আমরা আশ্রমের মানুষ। কোনো লোক-বিশেষের প্রতি আমাদের প্রীতি আছে তা নয়, তা ছাড়া এখন এখানে তোমার ওপর তেমন কোনো গুরুদায়িত্ব নেই, আর যা সহজভাবে পাওয়া যায়, সে-সেবার কাজ গ্রহণ করা উচিত। তুমি বাড়ি যাও। মা-বাবা অসুস্থ, তাঁদের সেবা কর।

বিনোবা গুরুর আদেশ মাথায় নিয়ে আশ্রম থেকে রওনা হলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ। তার দক্ষিণা দেশ আগেই দিয়েছিল, এবার আরো খেসারত দিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ডেঙ্গু জ্বর। সে জ্বরে সারা ভারতবর্ষ ছেয়ে গেলে। দেশে দেখা দিল চারিদিকে মৃতের আর্তনাদ।

বিনোবা বাড়ি এসে দেখলেন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় মা আর ছোটভাই দত্তাত্রেয় মরণাপন্ন। বাবা এঁরাও আক্রান্ত। মার পায়ের ধুলো নিলেন। মুমূর্ষু মা বললেন, এলি, কাজ ফেলে এলি ? কেন এলি ?

কথা কটা কাঁটার মতো বিঁধল মর্মে। ব্যথায় উদ্বেল হয়ে উঠল বুক। মার সেবায় মন প্রাণ ঢেলে দিলেন বিনোবা।

কিন্তু ছোটভাই চলে গেল, তার তিনদিন পরে মাও আর রইলেন না! বাবা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বাবা চান, হিন্দুদের সংস্কার-মতো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে। কিন্তু বিনোবা রাজী নন—মন্ত্র পড়তে ব্রাহ্মণ ডাকা হবে না, শ্মশানের ব্রাহ্মণরা মার মুখাগ্নি করবেন না। কিন্তু আত্মীয় স্বজন আজন্মের সংস্কারই মানলেন। বিনোবা শ্মশানে গেলেন না, মার ঘরে বসে পড়তে লাগলেন গীতা-উপনিষদ। মার মৃত্যুদিন থেকে তিনি বেদ পাঠ আরম্ভ করলেন।

জীর্ণ বস্ত্র তো দেহ, এক বস্ত্র ছেড়ে আর-এক বস্ত্র পরে মানুষ। সেই জীর্ণবস্ত্রের উপর কি মায়া—কেন মায়া ? আর আত্মা তো অমর। অন্ধকার হতে আলোকে চলে গেছে আত্মা —ঘোর তমসা থেকে জ্যোতির পুলিনে।

কিন্তু মানুষ ছিঃ ছিঃ করে উঠল ;—

বড় ছেলে—তার এমন কাজ! মার শ্মশান-যাত্রায় যোগ দিলে না!

বিনোবার ভ্রূক্ষেপ নেই।

আবার আশ্রমে ফিরে চললেন তিনি ; সঙ্গে মার দুটি স্মৃতি চিহ্ন। মা অন্নপূর্ণার পূজো করতেন; সেই মূর্তিটি আর তাঁর ব্যবহৃত একখানি শাড়ি।

আশ্রমে ফিরে এসে আবার কাজ, রাতে যখন ঘুমোন, শাড়িখানা ভাঁজ করে তারই উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। মার কথা ছায়াছবির মতো ভেসে-ভেসে ওঠে। মনে হয় জগজ্জননী মহামায়ার কথা। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েন।

কিছুদিন পরে খাদি আন্দোলন শুরু হয়েছে, খদ্দরের পবিত্র কাপড় দেশের মানুষ মাথায় তুলে নিয়েছে। বিনোবা মার স্মৃতি জড়ানো শাড়িখানি একদিন সবরমতী নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন।

কেন?

ও যে বিলিতি মিলের শাড়ি! বিলিতি কাপড় পুড়ছে চারিদিকে। বহ্নি উৎসব শুরু হয়েছে। তারপরেও কি এ শাড়ি রাখা যায়! তাই তো স্মৃতি বিসর্জন দিয়ে এলেন।

বাকী রইল অন্নপূর্ণার মূর্তিটি।

সেটিও একদিন কৃষ্ণদাস গান্ধীর মা কাশীবেনের হাতে সঁপে দিলেন। তিনি পূজো করতে লাগলেন।

বিনোবা পরে যখন ওয়ার্ধা আশ্রমে যেতেন, মূর্তিকে প্রণাম করতেন।

বিনোবা কি তাই বলে মাকে ভুলে গেলেন?

অমন মাকে কি কেউ ভুলতে পারে!

তাই তো মার কথা লিখেছেন তিনি—

মা, জীবিতকালে তুমি আমায় যা দিয়েছ, কেউ তা দেয় নি। মরণের পরে তুমি যা দিচ্ছ, জীবনেও তা দাওনি। আত্মা যে অমর—একথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দিলে তুমি।

...আর এক জায়গায় বলেছেন—

মা, চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর স্নেহের স্পর্শ আমি প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করি। অমরতার এ প্রমাণ নয় তো কি?

দুঃখের বেশেই তো আসেন ভগবান। দুঃখ দিয়ে দিয়ে তিনি ভক্তকে খাঁটি করে তোলেন। তাইত আবার দুঃখ এল। তিলক মহারাজের মৃত্যু!

অগ্নিমন্ত্রের পুরোহিতের মৃত্যু সংবাদ এল।

অসুস্থতার সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন, দেখা করতেও গেলেন বোম্বাইয়ে। চিকিৎসকদের রায় শুনে আশা-আশংকায় দুলছিলেন। তার চারদিন পরে এল মৃত্যু সংবাদ!

তিলক মহারাজ শুধু কি বিপ্লবী—তিনি পরমজ্ঞানী। ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর অনুপ্রেরণাই তো কিশোর বিন্যার শিরায় শিরায় জ্বালিয়ে দিয়েছিল আগুন—ইংরেজ রাজ উচ্ছেদের

স্বপ্ন সে দেখেছিল। তাঁর ঈশ্বরভক্তিও তো তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সেই তিলক মহারাজ আর নেই!

কিন্তু শোক কে করবে? শোকের দিন তো নয়। ইনিয়ে-বিনিয়ে শোক করার সময়ও নেই। দেশ সংক্ষুব্ধ। অত্যাচারে উৎপীড়নে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেশ। অত্যাচারীর আসন টলমল। সেই আসন কায়েম রাখবার জন্যে চালালে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলী। রাউলাট আইনের নাগপাশে দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিলে।

দেশ কাঁদল না, নীরবে চোখের জল ফেলল না, সিংহনাদে গর্জে উঠল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ভারতের দৃষ্টির নেতা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ রাত জেগে লিখলেন খেতাব-বর্জন পত্র। লিখলেন—

সময় এসেছে, যখন এই সম্মানের খেতাব আমাদের লজ্জা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গান্ধীজী ডাক দিলেন দেশের মানুষকে। আসমুদ্র হিমাচল সাড়া দিলে। গান্ধীজী নূতন মন্ত্র দিলেন, অভিনব অস্ত্র তুলে দিলেন দেশের হাতে। সে-অস্ত্র অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। সে আন্দোলনে সমগ্র দেশ ঝাপিয়ে পড়লো।

বিনোবা কিন্তু তাঁর কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। তিনি আশ্রমের অধ্যাপনার কাজ করছিলেন। আবার ফাঁকে ফাঁকে আন্দোলনের দিকেও লক্ষ্য রাখছিলেন। তাঁর বন্ধু শ্রীধর রঘুনাথ ধোত্রে বলেন,—

অসহযোগ আন্দোলনের সময়। বিপ্লবের প্রবাহ দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছিল। ঐ আন্দোলনকে শক্তিশালী করা ও এগিয়ে

দেওয়ার মতো শক্তি বিনোবার ছিল। তবু আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি আসলেন না। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু যেন অনেকখানি আল্‌গা। আশ্রমের জাতীর বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার উপরই ছিল তাঁর নজর। কেউ কেউ এসে তখন বলতেন, এ আন্দোলনে আপনার মতো শক্তিশালী লোকের বিশেষ প্রয়োজন।

বিনোবার উত্তর ছিল—

আমি আগামী পুরুষ তৈরী করছি। আমার কাজ এ-পর্যায়ে নয়, আগামী পর্যায়ে।

তাঁর সে কথার প্রমাণ আজ তো দিকে দিকে।

তিনি তাঁর মনের মতো ছাঁচে ঢেলে যাঁদের তৈরী করে-ছিলেন, তাঁরাই তো আজ সামাজিক অসম বিন্যাসের মধ্যে সাম্য আনবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে দেশকে যে অন্ধকার ঘিরে ধরেছে, তাঁরাই তো সেই অন্ধকার দূর করে দেবেন—আনবেন আলো। সেই আলোর তপস্যায় তাঁরা রত। বিনোবাজী তাঁদের পথ-প্রদর্শক, তাঁদের দৃষ্টির নেতা রূপে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

দুর্গম বন্ধুর পথ, কিন্তু তবু তো যাত্রীদলের সেই চলার বিরাম নেই—তাঁরা চলেছেন। সোনার সিঁড়ির জন্যে অতীতের অন্ধকারে তাঁরা ডুব দিতে রাজি নন, ভবিষ্যতের মরুমায়াও তাদের প্রলুব্ধ করে না। তাঁরা বর্তমানকেই আঁকড়ে ধরেছেন। বর্ত-মানেই তাঁরা গড়ে তুলবেন সর্বোদয় সমাজ—এই তাদের পণ।

কণ্ঠে তাঁদের অভয় মন্ত্র—

ভূত নয়, ভবিষ্যত নয়, আমরা বর্তমানের পূজারী।
আমরা সত্যযুগবাদী নই, আমরা সত্যযুগকারী।
এই বর্তমানেই আমরা সত্যযুগ আনতে চাই।

আশ্রম পরিচালক

শেঠ যমুনালাল বাজাজ মধ্য প্রদেশের মস্ত ধনী। আবার গান্ধীজীর পরম ভক্ত।

তিনি একদিন এসে হাজির।

এমনি তিনি প্রায়ই আসেন। এবার কিন্তু এলেন এক উদ্দেশ্য নিয়ে।

—কি উদ্দেশ্য ?

তিনি বাপুজীকে ধরে পড়লেন, ওয়ার্ধায় আপনাকে একটি আশ্রম করতে হবে।

বাপুজী রাজি হলেন।

আশ্রম বসল, শ্রীরামনিকলাল মোদী এলেন পরিচালক হয়ে। সঙ্গে ছিলেন বিনোবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবাজী। কিন্তু তাঁর শরীর টিকল না। তিনি কিছুদিন পরেই চলে গেলেন। এবার বাজাজ এসে ধরলেন গান্ধীজীকে।

—বাপুজী, আপনি এসে ওয়ার্ধায় থাকুন !

কিন্তু বাপুজীর পক্ষে তখন সবরমতী ত্যাগ করা অসম্ভব ছিল।

যমুনালালজী তখন বললেন, আপনি না যেতে পারেন, বিনোবাজীকে দিন।

বাপুজী বললেন, তথাস্তু!

১৯২১ সালের ৬ই এপ্রিল পাঁচজন ছাত্র সঙ্গে নিয়ে বিনোবা ওয়ার্ধায় রওনা হলেন। আর সঙ্গে এলেন বাল্যবন্ধু রঘুনাথ ধোত্রে। পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে দুজন হচ্ছেন বল্লভস্বামী আর কৃষ্ণদাস গান্ধী। এঁরা দুজনেই পরে বিশিষ্ট কর্মীরূপে পরিচিত হন।

৮ই এপ্রিল এসে পৌঁছলেন তাঁরা। আশ্রম ছিল এখন যাকে বলে মগনবাড়ি সেখানে, মাস তিনেক পরে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল বাজাজের বাড়িতে।

বাজাজ বিনোবাজীকে দেখেছেন সবরমতীতে দূর থেকে। তাতে তাঁর খানিকটা পরিচয় পেয়েছেন, এবার ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ মিলল। যত দেখেন, ততোই মুগ্ধ হন।

সবার উপরে ভগবান—তারপরে আছেন পিতা বাপুজী, এবার গুরু মিলে গেল। যমুনালাল ঘোষণা করলেন—

"এ জগতে বাপু আমার পিতা আর বিনোবা আমার গুরু। যদি আমি তাঁদের যোগ্য পুত্র ও শিষ্য হতে পারি—তাঁরাই আমাকে শান্তি দিতে পারবেন।"

সবরমতী আশ্রমে বিনোবা ছিলেন জড়ভরত। যা-কর্তব্য, তা-ই ক'রে যেতেন। দেহ ঘেমে যেত, মনের বিকাশ ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু এখানে তিনি পরিচালক। আশ্রমের খুঁটিনাটি টুকুও দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে চলবে না। এখানে হাপরে ঢালাই করে তৈরী করতে হবে দেশের সেবাব্রতী মানুষ। আত্মার

আর দেহের শিক্ষা দিতে হবে—তবে তো সম্পূর্ণ হবে আগামী পুরুষ গড়া। ভাবতে বসলেন বিনোবাজী—কি হবে সেই মানুষ গড়ার নীতি? তার শাস্ত্র? অবশেষে পেয়ে গেলেন—

অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ।
শরীর শ্রম অস্বাদ সর্বত্র ভয়বর্জন।
সর্বধর্মী সমানত্ব স্বদেশী স্পর্শ ভাবনা
হী একাদশ সেবাবীঁ নম্রত্বে ব্রত নিশ্চয়ে।

এই একাদশ ব্রতই ছিল গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমেরও মূল মন্ত্র। গান্ধীজীই ছিলেন এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। বিনোবাজী একে শ্লোকবদ্ধ ক'রে দু'বেলার আশ্রম প্রার্থনায় যুক্ত ক'রে দেন।

এই একাদশটি ব্রত হ'ল আশ্রমের প্রাণ। এই ব্রত যিনি গ্রহণ করবেন, তিনিই আশ্রমিক হতে পারবেন। স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান—খ্রীস্টানে সেখানে বাধা নেই। বাবা-মার সঙ্গে থাকতে পারবে সন্তানরাও।

কাজ শুরু হয়ে গেল। এলোমেলো কাজ নয়, রুটিন বাঁধা, ছক কাটা কাজ। আবার বিশ্রামও রুটিন-মাফিক। একটু সময়ের অপচয় নেই। সাত ভাগে বিভক্ত হল আশ্রমের কাজ।

১। ধার্মিক শিক্ষা—ব্রতপালন, ঈশ্বরোপাসনা, শাস্ত্রপাঠ,, মহাপুরুষের বাণী অধ্যয়ন।

২। শিল্প শিক্ষা—সুতাকাটা, তুলাধোনা, তাঁতবোনা, কৃষি, ছুতারের কাজ, সেলাই ইত্যাদি।

৩। ভাষা শিক্ষা—সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, প্রাদেশিক ভাষা।

৪। সামাজিক শিক্ষা—রাজনীতি, সমাজ-শাস্ত্র, অর্থ-শাস্ত্র, ইতিহাস ইত্যাদি।

৫। ব্যবহারিক শিক্ষা—গণিত, হিসাব রাখা, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

৬। কলাত্মক শিক্ষা—সংগীত, চিত্রকলা, সাহিত্য।

৭। শারীরিক শিক্ষা—রান্নাকরা, জলতোলা, গমপেষা, পায়খানা সাফাই।

একাদশ ব্রত ও সপ্তপদী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রেখে প্রতি দিনের কর্মসূচী তৈরী হলো।

সকাল—৪টায় জাগরণ।

৪—৬— শৌচাদি ও স্নান।

৬ – ৬-৩০—উপাসনা, গীতাপাঠ।

৬-৩০— ৯-৩০—বুনাই, রান্না, ক্লাস, সুতাকাটা।

৯-৩০—১১—ভোজন, বাসন মাজা ইত্যাদি।

১১ – ৩—বয়ন শিল্প।

৩—৫—রান্না, ক্লাস।

৫—৬-৩০—ভোজন ও বাসনমাজা ইত্যাদি।

৬-৩০—৭—উপাসনা।

৭—৮-৩০ পড়াশুনা।

৮-৩০—৪—নিদ্রা।

আশ্রমের নিয়ম অত্যন্ত কঠোর ভাবে পালন করা হতো। এ সম্বন্ধে শিবাজী বলেন, প্রত্যেক কর্মীকে ১০ পাঃ বীজসমেত তুলো দেওয়া হতো। এর বীজ ছাড়িয়ে তুলো ধুনে সুতো কেটে ৩৬ ইঞ্চি বহরের ২৫ বর্গ গজ কাপড় তৈরী করে দিতে

পারলে তবে কর্মীর পাশের তালিকায় নাম উঠত। প্রাথমিক উৎসাহে কোন কর্মী গিয়ে তুদিনও টিকতে পারত না। বিনোবার কঠোরতা ছিল আগুণের মতো প্রখর !

সেদিনের কথা বলেছেন ছাত্র দত্তোবা দাস্তানে—

১৯২৬ সনে আমি বিনোবার আশ্রমে যাই। আমার তখন চৌদ্দ বছর বয়েস। সাধারণ স্কুলের রীতিতে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না বলে জানতাম। ক্রমেই দেখলাম সত্যিই তাই। সারাদিন কাজ আর কাজ! শিল্পের মধ্যে আছে তাঁত বোনা আর গৃহকর্মের মধ্যে রান্নাবান্না।

সকাল-সন্ধ্যায় শুনি বিনোবার প্রার্থনা আর তার ব্যাখ্যা। তুপুরে খাওয়ার পরে আধ ঘণ্টা খেতে ধান-নিড়ানোর কথা। আবার রাতের খাওয়ার পরে আগুণের ধারে বসে গল্প। এই ছিল আমাদের পাঠ্যসূচী। গীতার ক্লাসও হোত আধ ঘণ্টা। বড় বড় লোকেরা আলাপ-আলোচনা করতেন, কান পেতে শুনতাম। সকলের উপরে বিনোবাজী। তিনি আমাদের পড়াতেন, আবার নিজের হাতে রেঁধেও খাওয়াতেন। ঘরে আমাদের ক্লাস বসত না।

বিনোবা যেখানে যেতেন, হাটে-মাঠে-ঘাটে—সেইখানেই ক্লাস বসে যেত। কতদিন হাঁটতে হাঁটতে শুনেছি বেদ-বেদান্তের কথা আর কবীরের দোঁহার আলোচনা।

বিনোবা ঠাট্টা ক'রে বলতেন, ভোরবেলা সূর্য কিরণ বিলিয়ে দেন, আবার সন্ধ্যে হলে তাদের জড়ো করে নিয়ে যান, তোমরাও তেমনি করবে। বিনোবাজীর কাছে যখন থাকতাম, কান থাকতো

সজাগ—হৃদয় থাকতো উন্মুখ। তাই সহজেই বহু জিনিস শিখে ফেলতাম।

সঙ্গী ধোত্রেজী বলেন, কে বুদ্ধিমান, কে বুদ্ধিহীন—ছাত্র এলে একথা কখনো বিনোবা খতিয়ে দেখতে বসতেন না। তাঁর কাছে কাজ সম্পর্কে যেমন তিনি বলে থাকেন, যে কাজ জোটে সেটাই ভাল। শিক্ষা সম্বন্ধেও তাই। যে সব ছেলে আসত তিনি তাদের এগিয়ে দিতেন। তারই ফলে একদল একনিষ্ঠকর্মী আমরা পেয়েছি।

সত্যাগ্রহী বিনোবা

দেশ জেগেছে। পতাকার তলে এসে জুটেছে দেশের নর-নারী। কোনো ভেদাভেদ নেই। ধনী আছে, গরীব আছে, পণ্ডিত আছে, মূর্খ আছে। আর যা কেউ কখনো দেখেনি, দলে দলে এসে জুটেছে চাষী আর মজুর।

সবার মুখে এক কথা, আমার হিন্দুস্থান, আমার ঝাণ্ডা। জান দিয়ে সে ঝাণ্ডার মান রাখবো—

ঝাণ্ডা উঁচা রহে হমারা।

কিন্তু এই উল্লাস এই জাগরণ সহ্য হয় না বৃটিশ সিংহের। সে চায় ভারতবাসীকে চিরকাল পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে। তাইতো চায় তাদের পতাকাকে মাটির মধ্যে পুতে ফেলতে।

হুকুম জারি করলে ইংরেজ—পতাকা তোলা নিষেধ!

কিন্তু দেশের মানুষ জেগে গেছে।

গান্ধীমহারাজ তাদের জাগিয়ে তুলেছেন!

১৩ই এপ্রিল, উনিশ শো তেইশ সাল। জাতীয় সপ্তাহের উদ্‌যাপন দিকে দিকে। ঝাণ্ডা হাতে বেরুল নাগপুরের মানুষও।

আকাশে উড়ছে পতাকা, ঘোষণা করছে ভারতের মুক্তির সংকল্প। কিন্তু শাসকবর্গ রুখে এল বাধা দিতে। দলে দলে মানুষ নির্যাতিত হ'ল, গ্রেফতার হ'ল। ব্রিটিশ সিংহ খুশী, তাহ'লে আর উঠবে না ঝাণ্ডা! ভারতের মুক্তির আকাংক্ষা সে পায়ের তলায় দলে-পিষে দিয়েছে! কিন্তু তা তো নয়।

সারা নাগপুরে সাড়া জাগল। দলে দলে মানুষ বেরিয়ে এল। পতাকার অপমান, তাদের অপমান, জাতির অপমান —দেশের অপমান। সে-অপমান তারা সইবে না। তাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন শেঠ যমুনালাল বাজাজ।

ইংরেজশক্তি শাসনতন্ত্রের দণ্ড নিয়ে এগিয়ে এল, এলোপাথাড়ি আঘাত হানলো। কিন্তু জনতা তেমনি চলল শান্ত মুখে।

গর্জে উঠল অত্যাচারী শাসক। যমুনালাল বন্দী হলেন, বন্দী হলেন দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক।

সরকার নিশ্চিন্ত, আন্দোলন এবার শেষ।

কিন্তু যে-আগুন জ্বলে উঠেছে, সে কি অমনি ফুঁয়ে নিবে যায়? তা যায় না।

বরং বাধা পেলে সে আরো লেলিহ শিখায় জ্বলে ওঠে। দেশ অপমানে বিক্ষুব্ধ। সেই বিক্ষোভকে রূপ দিলেন কংগ্রেসের

তখনকার সভাপতি। ঘোষণা করলেন তিনি—সারা ভারতে পতাকা-দিবস পালন করা হবে। সত্যাগ্রহী চাই!

দলে দলে ছুটে এল সত্যাগ্রহী।

বিনোবা তখনো আশ্রমে আগামী পুরুষ গড়তে ব্যস্ত। তাঁর কাছেও খবর চলে গেল। ভাবলেন, সত্যাগ্রহীরা আসছেন দেশের নানা দিক থেকে আর আমাদের এই সত্যাগ্রহ আশ্রম কি শুধু আগামীর সত্যাগ্রহী গড়বার কাজই করবে? না, না, আমরাও যোগ দেব।

তিনি তাঁর নিজের কাগজ মহারাষ্ট্র ধর্মে লিখলেন। আগুণের স্ফুলিঙ্গ যেন ঝরে পড়ল লেখায়। নাগপুরের নাম দিলেন—ধর্ম-ক্ষেত্রে নাগপুরে। ধর্মের আহ্বানে ছুটেছেন সত্যধর্মী সৈনিকের দল। সত্যের জন্য তাঁরা জীবন দেবেন—এই তাঁদের পণ।

বিনোবা নাগপুরে ছুটে এলেন দলবল নিয়ে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সত্যাগ্রহ যুদ্ধে। ১৭ই জুন (১৯২৩) নাগপুরে এক উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দেওয়ায় গ্রেপ্তার হলেন তিনি।

বিনোবার শিবিরে তখন ৩০০ সত্যাগ্রহী ছিলেন—সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। এই প্রথমবার তাঁর ইংরেজের জেলের অভি-জ্ঞতা। বন্ধুরা দেখা করতে এসে শুধালেন—

কেমন লাগছে জেল?

বিনোবা উত্তর দিলেন, আপনারা সার্কাস দেখেছেন তো? সার্কাসে মানুষ করে পশুর উপর কর্তৃত্ব, আর জেলে ঠিক তার উল্টো। জেলে পশু করে মানুষের উপর কর্তৃত্ব।

এর চেয়ে ভাল জেলের বর্ণনা আর কি হতে পারে ! জেলের কর্তারা শুনে মুখ নিচু করে রইলেন।

জেলে নাম লেখানর পালা। বিনোবা লেখালেন বিনোবাজী নরহর ভাবে। লোকে জিজ্ঞাসা করে 'জী' কেন লেখালেন ? বিনোবা উত্তর দিলেন—এখানে তো কোন লোকের সম্মান নেই তাই নিজেই নিজের নামের সঙ্গে 'জী' লিখে সম্মান দিয়েছি।

আকোলা জেলে বিনোবাজীকে বদলী করা হ'ল।

আকোলায় তখন মহা গোলমাল।

সরকার রাজবন্দীদের দিয়ে কাজ করাতে চান, তাঁরা বেঁকে বসেছেন, কাজ করবেন না।

বিনোবা এসেই বললেন—ভাই সব, কাজ না ক'রে খাওয়া তো পাপ। জেলে এসে তবু কিছুটা মেহনত করবার সুযোগ আমরা সবাই পেয়েছি—এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ আমাদের করতে হবে।

রাজবন্দীরা বিনোবার কথায় এবং ব্যক্তিত্বে কাজে লেগে গেলেন।

সব উত্তেজনা শান্ত। জেল কর্মশালা হয়ে উঠল। গুঞ্জন উঠল কর্মের। কর্তৃপক্ষ অবাক্। তাঁরা ভাবলেন—

বিনোবা জাদু জানে।

মহাদেব দেশাই ও রাজাজী এ প্রসঙ্গ নিয়ে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখলেন। দৈনিক পত্রিকা গুলিতেও খবর বেরুল।

বিনোবার নাম এই প্রথম দেখা গেল খবরের কাগজে। শুনল দেশের মানুষ। এদিকে আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে

পড়তে লাগল। সর্দ্দার প্যাটেল এসে নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। সরকার প্রমাদ গণলেন। নরম হয়ে আপোস করতে এগিয়ে এলেন। ঝাণ্ডার উপর বিধি-নিষেধ উঠে গেল। রাজবন্দীরাও মুক্তি পেলেন।

আবার নিঃশব্দে আশ্রমে ফিরে এলেন বিনোবা। জেলে নানা প্রদেশের রাজবন্দীদের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁরা সবাই জেল থেকে বেরিয়ে আশ্রম দেখতে এলেন।

বিনোবা সবাইকে আশ্রমের কাজকর্ম ও দিনচর্যার পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন।

আবার আগামী পুরুষ গড়ার পালা চলল। আবার শুরু হলো মৌন তাপসের জীবন সাধনা।

কিন্তু ডাক পড়ল আবার ১৯২৪ সালে।

এখন যেটি কেরল রাজ্য; সেই কেরল রাজ্যের ভিতরে ভাইকম। হিন্দুদের এক মস্ত তীর্থ। ভাইকমের শিবের মন্দির গ্রামের মাঝখানে। মন্দিরে ব্রাহ্মণদের একচেটে অধিকার। সেখানে ঢুকতে পায় না হরিজনরা। তারা সদর রাস্তা দিয়েও হাঁটতে পায় না, কূয়োর জল ছোঁয়াও তাদের মানা। মালাবারী ব্রাহ্মণদের এমনি অখণ্ড প্রতাপ! তারা বোঝেন না—

মানুষের দেবতারে ঘৃণা করি দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

সেই প্রাণের ঠাকুরের প্রতি ঘৃণা তো সইতে পারেন না ভারতের জনগণমন নায়ক মহাত্মাজী। সত্যাগ্রহ তাঁর হাতিয়ার। তিনি জনগণের হাতে সে হাতিয়ার সঁপে দিয়েছেন।

মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ শক্তি মৃতের প্রাণে জাগায় নব-জীবনের স্পন্দন, দুর্বলকে করে তোলে বলীয়ান। 'সত্যাগ্রহ' ভারতের নবজাগরণের বিদ্যুৎ-পরশ। হাজার হাজার বছরের অত্যাচার অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে আবির্ভূত এক মহাশক্তি।

ভারতের আকাশে বাতাসে তখন কেবল সত্যাগ্রহরই গুঞ্জন।

ভাইকমের জনগণও ভাবলেন সেই হাতিয়ার নিয়েই তাঁরা লড়াই করবেন। ছুটে এলেন তাঁরা গান্ধীজীর কাছে।

গান্ধীজী বললেন—

অচ্ছুৎদের অধিকার জিনে নিতে হবে, হরির মন্দিরে হরিজনকে ঠাঁই দিতে হবে।

কিন্তু তিনি অসুস্থ, অসুস্থ শরীর নিয়ে কি ক'রে যাবেন ত্রিবাঙ্কুরে? অথচ লাঞ্ছিত মানবতার এ ব্যাকুল আহ্বান তো উপেক্ষা করা চলে না। তিনি চারদিকে তাকালেন। এমন কি কোন সৈনিক নেই, যিনি এই ভার নিতে পারেন?

পারেন—একজন পারেন—তিনি বিনোবা!

বিনোবার উপর দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। সঙ্গে আশীর্বাদ। শিষ্য বল্লভ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন বিনোবা ভাইকম-এর উদ্দেশ্যে।

পথে জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কালড়ী গ্রাম। দেখে যাবার খুব সাধ।

শুধালেন সঙ্গী ভদ্রলোককে—কালড়ী এখান থেকে কত দূর?

—মাইল দশেক হবে। যাবেন?

—না। বিনোবা উত্তর দিলেন।

এ বিষয়ে পরে তিনি বলেছেন, সত্যাগ্রহের ব্যাপারে গিয়েছিলাম। পথের মধ্যে অন্য কাজে আর কোথাও যাওয়া তো উচিত নয়।

এমনি তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা। শংকরের উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে তিনি ভাইকমের দিকে এগিয়ে চললেন।

রাতে স্বপ্ন দেখলেন জগৎগুরু শংকরকে! কালড়ী গ্রামখানাও ভেসে উঠল স্বপ্নদর্শনে। তাঁর কামনা পূর্ণ হ'ল। স্বচক্ষে দেখার চেয়ে এ-আনন্দ বুঝি আরো নিবিড়। এ অনুভূতি বুঝি আরো রসঘন। দেহমন তাঁর শংকরময় হয়ে উঠল।

ভাইকমে এসে দেখলেন, শ্রীনারায়ণ স্বামী ও কেলপ্পনজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহী সৈনিকরা বদ্ধ পরিকর—তাঁরা হরিজনদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা করবেন। এদিকে সনাতনীরাও অটল—স্বাধীকার প্রতিষ্ঠায় বাধা দেবেন। সহায় তাঁদের দেশীয় ত্রিবাঙ্কুর সরকার। ত্রিবাঙ্কুরের পুলিশ গ্রামখানি ঘিরে আছে। বিনোবা দক্ষ সেনাপতি, তিনি ভাবতে বসলেন।

সত্যাগ্রহের মূল দাবী সদর রাস্তায় হরিজনদের চলার অধিকার। সেই দাবি মনে রেখে তিনি ছোট ছোট সত্যাগ্রহী দল গড়ে তুললেন। তাতে হরিজনরাও রইলেন।

প্রথম দল রওনা হ'ল, সনাতনীরা রুখে দাঁড়াল। লাঠি চালাল।

কিন্তু তবু তো থামে না, একদল ঘায়েল হয়, আর একদল যায়। আবার পুলিশও ঢালাও গ্রেফ্‌তার চালাল।

কিন্তু সৈনিকের অভাব নেই। বিস্তৃত দেশ, বহু মানুষ। নানা প্রদেশ থেকে ছুটে এল মানুষ। অনাচারের বিরুদ্ধে প্রাণ দেবে—দৃঢ় তাদের সংকল্প।

বিনোবা তাদের সেনাপতি হয়ে তাদের চালাতে লাগলেন।

পুলিশ প্রমাদ গণলে।

দেশীয় রাজ্যের ছোট জেল, সেখানে তো এই অগণন মানুষের ঠাঁই হবে না। এরা যে সাহারার বালুকণার মতো, সাগরের বারিকণার মতোই অগণন।

পুলিশ আর গ্রেফ্তার করে না। এবার তারা শান্তি-রক্ষকের ভূমিকা ছেড়ে নিজেরাই পথরোধ করে দাঁড়াল।

গান্ধীজীর কাছে পরিস্থিতির খবর দিয়ে নির্দেশ চাইলেন বিনোবা। গান্ধীজী ব'লে পাঠালেন, সত্যাগ্রহীরা যেন এগিয়ে না গিয়ে ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

যেমন নির্দেশ তেমনি কাজ। সত্যাগ্রহীরা এক-এক দল তু'ঘণ্টা তু'-পালা ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। যখন পালা থাকে না চরখা নিয়ে বসে যান।

চরখা ভোঁমরার গান গায়, দেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ইঙ্গিত দেয়। যখন পালা আসে, চরখা রেখে গিয়ে দাঁড়ান সত্যাগ্রহীরা।

কারো মনে ঘৃণা নেই, ক্রোধ নেই। আছে তুঃখ সহনের কঠোর সংকল্প। আর বিরোধকারীর প্রতি অসীম করুণা।

এদিকে বর্ষা নামল। পথে থৈ থৈ করে জল। বিনোবা তবু অচল, অটল।

কাঁধ-সমান জলে সত্যাগ্রহীরা পালা করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে পুলিশেরও সেই এক দশা।

এক বছর চার মাস এমনি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতে অবিরাম চলল লড়াই। শেষে মহাত্মাজী এসে ত্রিবাঙ্কুর সরকার ও সনাতনীদের সঙ্গে দেখা করে মিটিয়ে ফেললেন লড়াই।

পথ খুলে গেল অচ্ছুতদের জন্য, মন্দিরের দুয়ার গেল খুলে।

হরির মন্দিরে হরিজন পেল ঠাঁই।

মহাত্মাজীর যোগ্য সেনাপতি বিনোবা সত্যাগ্রহ সংগ্রামে জয় লাভ ক'রে নিঃশব্দে আশ্রমে ফিরে এলেন।

আশ্রম জীবনে বিভিন্ন প্রয়োগ

আবার আশ্রম। আবার নিজের সাধনা।

শ্রম সে-সাধনার মূল মন্ত্র। শ্রম তৈরী করেছে সমাজকে, শ্রমে গড়ে উঠেছে গ্রাম, নগর, মহানগর। তার উত্তুঙ্গ মিনারে মিনারে আছে কত স্বেদধারার স্বাক্ষর। শ্রম শিল্পকলা, স্থাপত্য—পৃথিবীর যা কিছু মহান এবং প্রয়োজনীয়—সবই তো শ্রমের দান। মানুষের জীবনের বুনিয়াদই হলো শ্রম। শ্রমাশ্রয়ী জীবনই সত্যিকারের স্বাধীন জীবন। আধ্যাত্মিক রাজনৈতিক আর্থিক ও সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে এই চতুর্বিধ জীবনের যাবতীয় বৈষম্য ও অসুস্থতা দূর করতে হ'লে জীবনকে করতে হবে শ্রমাশ্রয়ী। দিতে হবে শ্রমের মূল্য—শ্রমিকের মূল্য।

সেইজন্য আগে চাই শ্রমিক হওয়া। শ্রমিক হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে অপরকে শোষণ না ক'রে নিজেদের জীবন গ'ড়ে তুলতে হবে। তবেই গড়বে শোষণমুক্ত সমাজের ভিত্তি। তাই আশ্রম জীবনকেও শ্রম আধারিত করতে হবে।

সেইজন্য আশ্রমকে তিনি বানিয়ে ফেললেন এক কর্মশালা। পয়সার হাত থেকে তিনি আশ্রমকে মুক্ত করতে চান।

সবাই নিজের-নিজের ব্যক্তিগত কাজ তো করেনই, আবার নিজেদের খরচও জোগাড় করতে হয় মেহনৎ ক'রে। সকালে খাবার তৈরী করেন সবাই মিলে, তারপরে খাবার খেয়ে কাজে বসেন। যার যে কাজ। সারাদিন কাজের পর সন্ধ্যেয় হয় কাজের হিসেব নিকেশ। সেদিনের আয় থেকে সকালের খাবার খরচ বাদ দিয়ে যা উদ্‌বৃত্ত থাকে, তাই দিয়ে রাতের খাবারের বন্দোবস্ত হয়।

আশ্রমে সবাই সমান। সবাইকেই কর্মশালায় কাজ করতে হয়। আর সে-কাজে কোনটা ছোট, কোনটা বড় নেই। যার যেমন পছন্দ, তিনি তেমনি কাজ করেন। বিনোবা ঝাড়ু তুলে নিলেন হাতে, ঝাড়ুদার হলেন। রাধাকৃষ্ণ বাজাজ তুলে নিলেন ছুতোরের হাতিয়ার। প্রতিদিন আটআনা তার রোজগার হতে লাগল। গোপাল রাও কালেও মধ্যম পিঞ্জন দিয়ে রোজ দেড় সের তুলো ধুনতে লাগলেন। এমনি নিত্য দরকারী কাজের গুণগুণানি উঠল।

খাওয়া-দাওয়ায়ও নানা পরীক্ষা চলতে লাগল।

বিনোবা বলেন—যেমন আহার, তেমন মন।

আশ্রমে নিরামিশ আহার তো বরাবরই ছিল। এবার তিনি দুধও ছেড়ে দিলেন। পুরো চার বছর আর দুধ ছুঁলেন না। তারপরে তরকারী সিদ্ধ না করে কাঁচা খাওয়ার পরীক্ষা চলল। সেও চার-পাঁচ মাস ধ'রে। কেরোসিন তেল বাতিল ক'রে অন্যান্য তেল দিয়ে আলো জ্বালাবার পরীক্ষাও চলল।



বিনোবা নির্দেশ দিলেন, আশ্রমে এক বছর আর কেরো-সিনের বাতি জ্বলবে না। যে কথা—সেই কাজ। নানারকম তেলের রকমারি লণ্ঠন তৈরী হ'ল। এগুলোর মধ্যে আশ্রমের প্রথম পরিচালকের নামে তৈরী 'মগন দীপ' হ'ল সবচেয়ে ভাল।

আশ্রমে সাপ আছে অনেক। আশ্রমিকরা মারেন না, সাপ ধ'রে দূরে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসেন। কোন্‌টা নির্বিষ ঢোঁরা,

কোন্‌টা বিষধর কেউটে, সেটাও তাঁরা শিখে ফেললেন। সবাই হলেন ওস্তাদ সাপুড়ে। এর মধ্যে ভাউ পান্‌সে তো আবার সকলের চেয়ে সেরা।

আশ্রমে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করার উপায় নেই কারুর, ২৪টি ঘণ্টা নিয়মে বাঁধা। কাজ আর কাজ! তুলোধোনা, সুতোকাটা, তাঁত বোনা, রান্না করা, বাসন মাজা, ঝাড়ু দেওয়া, পড়াশুনা করা—সব সময়েই কাজ।

ওয়ার্ধায় কর্মযোগ শুরু হ'ল বিনোবার।

এরই মধ্যে আবার যখনি বাইরে ডাক পড়ে, ছুটে যান।

১৯২৪ সাল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য গান্ধীজী একুশ দিন ধরে অনশন করে আছেন। তাঁকে গীতা, উপনিষদ পড়ে শোনাবার জন্য বিনোবার ডাক পড়ল। বিনোবা বহু কাজ ফেলে ছুটে গেলেন। গান্ধীজী এখন বড় দুর্বল। তাই প্রার্থনার ভারও তাঁর উপর পড়ল। বিনোবার প্রার্থনা সভায় মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ আলী, মালবীয়জী প্রভৃতিও উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনবার জন্য উপস্থিত থাকতেন। মালবীয়জী বিনোবার ব্যাখ্যায় খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

অনশন ব্রত শেষ হতেই বিনোবা আবার দিল্লী থেকে ওয়ার্ধায় ফিরে এলেন।

ফিরে আসার আগে দিল্লীতে এক সর্বধর্ম পরিষদের অধিবেশন হ'ল। এখানে তিনি কঠোপনিষদ অবলম্বনে এক অপূর্ব বক্তৃতা করলেন। তাঁর ভাষণ শুনে শ্রোতাদের মনে অপূর্ব সাড়া জেগে

উঠল। আর একটা ব্যাপার সবাই জানলে—বিনোবা বড় সময়নিষ্ঠ, ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় চলেন।

পরিষদের অধিবেশন বসত সকাল ন'টায়। ন'টার ঘণ্টা পড়তে-না পড়তে যে দুজন এসে পরিষদগৃহে হাজির হতেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিনোবা, আর একজন শ্রীমতী য়্যানি বেসাণ্ট।

বিনোবা বলেন, সময়নিষ্ঠা ঈশ্বর নিষ্ঠারই সমান। সেই ঈশ্বর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল বিনোবার কাছ থেকে।

যাহোক, আবার কর্মশালায় ফিরে এলেন তিনি, কাজ চলতে লাগল। নিজের শ্রমের অন্ন সবাই খেয়ে খুশি, সুখী। বিনোবা তো পরম সুখী। উৎসবেও কাজ বাদ দিতে চান না।

একবার আশ্রমিকরা ধ'রে বসলেন, রামনবমী উৎসব পালন করবেন। বিনোবা বললেন, বেশ তো! কিন্তু কি ভাবে উৎসব করবে বল তো? সবাই কর্মী, কর্মীর মতোই উত্তর দিলেন—আমরা সুতো কেটে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন পালন করব। বিনোবা হেসে বললেন, তথাস্তু!

পরদিন রামনবমী। সবাই বসে গেলেন চরখা নিয়ে। বিনোবাও আছেন দলে। চরখা কাটছেন, গুঞ্জন ধ্বনি উঠছে। অঝোরে চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ভাবাশ্রু। বজ্রের মতো কঠোর বিনোবার কুসুমের মতো কোমল হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে অফুরন্ত প্রেমসমুদ্র ছিল ভাবের আবেগে দুকুল ছাপিয়ে তা উপচে পড়ছিল। আশ্রমিকগণ সেই প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করছিলেন। উৎসব এমনি করে চোখের জলের ভিতর দিয়ে

সমাপ্ত হ'ল। চোখের জলে বিনোবা ভগবান রামচন্দ্রের পূজো করলেন। আর যাঁর স্মরণে ভক্ত হৃদয়ের গভীরতম উৎস থেকে অজস্র ধারে প্রেমের ঝরণা বয়ে চলছিল তিনি কি তা না শুনে থাকতে পেরেছিলেন!

লবণ সত্যাগ্রহ

১৯৩০ সাল।

আশা আর আনন্দের পাখায় ভর করে এল সালটি।

কেন?

কংগ্রেস স্থির করলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। দেশে বসাতে হবে স্বরাজ্য সরকার!

কেমন করে বসবে? কি ক'রে তা সম্ভব হবে?

নেতা গান্ধীজী জানিয়ে দিলেন আইন অমান্য হবে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র।

কিন্তু কি করে সে-অস্ত্রের প্রয়োগ করবেন, সে-সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার কিছু বলছেন না।

ভারতের মানুষ নির্বাক বিস্ময়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তিনি এবার জানিয়ে দিলেন, লবণ আমাদেব সবচেয়ে দরকারী জিনিস, সেই লবণের উপর সরকারী কর বহুদিন থেকেই আছে। সেই আইন ভাঙতে হবে। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস আমরা নিজেরা তৈরী করব—আমাদের সেই দাবি সরকারকে মানতে হবে।

গান্ধীজী সেই আইন প্রথম ভাঙতে আশ্রম থেকে যাত্রা করলেন ডাণ্ডী সমুদ্র উপকূলে।

আইন ভাঙা হ'ল, গান্ধীজী গ্রেফ্‌তার হলেন। কিন্তু আন্দোলন তো থামল না। দেশময় ছড়িয়ে পড়ল আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকার সিংহ গর্জন ছেড়ে বাধা দিতে এলেন, আইন অমান্যকারীদের মাথায় লাঠির বৃষ্টি হতে লাগল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রাণ তো শঙ্কা জানে না—জীবন-মৃত্যু যে তাদের পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন!

দেশ ডাক দিয়েছে, সে-ডাক এসে পৌঁছল নিভৃত ওয়ার্ধা আশ্রমে। বিনোবাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লবণ আইন অমান্যের সঙ্গে জড়িত আছে দেশের অন্যান্য অনাচার ঘোচাবার দাবিগুলি। মাদক দ্রব্য বর্জন করতে হবে, তাড়িখানার মূল উৎস তালগাছ, তাও কাটতে হবে। দুর্বল হাতে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বিনোবা।

১৯৩১ সালে খান্দেশে সত্যাগ্রহীদের এক সম্মেলন বসল। বিনোবা সভাপতি।

সভাপতির আসন থেকে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন—

"ভাইসব, মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সবার এখানে ঠাঁই আছে। আর সবাই এতে অংশ নিয়েছেন। রামনাম যেমন সকলেই জপ করতে পারে, এ-সত্যাগ্রহেও তেমনি সকলেই যোগ দিতে পারে।

যুদ্ধে সবাই অংশ গ্রহণ করে না, কিছু লোক তাতে যোগ দেয়।

কিন্তু যে-যুদ্ধে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সে-যুদ্ধ তো মহান। সকলের সংগ্রাম করা জিনিসের সংরক্ষণও সকলে মিলেই করে থাকে, সে-জিনিস সকলে মিলেই রক্ষা করে থাকে। এতে সকলেরই আনন্দ। আমরা লড়াই করেই স্বরাজ লাভ করব। এই অহিংস আন্দোলন সকলের হৃদয়ই স্পর্শ করেছে। মহাত্মাজীর এই মহান পথই সকলের আত্মার অভ্যুদয় ঘটাবে। সকলকে প্রেরণা জোগাবে।"

এমনি আহ্বান তিনি দেশের নানা বক্তৃতামঞ্চ থেকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। দেশবাসীকে ডেকে ডেকে আইন-অমান্য আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, স্বরাজের কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কম্বুকণ্ঠ গর্জে উঠল। ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, অগ্নিময়ী বাণী। তিনি বললেন—

'স্বরাজের জন্য প্রাণ দিতে হবে। প্রাণ নেওয়া নয়, প্রাণ দেওয়া। স্বাধীনতা দেবীর চরণে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে হবে। গোলাম হয়ে আর থাকব না, কিছুতেই থাকব না। স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা আমরা গ্রহণ করেছি। তারই প্রতীক স্বরূপ যে পতাকা আজ উত্তোলন করলাম তা কখনও অবনমিত হতে দেব না। দেশ আমাদের ত্যাগের প্রতীক্ষায় বসে আছে; দেশ মাতৃকার সে কামনা পূর্ণ করতেই হবে।"

সেই দিনই ধুলিয়ার ধর্মশালায় ব্যবসায়ীদের সুমুখে আর একটি ভাষণ দিলেন,—

'ব্যবসায়ী ভাই সব! দেশে এক নতুন হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে, জগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন। রাশিয়ায় যা হয়েছে সে সম্বন্ধে ভাবুন আমরা চাই আমাদের দেশ রক্তপাত থেকে বেঁচে যাক্। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে হিংস্র সংঘর্ষ না হোক। কিন্তু সত্যই যদি আপনারা রক্তপাত থেকে বাঁচতে চান তবে আপনাদের ত্যাগের দীক্ষা নিতে হবে।

আজ আমাদের মধ্যে গান্ধীজী আছেন ; রক্তপাত থেকে সবাইকে তিনি রক্ষা করছেন। হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে চলেছেন। কিন্তু আপনারা তাঁর কথা যদি না শোনেন তবে রক্তপাত অবশ্যই হবে। গরীবের সর্বনাশ করবার চেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হোন। ভারতীয় সংস্কৃতি তাদের সন্তোষের পাঠ শিখিয়েছে। কিন্তু এই সন্তোষ-প্রিয় দরিদ্র জনতার ধ্বংসের চেষ্টা যদি আপনারা করেন তবে তারা রুদ্ররূপ ধারণ করবে। আর আমি স্পষ্টই বলছি তারা আপনাদের শশা-কুমড়োর মত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। সুতরাং যদি আপনারা এ থেকে বাঁচতে চান, দেশের সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করতে চান, তবে মহাত্মাজীর কথা শুনুন। কত বছর ধরে তিনি বলে আসছেন—বিদেশী মাল আনা বন্ধ করুন, স্বদেশী জিনিস কিনুন। খদ্দর গ্রহণ করুন। এর বেশী আমি আর কি বলব ?'

বক্তৃতার শেষে তিনি সন্ত তুকারামের একটি অভঙ্গ এমন করুণ সুরে আবৃত্তি করলেন যার ফলে শ্রোতাদের অনেকের চোখে জল এসে গেল।

ধুলিয়া থেকে জলগাঁও গেলেন বিনোবা, এখানেও তাঁর বক্তৃতা করার কথা ছিল। সভায় বাধা দিলেন সরকার। গ্রেপ্তার হয়ে বিনোবা চলে গেলেন ধুলিয়া জেলে। রাজবন্দীতে জেল ভরে গেল। দেখতে-দেখতে শেঠ জমুনালাল বাজাজ, মণিলাল কোঠারি, রামেশ্বরজী, দত্তোবা দাস্তানে ও সানে গুরুজী প্রভৃতিও এসে পড়লেন। সবাই তাঁরা একসঙ্গে সুতো কাটতেন, একসঙ্গে গম পিষতেন, একসঙ্গে বসে নানাবিষয়ের চর্চা করতেন। জেল আশ্রমে পরিণত হ'ল।

জেলে বিনোবাকে 'বি' ক্লাস দেওয়া হ'ল। অন্যান্য বন্ধুদের

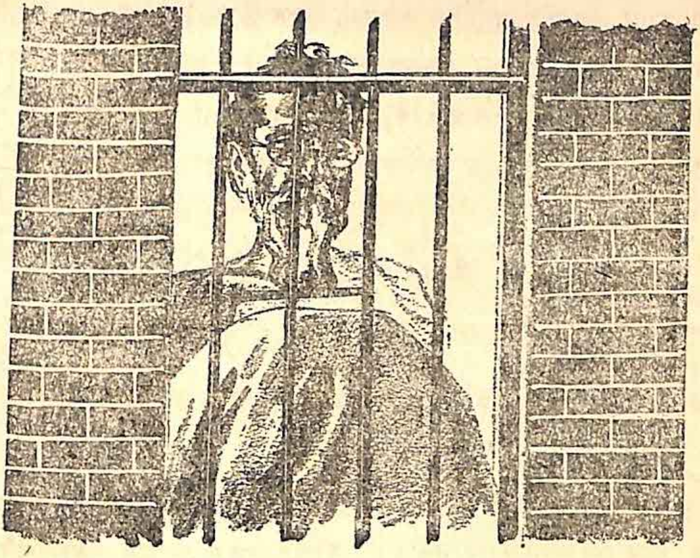
'সি' ক্লাসে ভর্তি করা হ'ল। বিনোবা 'বি' ক্লাসের সুযোগ সুবিধে পরিত্যাগ ক'রে চলে এলেন 'সি' ক্লাসে।

জেলে সবাইকে গম পিষতে হত। ছোট, বড়, রোগী কাউকে বাদ দেওয়া হতো না। বিনোবা একদিন জেলারকে বললেন, 'আপনার যতটা গম পেষানো দরকার আমাকে দিন ; আমি পিষিয়ে দেব। প্রত্যেককে দিয়ে জবরদস্তি আটা পেষাবার নিয়ম রদ করুন।' জেলার রাজী হলেন। বিনোবা গম এনে রাজবন্দীদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রুগ্ন ও বৃদ্ধদের বাদ দেওয়া হ'ল। নিজে তিনি প্রতিদিন ২১ পাঃ করে গম পিষতে লাগলেন। দুর্বল শরীরে এতটা শ্রম করার ফলে ওজন কমে ৯৩ পাঃ এসে দাঁড়াল। হাতের তলায় ফোস্কা পড়তে লাগল। তবুও চলল কঠোর তপ। অবশেষে যমুনালালজী ও প্যারেলাল-জীর একান্ত অনুরোধে তাঁকে গমপেষা বন্ধ করতে হয়।

একদিন রাজবন্দীদের সঙ্গে জেল কর্মচারীদের ঝগড়া বেধে গেল। রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করলেন। বিনোবাও তাতে যোগ দিলেন। জেলারের আশ্বাস পেয়ে অন্যান্য সত্যাগ্রহীরা উপবাস ভঙ্গ করলেন। বিনোবা কিন্তু আশ্বাস যতদিন কাজে পরিণত না হ'ল ততদিন উপবাস চালিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমি কখনও উপবাস করি না, কখনও একাদশী কিম্বা শিবরাত্রিও করি না। গত ১২ বছরে একদিনও উপবাস পালন করিনি। যখন একবার উপবাস আরম্ভ করেছি তখন সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না দেখে কি ক'রে তা ভঙ্গ করি ?

সমস্যাও মিটল , উপবাসও ভাঙ্গল।

কোন জিনিস চট ক'রে তিনি গ্রহণও করেন না, আবার চট ক'রে কোন জিনিস ত্যাগও করেন না। গভীরতা এবং কঠোরতা বিনোবা চরিত্রের দুই পিঠ।



ধুলিয়া জেলে বিনোবার সব চাইতে শ্রেষ্ঠ কাজ হয়েছিল 'গীতাঈ' প্রণয়ন ও গীতা সম্বন্ধে ভাষণ। গীতার শিক্ষা বিনোবার জীবনে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। তাঁর নিকট-সম্পর্কে যাঁরা এসেছেন তাঁরা কেউই গীতার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি।

একদিন রাজবন্দীরা সবাই মিলে বিনোবাজীকে অনুরোধ করলেন,—'আপনি আমাদের গীতা সম্বন্ধে বোঝান।'

স্থির হল প্রতি রবিবার গীতা সম্বন্ধে তিনি ভাষণ দেবেন।

১৯৩২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী রবিবার দিন প্রথম ভাষণ হ'ল। ১৮ রবিবারে ১৮টি অধ্যায় ব্যাখ্যা করা হ'ল। ১৯শে জুন ব্যাখ্যার কাজ শেষ হ'ল।

বিনোবার বয়স তখন মাত্র ৩৭ বৎসর। এই বয়সে আপন প্রতিভার বলে আধ্যাত্মিক সাধনায় কত উর্ধে তিনি উঠেছিলেন তা তাঁর 'গীতা প্রবচন' পড়লে বোঝা যায়। আর গীতাঈ হ'ল মারাঠীভাষায় গীতার সমশ্লোকী অনুবাদ। ছোট ভাই শিবাজীও তখন জেলে, তিনিও এ কাজে বিনোবাকে সাহায্য করতে পেরেছেন।

'গীতা প্রবচনে' গীতার যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তা ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক এবং জ্ঞান-কর্ম ও ভক্তির যেন তা ত্রিবেণী-সংগম।

প্রথম দিন গীতা সম্বন্ধে বলতে দাঁড়িয়ে তিনি আরম্ভ করলেন,—

"বন্ধুগণ, আজ থেকে আমি গীতা সম্বন্ধে আলোচনা করব। গীতা ও আমার সম্পর্ক তর্কের অতীত। আমার দেহ মার দুধে যতটা পুষ্টি লাভ করেছে আমার হৃদয় ও বুদ্ধি গীতার দুধে তার চাইতে বেশী পুষ্ট হয়েছে। সম্বন্ধ যেখানে হৃদয়ের, তর্কের অবকাশ সেখানে থাকে না। সুতরাং তর্কের মধ্যে না গিয়ে শ্রদ্ধা ও আচরণ এই দুই পাখায় ভর ক'রে গীতা গগনে আমি বিচরণ করি। অধিকাংশ সময়ই আমি গীতার আব-হাওয়ায় থাকি। গীতা-ই আমার প্রাণ-তত্ত্ব। যখন আমি গীতা সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন গীতা সাগরে সাঁতার কাটি আর যখন একা থাকি তখন এই অমৃত সাগরের গভীরে ডুব দিই। এমন যে গীতামাতা তাঁর কথা প্রতি রবিবার আপনাদের আমি শোনাব।

"প্রাচীন কাল থেকেই গীতা উপনিষদের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। গীতা উপনিষদেরও উপনিষদ। সমস্ত উপনিষদ দোহন করে গীতারূপী দুধ অর্জুনকে উপলক্ষ ক'রে সমগ্র জগৎকে ভগবান দিয়েছেন। জীবন বিকাশের প্রায় সমস্ত ভাবধারাই গীতায় স্থান পেয়েছে। গীতাকে সিদ্ধপুরুষগণ ধর্মজ্ঞানের অভিধান ব'লে বর্ণনা করেছেন। সত্যই গীতা তা-ই। গীতা আকারে ছোট হ'লেও হিন্দুধর্মের মুখ্য গ্রন্থ। সকলেই জানেন গীতা ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী। এই মহান শিক্ষার শ্রোতা ভক্ত অর্জুন। এ শিক্ষায় তিনি এমনই সমরস হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনিও কৃষ্ণ আখ্যা পেলেন। ভগবান ও ভক্তের হৃদ্গত ভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে ব্যসদেবও এমন একরস হয়ে গেলেন যে তিনিও কৃষ্ণ নামে খ্যাত হলেন। বক্তা কৃষ্ণ, শ্রোতা কৃষ্ণ, রচয়িতা কৃষ্ণ—তিনে মিলে যেন অদ্বৈতের সৃষ্টি হয়েছে। তিনজনেই যেন সমাধিমগ্ন। গীতা অধ্যয়ন কালে এমনই একাগ্রতা থাকা চাই।"

গীতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তন্ময় হ'য়ে যেতেন বিনোবা। নবম অধ্যায় সম্বন্ধে বলতে দাঁড়িয়ে ৫ মিনিট তিনি কিছুই বলতে পারেননি। দু' চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে চলল। ২৫০।৩০০ লোক প্রবচন শুনতে আসতেন– সবাই যেন মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে থাকতেন। দেড় দু ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে যে চলে যেত বুঝতেই পারতেন না তাঁরা।

দীর্ঘ ২৬ বৎসর পর ১৯৫৮ সালে ভূদান পদযাত্রা উপলক্ষে ধুলিয়া গিয়ে তিনি জেলের কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন তার কিছুটা এখানে তুলে দেওয়া হলো—

"১৯৩২ সালে আমি এই জেলে ছিলাম। সে সময় এখানে প্রায়

৩০০ রাজবন্দী ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপার পর্যন্ত আমাকে শোনাতেন, আমিও শুনতাম।

"সানে গুরুজী 'গীতা প্রবচন' লিপিবদ্ধ করে জগতের এক মহৎ কাজ করে গেছেন। তখন কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে জেলের মধ্যে দেওয়া ঐ প্রবচন দেশের সব ভাষায় অনুদিত হয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ভগবান যা চান তা হবেই। নতুবা জেলের মধ্যে নিশ্চিন্ততাই বা কি ছিল? যে কোন মুহূর্তে বন্দীদের স্থানান্তরিত করা হ'ত। সরকার আমাকে ও সানে গুরুজীকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে রাখতে পারতেন। কিন্তু আমাকে ও সানে গুরুজীকে তাঁরা কখনও স্থানান্তরিত করেন নি। গীতার সমগ্র প্রবচন এই জেলেই দেওয়া হয়েছিল। ভগবৎগীতা বলা হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে আর আমার গীতার ভাষ্য হলো ধুলিয়ার জেলখানায়। আমি যদি জেলখানায় না শুনিয়ে অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে গীতার ব্যাখ্যা শোনাতাম বা লিখতাম তা হলে গীতা প্রবচনে আজ যে যাদু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা দেখা যেত না। আমরা মনে করতাম—এই জেল কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন আর আমরা সব সেখানকার সৈনিক। মনে করতাম আমরা এক যুদ্ধের জন্য এখানে এসেছি। আর এই 'গীতা প্রবচন' সৈনিকদের কাছেই প্রদত্ত হচ্ছে।

"তখন জেলটা ছিল আমার মুঠার মধ্যে। যদি আমি অনুশাসন রক্ষা না করতাম তবে সেখানে কোন অনুশাসন রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না। আমি অনুশাসনের নামে স্বাধীনতার সৈনিকদের দিয়ে রোজ ২১ পাঃ ক'রে গম পিষিয়ে নিতাম। জেলের নিয়ম ছিল ৩৫ পাঃ গম পেষাই করা। আমি বিনাশ্রমের বন্দীদের দিয়েও ২১ পাঃ করে গম পিষিয়ে নিতাম। ...

"ঐ সময় জেলের রান্না-বান্নার কাজও আমার হাতে ছিল এবং বড় বড় লোকেরাও আমার সঙ্গে রান্নার কাজে যোগ দিতেন। ঐ সময়

আমরা ১০।১২ জন লঙ্কা-মসলা খেতাম না। বাকী সকলে খেত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই বিনা মসলায় খেতে আরম্ভ করলেন। এবং আমাদের ৩০০ রাজবন্দীর বিনা-মসলার এক বিশেষ পংক্তি গড়ে উঠল। সাধারণ কয়েদীরাও বলতে আরম্ভ করল তাদের রান্নাও বিনা মসলায় হওয়া চাই। তাদের মধ্য থেকে ৪০।৫০ জন আমাদের পংক্তিতে এসে খেতে আরম্ভ করল। ...

জেলের সাধারণ মেয়ে কয়েদীরা চাইলে—তাঁদেরও 'প্রবচন' শোনার সুযোগ দেওয়া হোক। পুরুষ কয়েদীরা কখনও মেয়ে কয়েদীদের কাছে যাবার অনুমতি পেত না। কিন্তু তখন শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব নামে যে নির্ভীক জেলার ছিলেন তিনি বললেন—বিনোবাকে পুরুষের মধ্যে গণনা করা ভুল। তাঁকে স্ত্রীলোক ব'লে গণ্য করায় ক্ষতি নেই।' এই ব'লে তিনি আমাকে স্ত্রী কয়েদীদের মধ্যে গিয়ে গীতা প্রবচন শোনাবার অনুমতি দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনিও ঐ সময় উপস্থিত থাকুন।' তারপর থেকে তিনি নিজে তো আসতেনই সঙ্গে তাঁর পত্নীকেও আনতেন। এইভাবে স্ত্রী কয়েদীদের মধ্যে সপ্তাহে এক-বার করে গীতা প্রবচন শুনানো আরম্ভ হলো। তখন সাধারণ পুরুষ কয়েদীরাও চাইলে,—'আমাদেরও গীতা প্রবচন শুনবার সুযোগ দেওয়া হোক।' জেলার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি এজন্য প্রস্তুত আছেন কি? আমি বললাম—রবিবার ছাড়া অন্য যে কোন দিন যদি আপনি তাদের একঘন্টা ছুটি দেন তবে আমি তাদের প্রবচন শোনাতে পারি। রাজনৈতিক আন্দোলনের উষ্ণ আবহাওয়ায়ও সেই নির্ভীক জেলার সাধারণ পুরুষ কয়েদীদের বুধবার একঘণ্টা ছুটি দিয়ে তাদের 'গীতাপ্রবচন' শুনবার সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাগানে কাজ করতেন তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে ফুলের মালা তৈরী করে নিয়ে এসে আমার গলায় পরিয়ে দিত। কয়েকজন তো আবার ফাঁসীর কয়েদীও

ছিল। জেলার তাদেরও প্রবচন শুনবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের হাতকড়ি ও বেড়ি লাগিয়ে আনা হ'ত।

"সে সময় এই জেলেই এই সব ব্যাপার হয়েছিল, এখানকার সমস্ত আবহাওয়া আধ্যাত্মিকতায় ভরে গিয়েছিল। এই জেলে বসেই 'গীতাঈ' প্রকাশিত হয়। এই জেলে বসেই আমি তার প্রুফ দেখে দিতাম। যখন আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা হলো তখন সাধারণ কয়েদীরা সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের কাছে প্রার্থনা জানালে শ্রমের বিনিময়ে তাদের যে পয়সা জমা আছে তা থেকে দু' আনা করে তাদের দেওয়া হ'ক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কেন, পয়সা দিয়ে তোমরা কি করবে? কয়েদীরা উত্তর দিলে—গীতাঈ কিনতে হবে। তিনি বললেন—গীতাঈয়ের দাম তো এক আনা। কয়েদীরা বললে—তা আমরা জানি। এক আনায় গীতাঈ কিনব আর এক আনা বিনোবাজীকে দক্ষিণা দেব।"

"এইভাবে যাদের চোর-ডাকাত বলে সাজা দেওয়া হয় তাদের কাছ থেকে আমি দক্ষিণা পেয়েছিলাম। আমি কখনও এই পার্থক্য করে দেখিনা যে এই ব্যক্তি চোর আর ঐ ব্যক্তি চোর নয়। শুধু শুধু কিছু লোককে 'চোর' আখ্যা দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু চোর তো জেলের বাইরেও থাকেন, তাদের সৎ লোকের মধ্যে ধরা হয়। অর্থাৎ তারা আইন অনুসারে চোর নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে, সাধারণ কয়েদীদের মধ্যেও যথেষ্ট ভক্তিভাব আছে।"

ধুলিয়া জেল এমনি করে এক শিক্ষাগার হয়ে উঠল। বিনোবা গীতার দুগ্ধধারা বইয়ে দিলেন সমস্ত জেলে। সে-ধারা পান করে সবাই পুষ্ট হয়ে উঠলেন। জেল হয়ে উঠল সত্যি-কারের আশ্রম।

বিনোবার গীতাভাষ্য 'গীতা প্রবচন' নামে পুস্তকাকারে

প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গানুবাদও বেরিয়েছে। এ একখানা 'নিত্য পঠনীয়' গ্রন্থ। সারা ভারতের সমস্ত ভাষায় অনূদিত হয়ে লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনে প্রেরণা জোগাচ্ছে।

গীতা শোনান বিনোবা, আবার জেলে নানা কাজও করেন। নির্ভীক বীর, কঠোর পরিশ্রমী, পরম পণ্ডিত, অথচ অভিমানের লেশমাত্র নেই। দেশের নেতাদের পুরাণের বীরদের সঙ্গে তুলনা করার তখন রেওয়াজ। সবাই বিনোবাজীকেও কোন-এক বীরের সঙ্গে তুলনা করতে চান। একদিন এই-নিয়ে কথাও উঠল।

বিনোবা বললেন, লোকে আজকাল রামায়ণের সঙ্গে তুলনা ক'রে কথা বলতে পছন্দ করে। ব্রিটিশরাজ রাবণ, মহাত্মাজী স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র, বল্লভভাই হনুমান, জওহরলাল অঙ্গদ—এমনি কত তুলনা! মনে মনে ভাবি, আমার কার সঙ্গে তুলনা হবে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, অহল্যাই আমার যোগ্য ভূমিকা।

সবাই নীরব হয়ে গেলেন। বুঝলেন—বিনোবা উপযুক্ত তুলনাই বার করেছেন। তাঁর অভিমানশূন্য মন নিজেকে দিয়েছে সকলের পায়ের তলায় লুটিয়ে! এমন মানুষ বলেই তো তিনি গান্ধীজীর এত প্রিয়।

গ্রামের পূজা

ধুলিয়া জেলে নানা কাজের মধ্যেও তিনি ভাবেন দেশের কথা—গ্রামময় ভারতের কথা। ভারতকে যদি উন্নত করতে হয়, গ্রামগুলির উন্নতি করতে হবে। গ্রামকে হৃতসর্বস্ব ক'রে মহানগরের উন্নত চূড়া গড়লে চলবে না। তাই জেল থেকে বেরিয়েই তিনি গ্রাম-সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন।

ওয়ার্ধা আশ্রমের গণ্ডী আর নয়, এবার গ্রাম। যেখানে খেতে-খেতে ফলে সোনা, যেখানে থাকে সরল-সহজ মানুষের দল।

আশ্রম ছেড়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন বিনোবা। গ্রামের মানুষকে খাদি-ব্রতে দীক্ষা দেন। গ্রাম-সংগঠনের পরিকল্পনা এমনি ক'রেই রূপ পায়। একদিন গান্ধীজীকে লিখলেন তাঁর পরিকল্পনার কথা। সেটি ১৯৩২ সালের উনিশে সেপ্টেম্বর। লিখলেন—

কলিঃ সয়ানো ভবতি, কৃতযুগে (সত্যযুগে) ভ্রমনই ধর্ম।

গান্ধীজী রোগশয্যায়, তবু তিনি উত্তর দিলেন। বিনোবার কাজের গুরুদায়িত্ব তিনি বুঝতে পেরে রোগশয্যায় শুয়েও নিজের হাতে লিখলেন চিঠি—

কৃতযুগী বিনোবা,

তোমার কৃতযুগের প্রতি ঈর্ষা করার কোন কারণ নেই আমাদের। কেন না আমাদের কাছেও কৃতযুগী সরদার রয়েছেন। তাই তোমার

চাইতে কম-সে-কম এক বিঘত এগিয়েই আছি। তুমি জানো সর্দার বেশী সময়ই ঘুরে বেড়ান। সম্ভব হলে খেতেনও তিনি চলতে চলতে আর সুতোও কাটতেন চলতে চলতে। বুড়ো বয়সে ঘুরে ঘুরেই গীতা মুখস্থ করেন। তবে হ্যাঁ, উচ্চারণের জন্যে তাঁকে তোমার কাছে পাঠানো দরকার আর তোমার হাতে দেওয়া দরকার একগাছা বেত। কিন্তু সে অবসর তোমার থাকলে তো?

"তুমি গরীবদের বড় ফুসলাতে পার। আমার মত গরীব যখন তোমার চিঠির চিন্তায় অস্থির, তখন তাকে লিখবে না। আবার যখন সে মৃত্যু শয্যায় পড়েছে অমনি তাকে লিখবে, আর বলবে 'এই আরম্ভ করলাম, এখন নিয়মিত লিখব।' ভগবান জানেন কৃতযুগীদের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয় না। সেই জন্য পাছে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয় তাই আমাকে হয়ত বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। যাক্ তোমার চিঠি নিয়মিত পাবার আশায় রইলাম।

"পরিহাস ছেড়ে এখন গভীর প্রসঙ্গে আসছি। তোমার কাজে সমালোচনা করার মত কিছুই নেই। বরঞ্চ, বলতেই যদি হয় তো বলি, যে অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তুমি চলেছ, তাতে স্বর্গ ও মর্তের— জীব ও দেবের মিলন ঘটবে। আর কিছু লেখার থাকলে পরে লিখব। চিঠি এখানেই শেষ করলাম।

বাপুর আশীর্বাদ"

গ্রামে বেশী দিন থাকতে পারলেন না বিনোবা। আশ্রমের কাজের প্রয়োজনে তাঁকে ওয়ার্ধা ফিরে আসতে হ'ল। আশ্রমের কাজ সেরে আবার রওনা হলেন গ্রামের সেবায়।

১-১-৩৩ তারিখে মহাত্মাজীকে লিখলেন :

"পূজ্য বাপুজীর পবিত্র সমীপে—

নলওয়াড়ী ওয়ার্ধা থেকে দেড়মাইল দূরবর্তী হরিজনদের একটি গ্রাম। আগামী ২৫ তারিখ হরিস্মরণ ক'রে ঐ গ্রামে গিয়ে বসব। ওয়ার্ধা আশ্রম স্থাপনার পর ১২ বছর পূর্ণ হ'তে চলল। এক সত্র সমাপ্ত হ'ল ; যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। কর্তৃত্বভাব চলে গেছে। একমাত্র ঈশ্বরই আছেন এই প্রত্যয় জন্মেছে। এত বছর আমি ওয়ার্ধায় তো ছিলাম না, আপনার আজ্ঞাতেই বাস করেছি। এ জগতে আপনার আশীর্বাদ ছাড়া আর সব শূন্য। একটা কথা আজ বলতে পারি, এ ১২ বছর ধ'রে ব্রতসমূহ পালন করবার সতত প্রযত্ন করেছি। তবুও নিজের মধ্যে অনেক ত্রুটি দেখতে পাই। ঈশ্বরের প্রতি আমার যতটা ভক্তি তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর কৃপা আমি পেয়েছি।

"আমি জানি আপনার আশীর্বাদে আমি সম্পূর্ণ ওতঃপ্রোত হয়ে আছি, তবুও তা-ই প্রার্থনা ক'রে চিঠি লিখলাম। আপনার তুচ্ছ সেবককে আগলে রাখবেন। আপনার মহাযজ্ঞের আহুতি হওয়ার যোগ্যতা তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাইয়ে দিন। ভবিষ্যতের জন্য কোন নির্দেশ থাকলে তা অবশ্যই দেবেন।

বিনোবার দণ্ডবৎ প্রণাম।"

বাৎসল্যরসে ভরা গান্ধীজীর উত্তর এল।

"চিরঞ্জীব বিনোবা,

তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখলে চোখে আনন্দের অশ্রু নেমে আসে। আমি এর যোগ্য হই বা না হই তোমাতে তো এ সফল হবেই। তুমি মহৎ সেবার অধিকারী হবে। নলওয়াড়ী যাবে, ভালই।

ভবিষ্যতের জন্যে নির্দেশ তো এখন এইটুকুই দিতে পারি—দুধ ত্যাগের ইচ্ছে না রেখে শরীর রক্ষা কর। এখন স্বধর্ম হচ্ছে অস্পৃশ্যতা নিবারণাদি। আমি যা লিখি তা পড়বার সময় ক'রে নিও। বেশী তো আর লিখি না। আমাকে নিয়মিত চিঠি দিও, সপ্তাহে একখানা দিলেই সন্তুষ্ট।

বাপুর আশীর্বাদ।"

২৫-১-৩৩ তারিখে ওয়ার্ধা থেকে দেড় মাইল দূরে নলওয়াড়ীতে 'গ্রামসেবা মণ্ডল' স্থাপন করে দলবল নিয়ে চললেন বিনোবা গ্রামের সেবা করতে। গ্রামসেবার এমন এক মনোরম আদর্শ কর্মীদের সামনে তুলে ধরলেন যা তাঁদের জীবন সাধনার পক্ষে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল!

"গ্রামের স্বয়ম্ভু জনতা মহাদেব। যদি আমরা তাঁর পূজো করতে চাই তবে আমাদের গ্রামে গিয়ে তাঁরই কাছে বসতে হবে। গ্রামে যাওয়ার সময় গ্রাম সম্বন্ধে কোন হীনতার ভাব যেন না আসে, কোন ক্লান্তি যেন অনুভূত না হয়। যে ভক্তি নিয়ে ভক্ত তাঁর দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করে সেই নিষ্ঠা ও ভক্তি নিয়ে আমাদেরও গ্রামের মধ্যে যাওয়া উচিৎ। জনতারূপী মহাদেবের পূজায় নিষ্ঠার অভাব হলে চলবে কেন?

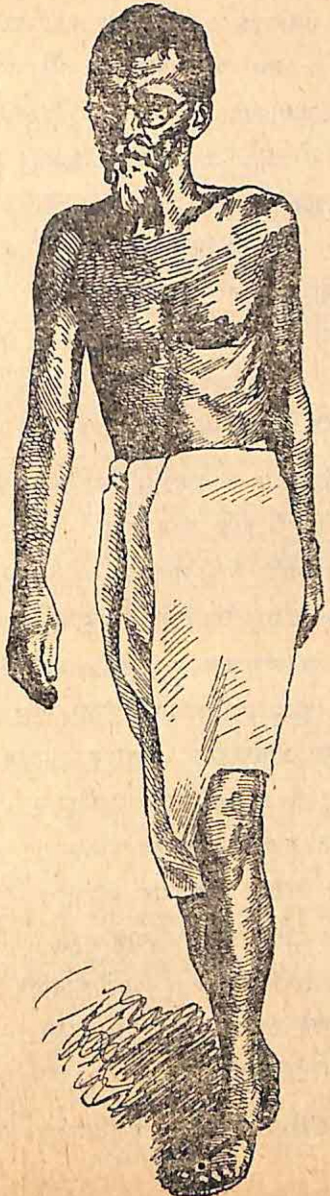
"সেবকগণ ১৪ দিন গ্রামে ঘুরে পঞ্চদশ দিবসে প্রধান কার্যালয়ে এসে খবরাখবর করবেন। আবার পরদিন থেকেই গ্রাম প্রদক্ষিণ আরম্ভ করবেন। প্রদক্ষিণ কালে ভক্ত প্রতিবারই ঘুরে এসে দেবতার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নেয়, তাতে মূর্তির প্রতি প্রেম তার বেড়ে যায়। মূর্তি আরও হৃদগত হয়, ধ্যান আরও গভীর হয়ে ওঠে। ভগবানের

স্বরূপ যখন ধ্যানে অনুভূত হয়ে ওঠে, তখন এও জানা যায় যে, তাঁকে ভক্তি করবার পথ কি? পূজার সামগ্রী কি? যিনি ভক্ত তিনি তখন ভগবানের সঙ্গে মিলে একরূপ হয়ে যান। ভক্তের হৃদয় দেবতার হৃদয়ের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যায়। তখনই দেবতার কৃপা হয়। তাঁর অনুগ্রহ লাভ হয়।

"লোকসেবা আমাদের মূর্তিপূজা। ২০৷২৫টি গ্রামের সমূহ আমাদের মহামন্দির। গ্রামে কি কি আছে তার এক তালিকা করা দরকার; মনের উপর এবং কাগজের উপরও। তালিকা আমরা জনসেবকদের হাতে দেব, তাঁরা দেবতার স্বরূপ বুঝে নিন। জানুন, দেবতা দিগম্বর হয়ে গেছেন! সর্বাঙ্গ তাঁর ধূলিমলীন। কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে, কেবল বলদটাই আছে সম্পত্তির মধ্যে। তাই নিয়ে জঙ্গলে পড়ে আছেন। জনসেবক জেনে নিন, দেবতার স্বরূপ কি? চেহারা কেমন? মনের অবস্থা কি? কিসে তাঁর রুচি আর কিসেই বা অরুচি, কি তাঁর নৈবেদ্য? কি ফুল তাঁর পূজোয় লাগে? পরিচয় ছাড়া পূজো হতে পারে না। তাহলে শিবের মাথায় পড়বে তুলসী আর বিষ্ণুর মাথায় বেলপাতা। দেবপূজায় তাড়াহুড়ো চলে না। আমাদের তাড়া থাকতে পারে, দেবতার নেই। তিনি যে শান্তির অবতার। তাঁর মাথায় একসঙ্গে ঘটি ঘটি ঢাললে চলবে না, তিনি তো বিন্দু-প্রয়াসী। একবার ঢেলে দেওয়ার চাইতে বিন্দু বিন্দু হলেও অবিরত ধারায় তিনি প্রসন্ন হন।"

গ্রাম সেবার কাজ বিনোবা কোন দৃষ্টিতে করতেন তার চমৎকার চিত্র এখানে পাওয়া যায়।

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে বিনোবার গ্রাম সেবার বিবরণ দেয়া হল।



"আমি আপনাদের ভগবান-জ্ঞানে সেবা করতে এসেছি।

—বিনোবা

"...ওয়ার্ধা অঞ্চলকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। লোক সংখ্যা মোট ২ লক্ষ। ৬ জন আশ্রমবাসীকে ৬টি এলাকায় বসান হয়েছে। প্রত্যেক কর্মী নিজ এলাকার ৫০টি গ্রাম ১৫ দিনে ঘুরে আসেন। বিভিন্ন জায়গায় মোট ১৭টি কর্মকেন্দ্র খোলা হয়েছে। অনিবার্য কারণে ৭টি কেন্দ্র বন্ধ করা হয়েছে। এখন ১০টি কেন্দ্র চলছে। এদের মধ্যে ৩টি তো পুরোপুরি আশ্রম। তাদের নিজেদের ঘর বাড়ী আছে। অন্য কেন্দ্রগুলো সহানুভূতিশীল গ্রামবাসীদের বাড়ীতে। দু' জায়গায় গ্রামবাসীরা নিজেরাই খেটে ঘর ক'রে দিয়েছেন। অধিকাংশ কর্মীই গ্রামের লোকদের বাড়ীতে থাকেন। খাওয়া দাওয়া তাঁরা বিনামূল্যেই পান। বস্তুতঃপক্ষে সত্যাগ্রহ আশ্রমটিই যেন ওয়ার্ধা থেকে উঠে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে।

"বিনোবাজীর প্রধান কার্যালয় দু'খানা ছোট ছোট কুঁড়েতে। একটি শোয়ার ঘর আর একটি রান্না ও ভাঁড়ার। দু'ঘরের মাঝখানে উঠোন। একটু দূরে ছোট্ট একটি কাঁচা পায়খানা। তার পাশেই স্নানের ব্যবস্থা। সমস্ত আশ্রমটি ঝকঝকে পরিষ্কার। বিনোবাজীর সঙ্গে সেখানে সাত জন কর্মী থাকেন। চারজন পুরুষ ও তিন জন মহিলা। সকলে আশ্রম নিয়মে চলেন। খুব সকালে উঠে তাঁরা গ্রামের রাস্তা ঝাড়ু দিতে যান। কিছু কিছু গ্রামবাসীও এ কাজে তাঁদের সহযোগিতা করেন। দুপুরের পর গ্রামের মেয়েরা বিনোবাজীর কাছে গীতা পড়তে আসেন। সংস্কৃতে নয়, গীতা মারাঠীতে তাদের মাতৃভাষায় শেখানো হয়। গীতার এই সমশ্লোকী মারাঠী অনুবাদ বিনোবাজী নিজেই করেছেন। সান্ধ্য প্রার্থনায় গ্রামবাসীরাও যোগ দেন। গ্রামটি খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। লোক সংখ্যা প্রায় ৮০০। ৫টি পরিবার বাদে সকলেই হরিজন। বেশীর ভাগ লোকই চাষের কাজ করে। এতে তারা প্রতিদিন দু' আনা থেকে তিন আনা রোজগার করে।

আশ্রমের ভোজন ব্যবস্থা অতি সাধারণ। জোয়ারের রুটি, ডাল,

লবণ, লঙ্কা ও সামান্য তেল। কখনও বা তরকারীও এঁদের ভাগ্যে জুটে যায়। দুধ-ঘি প্রায় জোটেই না।

প্রতিদিনের সাধারণ কাজ ছাড়া গ্রামে ঘোরার কাজও এঁরা করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই এ অঞ্চলে ৩৬টি মন্দির ও ২৪৫টি কুয়ো হরিজনদের জন্যে খুলে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আশ্রম কর্মীদের সেবার ফলে গ্রামের মধ্যে যে নতুন প্রেরণা দেখা দিয়েছে তা তো আছেই।"

জানুয়ারী থেকে নভেম্বরের মধ্যেই এত কাজ হ'ল। যত দিন যেতে লাগল, তত বেড়ে উঠতে লাগল কাজ। প্রতি বছর একবার ক'রে মেলার আয়োজন করলেন বিনোবা। সেখানে সেবাব্রতী কর্মীরা এসে জড়ো হতেন, খাদি ও গ্রাম শিল্প নিয়ে আলোচনা হ'ত। শিল্প প্রদর্শনীও বসত মেলায়। আবার গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের আলোচনাও বাদ পড়ত না। বিনোবা আলোচনা শুনতেন, পথনির্দেশ করতেন।

দু' বছর এমনি ক'রে গ্রামসেবায় কেটে গেল। কঠোর পরিশ্রমে বিনোবার শরীর ভেঙে পড়ল। গান্ধীজী খবর পেয়ে ভাবনায় পড়লেন। ঠিক করলেন বিনোবাকে বাইরে পাঠাতে হবে, বিশ্রামের জন্য। আশ্রমে থাকলে তাঁর আর বিশ্রাম নেওয়া হবে না।

কিন্তু বিনোবা বাইরে যাবেন না।

শেষে বাপুজী সোজা হুকুম দিয়ে বসলেন। তখন আর উপায় কি!

বিশ্রামের জন্য জায়গা বাছা হ'ল—নলওয়াড়ী থেকে চার মাইল দূরে পওনার গ্রাম। সেই গ্রামে ধাম নদীর ধারে আছে

যমুনালালজীর এক বাংলো। সেখানেই গিয়ে উঠলেন বিনোবা। কিন্তু চুপ করে বসে থাকার কি মানুষ তিনি! ঐ বাংলোতেই গড়ে উঠল আশ্রম। এই আশ্রমের নাম দিলেন পরমধাম। অর্থাৎ অন্তিম ধাম, যেখান থেকে লোক আর ফেরে না। অর্থাৎ স্বর্গ। এখানে বিশ্রাম করতে এসে তিনি যেন স্বর্গসুখ পেলেন, তাই আশ্রমের এই নামাকরণ হ'ল।

বিশ্রাম নিতে গেলেন, কিন্তু যোগাযোগ রইল আশ্রমের সঙ্গে—সেবাসংগঠনের কাজের সঙ্গে। বিশ্রাম আনন্দময় হয়ে উঠল। কাজই তো তাঁর সব, আর কিছুই তো তিনি চান না। চান না, যশ, অর্থ, মান। চান—শুধু কাজ—শুধু কাজে আত্মনিবেদন।

ওয়ার্ধা আশ্রমের ঘটনা।

বিনোবার কাছে একদিন একখানা চিঠি এল। চিঠিখানা পড়েই তিনি ছিঁড়ে ফেললেন। যমুনালালজীর ছেলে কমলনয়ন তখন সেখানে। তিনি অবাক হয়ে গেলেন—এমন তো কখনো করেন না বিনোবাজী। চিঠি পড়া হ'লে রেখে দেন। একে একে অনেক চিঠি জমলে তবে তার একসঙ্গে জবাব লিখতে বসেন। জবাব দেওয়া হ'য়ে গেলে সব ফেলে দেন।

আজ আবার তবে এমন হ'ল কেন?

কৌতুহল বেড়ে উঠল। চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলি জুড়ে জুড়ে আস্ত চিঠিখানাই পড়ে ফেললেন কমলনয়ন। পড়ে তো আরো অবাক! এ যে স্বয়ং বাপুজীর চিঠি! বাপুজী বিনোবাকে লিখেছেন—

তুম্‌সে বঢ়্ কর্ উচ্চ আত্মা মেরী জানকারীমেঁ নহীঁ হ্যায়!

তার মানে—তোমার চাইতে উচ্চতর আত্মা কারো আছে এমন আমার জানা নেই।

গান্ধীজীর এত বড় সার্টিফিকেট—আর তার কিনা এই দশা!

কমল নয়ন তাকিয়ে রইলেন বিনোবার দিকে, তারপর বললেন—এত বড় একটা জিনিস ছিঁড়ে ফেললেন!

বিনোবা তেমনি সহজভাবেই উত্তর দিলেন,—ও সার্টিফিকেট আমার কোনো কাজে আসবে না, তাই ছিঁড়ে ফেললাম।

কমলনয়ন বললেন, এ যে যত্নে রাখার মতো জিনিস। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

বিনোবার তেমনি উত্তর, যা আমার নিজের কাজে আসবে না, তা ভবিষ্যতের জন্যে জমা ক'রে রাখব কেন? বাপু নিজে মহৎ, তাই অমন ভেবেছেন। আমার দোষগুলো তো আর তাঁর নজরে পড়ে নি।

সামান্য ক'টি কথা। এতেই বিনোবা কেমন মানুষ তা বুঝতে পারলেন কমলনয়ন। বুঝলেন এ-চরিত্র অপূর্ব। এ মানুষের মহত্ব অপরূপ! এ মানুষ নিন্দায় মুষড়ে পড়েন না, প্রশংসায়ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন না। এঁর কাছে নিন্দা আর স্তুতি দুই-ই সমান।

ব্রহ্মের পথে যা কোন কাজে আসবে না, তাতে তো তাঁর কোন দরকার নেই। এ যেন সেই উপনিষদের মৈত্রেয়ীর মতো—তেমনি নির্ভিক কণ্ঠে বললেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!
যা দিয়ে আমি অমৃতা না হব, তা নিয়ে আমি কি করব!

গঠনকর্মী বিনোবা

গান্ধীজী অদ্ভুত কর্মী।

একই সঙ্গে ভাঙা আর গড়ার তাঁর পরিকল্পনা। বিপ্লবীর সেই তো মহান লক্ষ্য। বিপ্লবের সেই তো মহান নীতি।

গান্ধীজী ইংরেজের গড়া এই পরাধীনতার অচলায়তন ভাঙবার কাজ দিলেন জওহরলাল, বল্লভভাই, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজাজী-দের উপর। আর গড়ার ভার পেলেন বিনোবা, কুমারাপ্পা, মশরুওয়ালা, ধীরেন্দ্র মজুমদার, প্রফুল্ল ঘোষ, সতীশ দাসগুপ্ত প্রভৃতি।

১৯৩৬ সালের মার্চমাসে গন্ধীজী এলেন ওয়ার্ধায়। সেবা-গ্রাম আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করলেন।

অহিংসার পথে চলছে স্বাধীনতার সংগ্রাম, তার সঙ্গে গন্ধীজী শোষণ মুক্ত শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনাও দিলেন। এরই জন্য প্রতিষ্ঠা হ'ল অখিল ভারত চরখা সংঘ ও গ্রামোদ্যোগ সংঘ। স্বরাজ গড়ার সমগ্ররূপ আঠেরো দফা গঠনকর্মের মধ্যে রূপ পেল ?

১। সাম্প্রদায়িক ঐক্য ২। অস্পৃশ্যতা নিবারণ ৩। মাদক বর্জন। ৪। খাদি ৫। অন্যান্য পল্লী শিল্প ৬। পল্লী স্বাস্থ্য ৭। বনিয়াদী শিক্ষা ৮। বয়স্ক শিক্ষা ৯। নারী জাগরণ ১০। স্বাস্থ্য জ্ঞান ১১। প্রাদেষিক ভাষার উন্নয়ন ১২। রাষ্ট্রভাষার প্রচার ১৩। আর্থিক সাম্য ১৪। কৃষক সংগঠন ১৫। শ্রমিক সংগঠন ১৬। আদিবাসী ১৭। কুষ্ঠসেবা ১৮। ছাত্র সংগঠন।

বিনোবাজী পেলেন স্বরাজ-সাধনার পদ্ধতি, তাঁর ভগবানের উপাসনার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিলেন। কাজে ডুবে গেলেন তিনি।

প্রথম কাজটি সাম্প্রদায়িক ঐক্য। বিনোবা জীবনে সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ কখনো মানেননি। তিনি প্রাণীদের মধ্যে দেখেছেন এক এবং অভিন্ন অমর আত্মাকে। জীবমাত্রই তাঁর কাছে শিব, তাদের সেবাই তাঁর একমাত্র কর্ম।

বন্ধুরা তাঁকে এই নিয়ে নানা প্রশ্ন করতেন। বলতেন, আশ্রম জীবনে এলে কেন বিনোবা?

বিনোবা উত্তর দেন—ভগবানের খোঁজে।

ভগবানের খোঁজে, তবে তীর্থে গেলে না কেন? মন্দিরও তো আছে।

তিনি উত্তর দিতেন, মন্দিরে হিন্দুর ভগবান, মসজিদে মুসলমানের ভগবান, গির্জায় খৃষ্টানের ভগবান। আবার ধনীর মন্দিরে আছেন ধনীর ভগবান। আমি মানুষের ভগবানকে পাবার জন্যে আশ্রমে এসেছি।

মানুষের ভগবানের যিনি খোঁজ করেন, তিনি তো সম্প্রদায়ের গণ্ডী মানতে পারেন না। তিনি তার বহু উর্ধে। তাই তো বিনোবার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পাশী সকলের প্রতি সমভাব। সব ধর্মমত তিনি ঘেঁটেছেন। মূল আরবী ভাষায় পড়েছেন কোরান শরীফ। বাইবেল পড়েছেন, বেদ উপনিষদ ধর্মপদ, জিন্দ আবেস্তা কিছুই তাঁর বাকি নেই। তাই তো প্রথম কাজে তিনি হলেন অগ্রণী।

দ্বিতীয় কাজ অস্পৃশ্যতা বর্জন। হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সমাজের এ এক কলঙ্ক। একাজেও বিনোবা পেছপা নন। পায়খানা তিনি নিজের হাতে সাফ করবার ভার নিয়েছেন আশ্রমে, বছরের পর বছর এ-কাজ চলেছে। পরমধামে থাকতে বহুদিন তিনি 'সুরগাঁও' গ্রামের ময়লা সাফ করার কাজ করেছেন।

বিনোবা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী, তাঁর কাছে ছুৎ-অচ্ছুৎ নেই। তিনি বলেন, অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য প্রতি পরিবারে একজন করে হরিজনকে ঠাঁই দেওয়া দরকার।

শুধু বলেই খান্ত হননি। তিনি নিজে একজন হরিজন ছেলেকে বহুদিন পালন করেছেন।

তারপরে খাদি-ব্রত। বাপুজীর মতে এই খাদিই ভারতের স্বাধীনতা আর সংহতির প্রতীক। এদিকেও বিনোবা অগ্রণী। সূতোকাটার কাজে তাঁর মতো এত পরীক্ষা ভারতে আর কেউ করেন নি। নিজের হাতে তুলোর চাষ করেছেন, নিজের হাতে বীজ ছাড়াবার ভার নিয়েছেন। তুলো বুনেছেন, তাঁতও বুনেছেন। প্রতিদিন আটঘণ্টা করে এসব কাজ বহুদিন করেছেন। সুতো না কেটে খান নি, ঘুমোতে যান নি।

সুতো কাটাটাই বড় কথা নয়। এর তাৎপর্য-সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা।

সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি, তিনি বহুদিন সুতোকাটার আয়ের উপর নির্ভর করেই চালিয়েছেন খরচ। এরই জন্য তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হোত। গান্ধীজীও তাঁর এই দুর্বল

শরীরে এত পরিশ্রমে ভাবনায় পড়েছিলেন। লিখেছিলেন—

তোমার শরীর যথেষ্ট দুর্ব্বল। কাজেই এত কঠোর ব্রত গ্রহণের তোমার দরকার নেই।

বিনোবা উত্তর দিয়েছিলেন—

কোন চিন্তা করবেন না, ভগবান কবীরকে যেমন তাঁতের কাজে সাহায্য করেছিলেন, আমাকেও তেমনি চরখার কাজে সাহায্য করবেন।

১৯৩৭ সালে সুতো কাটার কাজ আরো বাড়াবার জন্য তিনি তুনাইয়ের প্রচলন করেন। দেখতে-দেখতে তুনাই-পদ্ধতি সারা ভারতে প্রচলিত হ'ল। চরখা সংঘ আর তালীমী সংঘ এ-পদ্ধতি কাজে লাগালেন।

গড়ার কাজের মধ্যে বনিয়াদী শিক্ষা একটি প্রধান অঙ্গ। এ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছেলেমেয়েদের কর্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান ও স্বাবলম্বী করে গোড়ে তোলা। আগামীর শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজের যোগ্য নাগরিক হতে হলে এই তো চাই।

এ শিক্ষা কাজের ভিতর দিয়ে শেখায়। শুধু পুঁথির বুলি শিখিয়েই ক্ষান্ত হয় না।

বিনোবা এ বিষয়েও অগ্রণী। গান্ধীজী বলেন,—

বিনোবা স্বভাবতই শিক্ষক। শ্রীমতী আশা দেবীকে এ কাজে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

সুতোকাটাই বনিয়াদী শিক্ষার মূল শিল্প।

এই নিয়ে তিনি একখানা বইও লিখেছেন। সেখানির নাম 'মূল উদ্যোগ কাতনা'। মৌলিক চিন্তাধারায় বইখানি সমুজ্জ্বল, গান্ধিজী বইখানির প্রশংসা ক'রে লিখেছেন—এ বইয়ে তিনি

বিদ্রূপকারীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সুতোকাটা এমন এক শিল্প যাকে বনিয়াদী শিক্ষার কাজে মূল শিল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

তারপরে ব্রহ্মচর্য। এ-বিষয়েও বিনোবা অগ্রণী। তিনি ছেলেবেলা থেকেই ব্রহ্মচারী। কিন্তু স্ত্রীলোকের নাম শুনে তিনি কানে আঙ্গুল দেন না। স্ত্রীলোকদেরও যে গড়ার কাজে পুরুষের সমান ভূমিকা, তা তিনি জানেন। এই জন্যেই গান্ধীজী ওয়ার্ধা মহিলা আশ্রমের দায়িত্ব ভার তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

বিনোবা সে-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছিলেন।

গড়ার কাজের আর একটি অঙ্গ প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা। সেদিকেও বিনোবা সকলের প্রথম। ভারতের প্রাদেশিক ভাষা-গুলি শেখা দরকার একথা তিনি যেমন জানতেন, এমন আর কেউ নয়। তিনি রুটিন বেঁধে ভাষা শিক্ষা করতেন। তাই তো আজ তিনি গুজরাটী, বাংলা, উড়িয়া, তেলেগু, কানাড়ী, মলয়ালম্ ভাষায় পণ্ডিত। শুধু তাই নয়, উর্দু, আরবী, লাতিন এসব ভাষাও তাঁর জানা, তাছাড়া জানেন হিন্দী, মারাঠী, ফরাসী, ইংরেজী আর সংস্কৃত। ইদানিং তিনি শিখেছেন চীনা, জার্মান ও জাপানী ভাষা।

আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা গড়ার পালায় আর এক দফা কাজ। একাজেও বিনোবা পিছনে পড়ে রইলেন না। ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি অতি সাধারণ স্তরে নামিয়ে আনলেন। দৈহিক শ্রম করেই তিনি জীবন কাটাতে লাগলেন। এর থেকেই তিনি কাঞ্চনমুক্তির সাধনায় আজ সিদ্ধ।

কুষ্ঠরোগীর সেবা গঠন কর্মের আর একটি কাজ। বিনোবা এ-কাজও করেছেন, অপরকে দিয়ে করিয়েছেন। তাঁর শিষ্য মনোহর দীবান কুষ্ঠরোগীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

এমনি মানুষ বিনোবা বলেইতো গান্ধীজীর গড়ার কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। তিনি যেন নিজেকে এ-কাজের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। কাজ হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবন, তাঁর সাধনা।

সংগ্রামের প্রথম সৈনিক

১৯৩৯ সাল এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে ঝড় উঠল।

জার্মানী বইয়ে দিল ঝড়। ধূসর কোর্তাধারী জার্মান সেনা ঝঞ্ঝাগতিতে য়ুরোপের উপর হানা দিলে। আজ পোল্যাণ্ড, কাল বেলজিয়াম, পরশু পতন হ'ল ফ্রান্সের। ইংলণ্ড ওপাশে দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগল আসন্ন পরিণামের।

পূর্বদিকেও তখন ঝড়ের মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। জাপান হুঙ্কার ছাড়লো। জার্মানীর দোসর হিসেবে সেও এশিয়ায় প্রতিষ্ঠা করবে একনায়কত্ব।

ইংরাজ ভীত, তাই সে তার উপনিবেশ ভারতবর্ষের শোষিত জনগণকে কামানের খাদ্য হিসেবে যুদ্ধে নামাতে চাইল। বড়লাট এক ঘোষণা করলেন, ভারতবর্ষ যুদ্ধরত দেশ।

কিন্তু গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি

বললেন, কংগ্রেস নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাই ব'লে দেশ কেন এ-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে? দেশের মানুষের তো স্বাধীনতা নেই। তাদের কাছে নাৎসীবাদ ও যা ইংরেজের স্বৈরতন্ত্রও তাই।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহের সংকল্প করলেন।

এ সংগ্রামের সৈনিক হবার আহ্বান জানালেন গান্ধীজী।

কিন্তু জানিয়ে দিলেন, এ সত্যাগ্রহ তিনিই করতে পারবেন যিনি সকল ধর্ম সম্বন্ধে সমভাব পোষণ করেন, যিনি গঠনমূলক কাজে বিশ্বাসী, যিনি সত্য ও অহিংসায় আস্থাবান। যিনি অস্পৃশ্যতা মানেন না, যিনি শুদ্ধ জীবন যাপন করেন।

এক কথায় সত্যাগ্রহী সৈনিক হবেন মানুষের মধ্যে সেরা! মানুষ যদি ফুল হয় তো তিনি হবেন সেরা ফুলটি। এমন বাছা ফুল না হ'লে দেশ মাতার পূজা তো হবে না, অর্ঘ্য তো পড়বে না পায়ে। কিন্তু কে এমন আছেন, যিনি হবেন প্রথম সৈনিক? সেনাপতি?

কানাকানি উঠল।

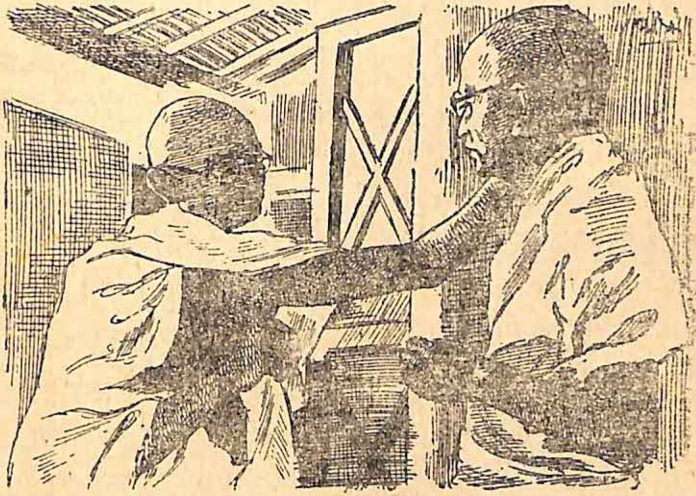
কেউ বললেন, জওহরলাল নেহেরু হবেন প্রথম সত্যাগ্রহী সৈনিক। কেউবা নাম করলেন সর্দার প্যাটেলের, কেউবা বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের।

কিন্তু গান্ধীজী সবাইকে চমকে দিয়ে জানালেন, শ্রীবিনোবাই হবেন প্রথম সত্যাগ্রহী।

দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী হ'লেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।

১৯৪০ সালের ১৭ই অক্টোবর।

পওনারে যুদ্ধ বিরোধী ভাষণ দিয়ে সত্যাগ্রহী বিনোবা শুরু করলেন সংগ্রাম। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় শিরোনামে ঝলসে উঠল নাম। সবাই ভাবলে—কে এই বিনোবা, যাঁকে গান্ধীজী দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সৈনিকের সম্মান? কে ইনি?



সবার মুখেই এক কথা—কে ইনি? শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও একই প্রশ্ন।

গান্ধীজী নিজেই দিলেন সে প্রশ্নের উত্তর। হরিজন পত্রিকায় বার হ'ল গান্ধীজীর লেখা—

"শ্রীবিনোবা ভাবে কে? কেন তাঁকে এই সত্যাগ্রহের প্রথম সত্যাগ্রহী নির্বাচিত করা হল? অন্য কাউকেই বা কেন নয়। আমার

ভারতে আসার পর ১৯১৬ সালে তিনি কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত তিনি। সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়েই তিনি আশ্রম জীবনে প্রবেশ করেন। আশ্রমের সবপ্রথম সদস্যদের মধ্যে তিনি একজন।

"সংস্কৃত-জ্ঞান বাড়াবার জন্যে তিনি এক বছরের ছুটি নিয়েছিলেন। এক বছর পরে ঠিক সেই সময় আশ্রমে এসে চুপচাপ প্রবেশ করলেন, যে সময় এক বছর পূর্বে তিনি আশ্রম থেকে বেরিয়েছিলেন। আমি তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে সেদিন তাঁর ফেরার কথা।

"আশ্রমের সব রকমের সেবা কাজে—রান্না থেকে আরম্ভ করে পায়খানা পরিষ্কার অবধি, সব কাজেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্মরণশক্তি আশ্চর্য রকমের। তিনি স্বভাবতঃই অধ্যয়নশীল। তবুও অধিকাংশ সময়ই তিনি সুতোকাটায় ব্যয় করেন আর একাজে তিনি এমনই দক্ষ হয়ে উঠেছেন যে তাঁর তুলনায় খুব কম লোকেরই নাম করা যেতে পারে। তিনি বিশ্বাস করেন ব্যাপক সুতোকাটাকে সমস্ত রচনাত্মক কাজের কেন্দ্রমণি-রূপে গ্রহণ করলে গ্রামের দারিদ্র দূর হতে পারে।

"স্বভাবতঃই শিক্ষক হওয়ার দরুণ হাতের কাজের মাধ্যমে বনিয়াদী শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি আশাদেবীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। শ্রীবিনোবা সুতাকাটাকে বনিয়াদী শিক্ষার বনিয়াদ মনে করে একখানা বইও লিখেছেন। বইখানা সম্পূর্ণ মৌলিক। বিদ্রূপকারীদের তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সুতোকাটা এমন এক শিল্প যাকে স্বচ্ছন্দে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা চলে। তকলী কাটায় তিনি তো ক্রান্তিই এতে দিয়েছেন। এর ভিতরকার লুকানো সমস্ত শক্তিই তিনি খুঁজে বার করেছেন। ভারতবর্ষে আর কেউ সুতোকাটায় তাঁর মত সম্পূর্ণতা লাভ করে নি।

"তাঁর হৃদয়ে অস্পৃশ্যতার গন্ধ পর্যন্ত নাই। সাম্প্রদায়িক একতায় তাঁর

বিশ্বাস আমারই সমান। ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য বুঝবার জন্যে তিনি এক বৎসর ধরে মূল আরবীতে কোরাণ শরীফ অধ্যয়ন করেছেন, এজন্য তিনি আরবী ভাষাও শিখেছেন। নিজের প্রতিবেশী মুসলমান ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর করে তুলবার জন্যে তিনি এ আবশ্যকতা অনুভব করেন।

"তাঁর কাছে তাঁর শিষ্য ও কর্মীদের এমন একটি দল আছে যারা তাঁর ইশারায় যে কোন রকমের বলিদান দিতে প্রস্তুত। এক যুবক কুষ্ঠরোগীর সেবায় জীবন সমর্পণ করেছেন। তাঁকে এ কাজের জন্য তৈরী করার শ্রেয় শ্রীবিনোবারই।

"বিনোবা অনেক বছর ওয়ার্ধার মহিলাশ্রমের সঞ্চালকও ছিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবাপ্রেম তাঁকে ওয়ার্ধার এক গ্রামে টেনে নিয়ে গেছে। এখন তো তিনি ওয়ার্ধা থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী পওনার গ্রামে গিয়ে বসেছেন। সেখানে থেকে নিজের তৈরী শিষ্যদের দ্বারা তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তিনি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করেন।

"ইতিহাসের তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত কিন্তু দৃষ্টি তাঁর পক্ষপাতশূন্য। তিনি বিশ্বাস করেন গ্রামবাসীদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ ছাড়া সত্যিকারের স্বরাজ আসতে পারে না এবং গঠনমূলক কাজের কেন্দ্র হচ্ছে খাদি। তিনি বিশ্বাস করেন, চরখা অহিংসার অত্যন্ত উপযোগী বাহ্যচিহ্ন। তাঁর জীবনের তো এ এক অঙ্গ স্বরূপই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"তিনি বিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমূহে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে কখনও লোক সমক্ষে আসেননি। অন্য আরও কিছু কর্মীর মতো তিনিও বিশ্বাস করেন সবিনয় আজ্ঞা ভঙ্গের গবেষণায় শান্ত গঠনকর্ম রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়ার (যেখানে আগে থেকেই ভাষণের অখণ্ড প্রবাহ চলছে) চাইতে অনেক বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী। তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে চরখার

প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা না নিয়ে এবং গঠনমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে অহিংস প্রতিকার সম্ভবপর নয়।

"শ্রীবিনোবা যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী কিন্তু তিনি নিজের অন্তরাত্মার মতো তাঁদের অন্তরাত্মারও সম্মান করেন যাঁরা যুদ্ধমাত্রের বিরোধী তো নয় কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি দিতে চান না। যদিও বিনোবা উভয় দলেরই প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছেন ; তবুও দরকার হলে কেবল বর্তমান যুদ্ধে বিরোধকারীদের একজন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি আমাকে দাঁড় করাতে হবে।"

মহাত্মাজীর সেক্রেটারী শ্রীমহাদেব দেশাই বিনোবাকে পরিচিত করাবার জন্যে লিখলেন—

"প্রসিদ্ধির পরোয়া যিনি কখনও করেননি, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ তাঁকে অসাধারণ প্রসিদ্ধি এনে দিয়েছে। এত প্রসিদ্ধ হয়েও তার মধ্যে জল-কমলবৎ নির্লিপ্ত থাকার শক্তি যতটা শ্রীবিনোবার আছে ততটা আর কারুর মধ্যে নেই।

"যে বিশেষত্বের জন্যে পূজ্য গান্ধীজী তাঁকে প্রথম সত্যাগ্রহীর মর্যাদা দিয়েছেন তা জনসাধারণ ভাল করে বুঝতে পারেন নি বলে আমার আশংকা হচ্ছে। অনেক বড় বড় সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেছেন, 'জওহরলালজী, ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি বড় বড় নেতাদের কঠোর সাজা দিতে হয় কারণ তাঁদের প্রভাব হাজার হাজার লোকের উপর বর্তমান। বিনোবা তো small fry অর্থাৎ চুনো পুঁটি। গান্ধীজীই তাঁকে বড় ক'রে দিয়েছেন। তাঁর প্রভাবের জন্য সরকারের কোন ভয় নেই।' ভয় থাকুক আর নাই থাকুক মিঃ এমারীও শ্রীবিনোবার নাম তাঁর লেখার মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে একজন খাঁটি পরোপকারী ব্যক্তি বলে বর্ণনা করেছেন।

"বিনোবার প্রভাব আজ নয় কয়েক বছর পরে লোক বুঝতে পারবে।

এখানে তাঁর চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা দরকার মনে করছি। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাঁর মতো নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সম্ভবতঃ আরও আছেন। তিনি প্রখর বিদ্বান, তাঁর মত প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য হয়ত আরও লোকের আছে। তিনি সাদাসিধা জীবন গ্রহণ করেছেন ; তাঁর চাইতেও বেশী সাদাসিধা জীবন গ্রহণকারী গান্ধীজীর অনুগামীদের মধ্যে আছেন। তিনি রচনাত্মক কাজের মহান পুরস্কর্তা এবং দিনরাত তাতেই লেগে থাকেন। এ ধরণের আরও কিছু লোক গান্ধী মার্গানুগামী আছেন। তাঁর মত তেজস্বী বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও আরও আছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এ ছাড়া আরও এমন কতকগুলো গুণ আছে যা আর কারুর মধ্যে নেই। কোন বিষয়ে স্থির নিশ্চয় করে, কোন তত্ব গ্রহণ করার পরমুহূর্ত থেকেই তা আচরণ করতে আরম্ভ করা তাঁর প্রথম শ্রেণীর গুণ। তাঁর দ্বিতীয় গুণ নিরন্তর বিকাশশীলতা। আমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ কেউই একথা বলতে পারে না যে আমি প্রতিক্ষণ বিকশিত হচ্ছি। বাপুকে বাদ দিয়ে যদি আর কারুর মধ্যে এ গুণ আমি দেখে থাকি তো তা দেখেছি বিনোবার মধ্যে। এইজন্য ৪৬ বছর বয়সে তিনি আরবীর মত কঠিন ভাষা শিখে কোরাণ শরীফ অধ্যয়ন করে তার হাফিজ হয়েছেন। বাপুর এমন কিছু অনুগামী আছেন যাঁদের প্রভাব জনতার উপর খুব বেশী ; কিন্তু বাপুর অন্য কোন অনুগামীই সত্য ও অহিংসায় বিশ্বাসী সত্যিকারের সেবক এতজন তৈরী করতে পারেন নি, যা বিনোবা করেছেন। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' এর অর্থে বিনোবা প্রকৃত যোগী পুরুষ। তাঁর চিন্তাধারা, বাণী ও আচরণ যেমন একসুরে বাঁধা তেমনটি খুব কম লোকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সেইজন্য তাঁর জীবন এক মধুর সঙ্গীতময়। 'সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনা সম্ভবতঃ বিনোবা

পূর্ব জন্মেই করে এসেছেন। এই ধরণের অনুযায়ীরাই গান্ধীজী ও তাঁর সত্যাগ্রহের শোভা।”

সত্যাগ্রহ শুরু করে দিলেন বিনোবাজী। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—প্রতিটি যুদ্ধ, বিশেষ করে এইটি মূর্খতা দ্বারা প্রসূত এক মহাপাপ।

ইংরেজ ও তাদের মিত্র এবং শত্রুপক্ষকে একই দলে ফেলা চলে। তারা তো এরই মধ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা এই মহৎ কাজ হাতে নিয়েছে, হিংসা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফলতা তারা দেখাবে।

কোন লোক জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে দিতেন—ইংরেজ-রাজ শেষ হয়ে গেছে, মানুষকে গিয়ে একথা বলে দাও।

সত্যাগ্রহী সৈনিকের এ ভাষণ সইতে পারলে না যুদ্ধোন্মাদ ব্রিটিশ সরকার। সংগ্রাম শুরু করার চতুর্থ দিনে গ্রেফতার হলেন বিনোবাজী। তিন মাসের জেল হ'ল তাঁর।

জেল থেকে বেরিয়ে আবার তিনি আরম্ভ করলেন সংগ্রাম। আবার জেল হ'ল। এইভাবে তিন তিনবার কারাবরণ করলেন।

কিন্তু কারাবরণ করেও বিনোবা কর্মবিমুখ হলেন না। ধুলিয়া জেলে বসে লিখেছিলেন—গীতাই ও গীতা প্রবচন। ১৯৪০-৪১ সালের কারাবরণের ফলে দিলেন 'স্বরাজ-শাস্ত্র'।

জেলের সত্যাগ্রহী বন্ধুরা শুনতে চাইলেন স্বরাজ-শাস্ত্রের আলোচনা। বিনোবা মুখে মুখে বলে গেলেন। আর তাঁর কলমচী হলেন ব্রীজলাল বিয়ানী।

'স্বরাজ-শাস্ত্রে' বিনোবা গান্ধীজীর স্বপ্নকে ভাষা দিলেন।

তিনি বললেন—রাজ্য এক, স্বরাজ্য আর এক। রাজ্য লাভ হিংসায়ও সম্ভব, কিন্তু স্বরাজ্য লাভ অহিংসা ছাড়া অসম্ভব, তাই চিন্তাশীলগণ রাজ্য চান না। তাঁরা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন—স্বরাজ্যের কামনায়। বলেন—এস, সেই চেষ্টাই করা যাক্!

স্বরাজ্য অর্থ প্রতিজনের রাজ্য। যে রাজ্যকে প্রতি মানুষই মনে করে—এ আমার। তার মানে সকলের রাজ্য—রামরাজ্য।

গান্ধীজী প্রতি পল্লীকে একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত্ররূপে কল্পনা করেছেন। সেখানে জীবনের যা দরকারী জিনিস তার উৎপাদন হবে—সবাই হবে স্বাবলম্বী। আবার সকল বিষয়ে তারা সহ-যোগীও হবে। এই কল্পনা রূপ পেয়ে ফুটে উঠল বিনোবার স্বরাজ-শাস্ত্রে।

বিশ্বযুদ্ধ আরো ভয়াল হয়ে উঠল। ইংরেজের ভারতবর্ষকে না হলে আর চলে না। স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্‌কে পাঠালেন ব্রিটিশ সরকার কিন্তু নিষ্ফল হ'ল সে দৌত্য।

আর সরকারের সঙ্গে সহযোগীতার কোন আশাই রইল না। কংগ্রেস ঘোষণা করলেন—ভারত ছাড়তে হবে ইংরেজকে। মহাত্মাজী সেই ঘোষণার সঙ্গে জুড়ে দিলেন অমোঘ বাণী—

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

সংগ্রাম শুরু হবে। তার আগে ডাকলেন প্রিয় শিষ্য বিনোবাকে। শুধালেন, আচ্ছা বল তো, হিংসার প্রতিকার করতে অহিংসা যার ধর্ম সে উপবাসে আত্মবলিদান দিতে পারে কি না?

বিনোবা উত্তর দিলেন, হাঁ এক্ষেত্রে তা পারে। অহিংসার সঙ্গে এর অমিল নেই।

গান্ধীজী তবু ভেবে দেখতে বললেন।

বিনোবা উত্তর দিলেন, আর ভেবে দেখার দরকার নেই। যা বলেছি, ভেবেই বলেছি, বিচার করে বলেছি।

গান্ধীজী খুশি হলেন তাঁর উত্তরে।

সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। শুরু হবার মুখেই গ্রেফতার হলেন গান্ধীজী আর নেতারা। কিন্তু গান্ধীজীর বাণী তো নীরব হয়ে গেল না। সে-বাণী ছড়িয়ে পড়ল ভারতের দিকে দিকে। জ্বালামুখী ফুটে উঠল। ইংরেজ সরকারকে উচ্ছেদ করে জনগণ বসালেন গ্রামে গ্রামে স্বরাজ্য সরকার। ব্রিটিশ সিংহ গর্জন করে উঠল। মারণাস্ত্রের ভয়াল গর্জনে মূর্ত হয়ে উঠল তার চিৎকার। দলে দলে বলি পড়লেন শহীদবীর—গ্রামকে গ্রাম মুছে গেল। কিন্তু তবু সে বাণী রইল অমর হয়ে—

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—করব না হয় মরব।

কেঁপে উঠল ব্রিটিশ রাজের তখ্‌ত। ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হ'ল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট।

নেতারা আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন। বিনোবাও তাঁদের সঙ্গে ছাড়া পান। নেতারা যখন রাজনৈতিক ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত, তিনি তখন আশ্রমে গিয়ে আবার গ্রামসেবায় নিজেকে ঢেলে দিলেন।

গান্ধীজীর দেওয়া ভার

কবিগুরু তখন অন্তিম শয্যায়।

তবু তিনি এই সর্বনাশা যুদ্ধের খোঁজ খবর রাখতেন। একদিন তিনি বললেন, ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে একদিন ইংরেজ তার ভারতের সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু ভারতকে কী দশায় ফেলে তারা ছেড়ে যাবে? তাদের বহু শতাব্দীর জরাজীর্ণ শাসন ব্যবস্থা রেখে যাবে। রেখে যাবে দারিদ্র, জঞ্জাল আর কর্দমের মরুভূমি।

...কিন্তু তবু দিগন্তে উষার উদয় হবে—পূর্বদিক থেকেই উদয় হবে—সেখানে তো সূর্য চিরদিনই ওঠে।

গুরুদেব অন্তিম শয্যায় যেকথা বলেছিলেন, তাই-ই সত্য হ'ল। ইংরেজদের আর এদেশে টিঁকে থাকা সম্ভব হ'ল না। নতুন নতুন প্রস্তাব নিয়ে এলেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যগণ। নেতাদের সঙ্গে চলতে লাগল ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে মিল হ'ল না। মিল তো হলই না, তার উপরে মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর আহ্বানের ফলে দেশে জ্বলে উঠল সাম্প্রদায়িকতার আগুন। সে আগুনে কত যে মানুষ প্রাণ দিলে তার তো কোন হিসেব নেই। দাঙ্গা প্রথম লাগল ক'লকাতায় ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীতে দাঙ্গা হয়ে উঠল অতি ভয়ংকর। বহু লোক মরল, বহু বাড়ি-ঘর পুড়ে গেল, আরো কত অনাচার যে ঘটল, তার বর্ণনা করা যায় না।

৭৮ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ অবস্থায় গান্ধীজী ছুটলেন নোয়াখালী। খালি পায়ে গ্রামে গ্রামে হেঁটে গেলেন, মানুষকে শোনালেন শান্তির কথা, অহিংসার কথা। নোয়াখালী শান্ত হ'ল।

বিনোবা তখন পরমধাম আশ্রমে। তাঁকে সবাই বললেন, আপনিও নোয়াখালী যান।

কিন্তু বিনোবা বললেন, বাপুজীর হুকুম ছাড়া এক-পাও নড়বেন না।

এরই মধ্যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। ভারত দুভাগ হয়ে বসল দুই রাষ্ট্রে—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান।

গান্ধীজী বলে উঠলেন, আমার সমস্ত জীবনই ব্যর্থ হয়ে গেল।

তবু দাঙ্গা তো থামে না! গান্ধীজী ছুটে যান, মানুষকে বোঝান। বলেন অহিংসার কথা, শান্তির কথা। গান্ধীজী বলেন, আমার দুপক্ষের বন্ধুগণ, আমি আপনাদের জন্য আর কিছু করতে পারব না—শুধু প্রার্থনা ছাড়া। আর পারি দুঃখ সইতে—আপনাদের শান্তির জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করতে। আপনাদের যতদিন না মিলন হয়, আমি অনশন করে থাকব।

গান্ধীজীর কথায় দাঙ্গা থেমে গেল। গান্ধীজী জয়ী হলেন। কিন্তু হায়, মিলনের পুরোহিত তো রইলেন না। হিংসা এসে অহিংসার ঋষিকে গ্রাস করল। আততায়ীর আঘাতে মৃত্যু হ'ল তাঁর। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী সেই নিদারুণ দিনটি।

সমগ্র জগৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সেদিনের স্তব্ধতা বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রবল ঝড়ে বিশাল বটবৃক্ষ উপড়ে পড়লে আশ্রিত পক্ষিকুলের যে দশা হয় ভারতবাসীর অবস্থা তার চাইতেও

অসহায় হয়ে পড়ল। মহাযোগীর আকস্মিক তিরোধান যেন মহাপ্রলয়ের স্তব্ধতা এনে দিল দেশের বুকে। রাজপথে লোক চলাচল আছে কিন্তু কোন সাড়া নেই, কোন শব্দ নেই, কোন কোলাহল নেই। সীমিত শোকে লোক কাঁদে কিন্তু যে শোক সীমাহীন তা যে কান্নার অনুভূতিকেও অসাড় করে দেয়। ভারতের বুকের ওপর দিয়ে সেদিন যেন এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল।

১৩ই মার্চ গান্ধীভক্তদের এক সম্মেলন বসল সেবাগ্রামে। গান্ধীজীর গড়া নানা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মিশিয়ে দিয়ে সৃষ্টি হ'ল 'সর্ব সেবা সংঘ'। কিন্তু কে নেবে বাপুর এই কাজের ভার? সবাই বিনোবার দিকে তাকালেন। বিনোবা সৃষ্টি করলেন 'সর্বোদয় সমাজ'।

সর্বোদয় শব্দটি গান্ধীজীরই সৃষ্টি। ইংরেজ সাহিত্যিক ছিলেন জন রাস্কিন। তাঁর 'আন টু দিস লাস্ট' বইখানি অনুবাদ করেছিলেন গান্ধীজী। সেই অনুদিত বইখানির নাম দিয়েছিলেন তিনি 'সর্বোদয়'। বিনোবা সেই সর্বোদয় শব্দটিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে দিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন,—

সর্বোদয় মানে সকলের উদয়। কারও উদয় আর কারও অস্ত নয়। পাশ্চাত্য আমাদের কাছে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণের কথা বলছে। ভারতের কথা তা নয়। ভারতের কথা 'সর্বে নঃ সুখিনঃ সন্তু' সমস্ত লোক সুখী হোক। সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণের কথায় 'greatest good of the greatest number' এ অল্প ও বহুর প্রশ্ন বর্তমান কাজেই বিরোধের বীজও থেকেই যায়। কতক লোকের উদয়

আমাদের লক্ষ্য নয়, অধিক লোকের উদয়ও আমাদের লক্ষ্য নয়, অধিকাধিক লোকের উদয়েও আমরা সন্তুষ্ট নই। সকলের উদয়েই মাত্র আমাদের তুষ্টি। ছোট-বড়, বুদ্ধিমান-অবোধ সকলের উদয় চাই, তবেই আমাদের স্বস্তি। এই বিশাল ভাব সর্বোদয় শব্দে নিহিত।"

গান্ধীজীর শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ তখনো শেষ হয়নি। দাঙ্গা শেষ, কিন্তু শরণার্থীর দল আসছে—তাদের নিয়েই সমস্যা। বিনোবা দিল্লী ছুটে এলেন। শরণার্থীদের শিবিরে হ'ল তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাদের আশ্বাস দিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় বাতলে দিতে লাগলেন। শিবিরে শিবিরে উঠল চরখার গুণগুণানি, যাঁতা ঘুরতে লাগল। শরণার্থীরা পেল কাজ।

কিন্তু এদের মধ্যে মেওদের সমস্যা জটিল। এরা দিল্লী, আগ্রা, ভরতপুর, আলোয়াড় অঞ্চলের মুসলমান চাষী। পাকিস্তান হবার পর চলে যায় সেখানে কিন্তু টিকে থাকতে না পেরে আবার ফিরে আসে দেশে। এরই মধ্যে এদের বাড়ি-ঘর জায়গাজমি সব বেদখল হয়ে যায়। হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি দরদী তখন সবাই, কিন্তু এরা মুসলমান বলেই এদের উপর বেদরদী, নিষ্ঠুর।

বিনোবা এদের ভার কাজ তুলে নিলেন। এদের হয়ে তিনি বলে কয়ে জায়গা-জমি বাড়ি-ঘর কিছু কিছু ফিরিয়ে দিলেন। আবার অন্যান্য সকলের পুনর্বসতির ব্যবস্থাও করলেন।

দিল্লী থেকে বিনোবা গেলেন বিকানির। সেখানে ঘোরালো হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। গান্ধী সপ্তাহ উপলক্ষে কয়েকজন কর্মী হরিজন বস্তিতে গিয়ে কাজ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও হরিজন

বনে গেলেন, দেব মন্দিরের দরজা তাঁদের মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেল। মন্দিরে ঢুকতে না পেরে তাঁরা সত্যাগ্রহ শুরু করে দিলেন।

বিনোবা খবর পেয়ে সেখানে গেলেন। তিনি তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, আপনারা ছোট সত্যাগ্রহ ছেড়ে দিন, বড় সত্যাগ্রহ শুরু করুন! তার মানে—যে মন্দিরে হরিজন ঢুকতে পায় না, সে-মন্দিরে ঢোকার আগ্রহই ছেড়ে দিন।

বিকানির থেকে আজমীর গেলেন বিনোবা। সেখানে খাজা সাহেবের দরগায় উর্সের মেলা।

সারা ভারতের মুসলমানরা আসেন এই উৎসবে। কাছেই হিন্দুদের তীর্থ পুষ্কর। সাম্প্রদায়িক আগুণ তো তখনো নিবু নিবু হয়ে আছে, একেবারে নেবেনি। যদি মেলা উপলক্ষে জ্বলে ওঠে তাই সকলের ভয়। গান্ধীজীর এই মেলায় যাবার কথা ছিল। গান্ধীজী নেই কে যাবে?

গান্ধীজীর প্রতিনিধি হয়ে এলেন বিনোবা। শান্তির প্রতীক গান্ধীজীর মহান বাণী নিয়ে এলেন। সাতদিন কেটে গেল সেখানে। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সবাইকে বললেন অহিংসার কথা।

দরগা-শরীফে একদিন মুসলমানরা তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সে বড় পবিত্র স্থান। বিনোবা সেখানে প্রার্থনা করলেন, বক্তৃতা দিলেন, গাইলেন রামধুন—রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।

দরগার ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। হিন্দু-মুসলমান সেদিন সমস্ত বিভেদ ভুলে গেলেন। দরগার দেওয়ান সাহেব

বিনোবাজীকে পীরের সম্মান দিলেন। 'সিরোপা' উপহার পেলেন তিনি।

হায়দরাবাদে রাজাকারদের উপদ্রব শুরু হ'ল। সেখানেও বিনোবাজীকে চাই। ছুটে গেলেন তিনি। ঘুরে ঘুরে শোনালেন শান্তির কথা। শান্তি ফিরে এল। কিন্তু এই যে অশান্তি—এই যে বিরোধ, কোথায় এর মূল? উপরে উপরে শান্তির প্রলেপ লাগালে কি এ-বিরোধ থামবে? থামবে কি শুধু ছুটে বেড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে? না, তা তো নয়। বিনোবা এ-বিরোধের মূল কোথায় খুঁজতে লাগলেন। সেই কথাই বোঝাতে লাগলেন মানুষকে। আজমিরের এক সভায় বললেন—

"আজ যে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে তা কোন বিশেষ স্থানের সমস্যা নয়। এ সমস্যা সমস্ত ভারতের। শিক্ষিত জনসাধারণ যদি পরিশ্রম করে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক না দিয়ে চাকুরি ও ব্যবসা করে জীবিকা উপার্জন করতে চান তবে ভারতের এ লড়াই-ঝগড়া কখনও বন্ধ হবে না, বাড়তেই থাকবে। কোন সময় তা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার রূপ নেবে, কখনও তা সিন্ধী-মারোয়াড়ীর রূপে ফুটে উঠবে কখনও বা অন্য কোন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু এ সব রূপ বাইরের রূপ মাত্র। ঝগড়ার আসল কারণ হচ্ছে গরীবের শোষণ। উৎপাদনের দায়িত্ব যাদের ওপর তাদেরই পেটে অন্ন নেই। অন্যান্য লোকেরা বেশ পেট ভরে খাচ্ছে।"

বিনোবা এমনি করেই গান্ধীজীর আরব্ধ কাজের ভার তুলে নিলেন। হলেন গান্ধীজীর ওয়ারিশ—উত্তরাধিকারী।

হবেন না কেন? অধিকারী যে তাকেই অধিকার চিরকাল বরণ করে থাকে। অনধিকারীকে তো নয়।

কাঞ্চন মুক্তির সাধনা

হায়দরাবাদ থেকে আবার আশ্রমে ফিরে এলেন বিনোবা।

সফরের সময় কাজ করেছেন, চোখ ছিল তার সজাগ তাই অনেক কথাই ভেবেছেন।

দেখেছেন, দেশ দারিদ্র্যে ভরা—তার প্রতিকারের উপায় নিয়ে কত ভেবেছেন।

ধন আর শ্রম—দুটি শক্তি। এই দুটি শক্তিই বড় প্রবল। শ্রম উৎপাদন করে। কিন্তু সেই শক্তিকে ছেড়ে মানুষ যখন ধনের উপর নির্ভর করে, তখনি জগতে নানা অনর্থ দেখা দেয়। ঋষিরা, জ্ঞানীজনেরা বলেছেন—অর্থম্ অনর্থম্। অর্থই সব অনর্থের মূল। অতীতে সমাজে মানুষ করত শ্রম, নিজের নিজের দরকারী জিনিস নিজে পরিশ্রম করে উৎপাদন করত। সেখানে একেবারে নিঃস্ব যেমন ছিল না, আবার মস্ত ধনীরও উদয় হওয়া ছিল অসম্ভব। কিন্তু ধীরে ধীরে ধন গিয়ে জমা হ'ল কিছু লোকের হাতে, তারা নিজেরা শ্রম ছেড়ে দিলে। এবার শুরু হ'ল মানুষে মানুষে বিভেদ, বৈষম্য। অর্থ দিয়ে মানুষ কিনতে লাগল অন্যের শ্রমে তৈরী করা জিনিস। শ্রম না করে অর্থের পেছনেই ছুটতে লাগল তারা। শ্রমের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অর্থ সঞ্চয় শুরু করলে। এমনি করেই এসেছে ধনবাদ। অর্থের সাহায্যে জমি আর উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ এসে গেছে মুষ্টিমেয় ক'জনের হাতে। শ্রমের মর্যাদা, শ্রমিকের মর্যাদা এমনি করেই লুপ্ত হয়েছে। শ্রমকে

বসাতে হবে আবার তার মর্যাদার আসনে—নইলে তো দূর হবে না ধনী দরিদ্রের এই প্রভেদ—দূর হবে না অসাম্য। ধরণী হবে না মঙ্গলময়।

আজকের যুগে অর্থ দিয়ে জিনিসের মূল্য ঠিক করা হয়। কিন্তু তাতে জিনিসের আসল মূল্য বোঝা যায় না। আগে এক সের গমে যতটা পেট ভরত, এখনো ততটাই ভরে। কিন্তু আগে তার দাম ছিল এক পয়সা, এখন কয়েক আনা। পয়সা আসল দাম চেপে রাখে, সে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। চালাকি ক'রে বা যে ভাবেই হোক, কয়েকটা পয়সা পুঁজি করতে পারলেই স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানো যায়। তাই লোক শ্রম ছেড়ে অর্থের পেছনে ছোটে। আর তাই তো যত অনর্থ। বিনোবা ভাবলেন পয়সা বদমাইস, চরিত্রহীন। শ্রমিকের কল্যাণ করতে হলে, শ্রমাশ্রয়ী সমাজ সৃষ্টি করতে হবে। এই ধনবাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে হবে।

স্বরাজ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী ধনীদেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন। ধনীরা ছুটে এসেছিলেন—অর্থ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন দেশ স্বাধীন। স্বাধীন দেশে এই ধনবাদ বরবাদ করে দিতে হবে। নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। বিনোবা ভাবলেন—

'আমাকে এই মায়াজাল থেকে মুক্ত হতেই হবে। যতক্ষণ আমি কোন গাছের ডালে বসে থাকব ততক্ষণ তা কাটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি তা কাটতে হয় তো তার আশ্রয় ছেড়ে আমাকে নেমে আসতে হবে।'

ঠিক করলেন, এই কাঞ্চন-মুক্তি-যোগ তিনি অভ্যাস করবেন আগে, তারপর সকলের কাছে প্রচার করবেন। পয়সাকে আর কারবারী করবেন না। বদমায়েসের কাছে নিজের চাবিকাঠী আর ফেলে রাখবেন না। যে কথা সেই কাজ।



আশ্রমে শুরু হ'ল কাঞ্চন-মুক্তির সাধনা। ১৯৪৯ সালের ১লা ডিসেম্বর আশ্রমিকদের ডেকে তিনি বললেন তাঁর পরিকল্পনা। আশ্রমিকদের নিয়ে শুরু হ'ল কাজ। বিনোবা তিন দিন উপবাস ক'রে অর্থ-বর্জন সাধনা আরম্ভ করলেন। সবাই মিলে ঠিক করলেন, আশ্রমের জন্য নেবেন না কোন অর্থ-সাহায্য। কেউ সাহায্য করতে চাইলে দৈহিক শ্রম দিয়েই তা করতে পারবেন।

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কাঞ্চন-মুক্তির সাধনা আরম্ভ হ'ল। সে সময়ে পওনার আশ্রমে ছিল মাত্র এক একর জমি, তাও পাথর আর কাঁকরে ভরা। আশ্রমের বাসিন্দে ছিল ষোলো সতেরো জন। বিনোবা ঠিক করলেন, এই জমিতে আশ্রমের সকলের জন্য শাক-সব্জি তৈরী করতে হবে। অমনি তিনি কোদাল নিয়ে সেই জমিতে নেমে পড়লেন, আর সবাই তাঁর পিছনে। কঠোর পরিশ্রমে কাঁকর ভরা জমি সবুজ হয়ে উঠল, সোনা ফলল খেতে।

এখন সকল বিষয়ে স্বাবলম্বনের জন্য সাড়ে সতেরো একর জমি নেওয়া হ'ল। বিনোবা সেখানে পরীক্ষা শুরু করে দিলেন।

প্রথমেই সেখানে চাষের সব কাজ নিজেদের হাতে করা শুরু হ'ল। এর নাম ঋষি-খেতি। ঋষি-খেতির অর্থ—খেতের যাবতীয় কাজ নিজের হাতে করা। যিনি তা করেন তাঁর বুদ্ধির তেজ বাড়ে, তিনি ঋষি হবার পথে চলেন।

তারপরে জলের ব্যবস্থার জন্য কূয়ো খোঁড়া। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে শুরু হ'ল এ-কাজ। আট মাসে শেষ হ'ল কূয়ো খোঁড়ার কাজ। কূয়ো থেকে কূপযন্ত্র দিয়ে জল সেঁচা আরম্ভ হ'ল। নানারকমের ফসল ফলানো সম্ভব হ'ল।

দেখতে দেখতে প্রায় চৌদ্দ একর জমিতে চাষ ক'রে ১৩৫ মণ জোয়ার, ৮৬॥ সের তিল, ১০ মণ ২৭ সের চিনেবাদাম ও ৬ মন ১০ সের অড়হর ডাল পাওয়া গেল। খাবার সমস্যা মিটে গেল। অন্য সব খরচ চালাবার জন্য আশ্রমের কর্মীরা

'গ্রামসেবা মণ্ডলে' চরখা তৈরী, তাঁতবোনা প্রভৃতি কাজ করতে লাগলেন।

সুতো কাটতে কাটতে, কূয়ো থেকে রহট বা কূপযন্ত্র দিয়ে জল তুলতে তুলতে প্রার্থনা চলতে লাগলো। এ যেন পুরা-কালের সেই ঋষিদেরই আশ্রম। এই সময় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এসে মিলিত হন বিনোবাজীর সঙ্গে। তিনি তাঁর সঙ্গে রহটে জল তোলেন সঙ্গে সঙ্গে আলোচনাও চলতে থাকে।

বিনোবা গণিতবিদ্। সব কাজেই তাঁর নিখুঁত হিসেব। ক' ঘণ্টা কাজ ক'রে কতটা উৎপাদন হয়েছে তারই হিসেব থেকে বার করলেন—কত জনের কতটা জমির দরকার।

'ঋষি খেতি' ক'রে বিনোবা বুঝলেন, সেচের ব্যবস্থা থাকলে টুকরো জমিতেও চাষ ভাল হয়। আর জমির মালিক ও জমির চাষী যদি একই মানুষ হয়, তাতে জমি থেকে তিনগুণ বেশী আয় হয়।

নতুন পথ পেলেন বিনোবা। সে পথ শুধু নিজের আশ্রমেই আবদ্ধ রইল না, ছড়িয়ে পড়ল নানা আশ্রমে। দীপ থেকে জ্বলে ওঠে দীপ। তেমনি আশ্রম থেকে আশ্রমে ঋষি খেতি ছড়িয়ে পড়ল। ডাঃ কুমারাপ্পা, অধ্যাপক বঙ্গ প্রভৃতি তাঁদের নিজেদের কর্মস্থলে ঋষি-খেতির প্রবর্তন করলেন।

হায়দরাবাদ সফর থেকে ফেরার সময়েই বিনোবার পেটে একরকম বেদনা আরম্ভ হয়। চিকিৎসকগণ বললেন, 'অন্ত্রে ফোঁড়া হয়েছে, অপারেশন করতে হবে।' বিনোবা বললেন, 'আমি অপারেশন করাব না, রাম নামেই আমার ব্যাধি সেরে

যাবে।' সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিনোবা তাঁর খাদ্য পরিবর্তন করলেন এবং অন্নবস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কঠোর শরীর শ্রম আরম্ভ করে দিলেন। প্রতিদিন আট ঘণ্টা ক'রে খেতের কাজ ও কুয়ো খোঁড়ার কাজ করতে লাগলেন। কঠোর শরীরশ্রম ও অপূর্ব মনোবলের সাহায্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।

সর্বোদয়ের পথে

সর্বোদয় শব্দের স্রষ্টা গান্ধীজী। তাঁর সমস্ত কর্মেরই গতি ছিল সর্বোদয়ের দিকে। সর্বোদয় অর্থাৎ সকলের উদয়, সকলের উন্নতি, সকলের বিকাশ। চিন্তাজগতে ভারতীয় মনীষার এ অপূর্ব অবদান। অল্পাংশের নয়, অধিকাংশের নয়, সর্বাংশের—সর্বমানবের সর্বাত্মক কল্যাণের নামই সর্বোদয়। সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানব সমাজকে শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং তার জন্যে সর্ব প্রথমে প্রয়োজন ছিল বিদেশী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা। গান্ধীজীর সুদীর্ঘ সংগ্রামময় অনুপম জীবন সেই বিরাট ও মহান কাজেই সমাপ্ত হয়ে যায়। সর্বমানবের কল্যাণ চিন্তায় ব্যাঘাত না করে, কারও হানি না পৌঁছিয়ে, মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রামের পথে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে এ কেবল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। সর্বোদয়ের মূল লক্ষ্য হ'ল সর্বমানবের সর্বোত্তম বিকাশ সাধন। এই বিকাশ লাভের

বাধা হচ্ছে শাসন ও শোষণ ; তা দেশীই হোক কিম্বা বিদেশীই হোক। কাজেই সর্বোদয় সাধনার মানেই হল সর্বপ্রকারের শাসন ও শোষণ মুক্তির সাধনা।

বিনোবা এই সাধনার নাম দিয়েছেন 'সাম্যযোগ'। সর্বোদয় হ'ল লক্ষ্য আর সাম্যযোগ তা লাভ করবার পথ। সাম্যবাদ ও সাম্যযোগের পার্থক্য এখানে বুঝা দরকার। একটা 'বাদ' অপরটা 'যোগ'। বাদ মানে মতবাদ বা আদর্শ আর যোগ মানে অভ্যাস। কাজেই মানবসমাজে যাঁরা সাম্যের প্রয়াসী তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে সাম্যের অভ্যাস করা দরকার। কেবল আদর্শবাদিতায় সত্য বাস্তব হয়ে ওঠে না। ব্যক্তি জীবনে সাম্যের অভ্যাসের নামই অহিংসা। পূর্ণ বিকশিত অহিংস সমাজই পূর্ণ বিকশিত সর্বোদয় সমাজ। তার জন্য আবশ্যক দ্রোহ-রহিত অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বর্জিত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং দণ্ডরহিত অর্থাৎ হিংসা বর্জিত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন ; তার মানে বিকেন্দ্রীত ও স্বাবলম্বী উৎপাদন এবং বিবেক-নিয়ন্ত্রিত শাসন বা বিচার শাসন।

সর্বোদয়ের আদর্শ হ'ল শাসন ও শোষণের পূর্ণ অবসান। কিন্তু আদর্শ স্থিতি সর্বদাই অন্তিম স্থিতি সেইজন্যে জ্যামিতির বিন্দুর মত তা অদৃশ্যও বটে। অথচ সেই অদৃশ্য বিন্দুর অবলম্বন ছাড়া দৃশ্যমান জগতের কল্পনাও অসম্ভব।

সর্বোদয়ের আদর্শ সম্পূর্ণ শাসন-মুক্ত সমাজ, কিন্তু তার বাস্তব স্বরূপ হচ্ছে শাসন-নিরপেক্ষ সমাজ। শাসন ব্যবস্থা কমাতে কমাতে অবশিষ্ট শাসন যেটুকু থাকবে তার স্বরূপ হবে ফুলের মালার গ্রন্থন-সূত্রের মতো। রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম হবে

পূর্ণ বিকশিত এক একটি ফুল ও রাষ্ট্র হবে তাদের গ্রন্থন-সূত্র। অন্নেবস্ত্রে, শিক্ষায় স্বাস্থ্যে, আনন্দে ও বাসস্থানে স্বাবলম্বী এবং স্বয়ং ব্যবস্থিত গ্রামের সমষ্টিই সর্বোদয় সমাজ। রাষ্ট্র সেখানে কেবল গ্রন্থন-সূত্র—বাইরে থেকে তা দেখাই যাবে না। সেইজন্য সাম্যযোগের পথ, এক কথায়, উৎপাদন ব্যবস্থায় ও শাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বনের পথ।

সাম্যবাদেরও অন্তিম লক্ষ্য শাসনহীনতা (Statelessness)। কিন্তু সাম্যবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগে দেখা যায় শাসন-পূর্ণতার (Statefulness) দিকেই তার অগ্রগমন। সব কিছুই রাষ্ট্রায়ত্ত (Nationalise) করার দিকে সাম্যবাদী সমাজের গতি—অর্থাৎ সর্বাধিকার বাদ (Totalitarianism)। সাম্যবাদী-ব্যবস্থার দাবি হ'ল শাসন বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যখন পূর্ণত্ব লাভ করবে তখন তার অস্তিত্ব আর থাকবে না (State will wither away); কেননা আবশ্যকতা না থাকলে অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একথা সত্য যে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির পরই পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লী যাবার ইচ্ছে মনে রেখে কেউ যদি পূব মুখো যেতে আরম্ভ করে তবে যুক্তির দিক দিয়ে (পৃথিবী যখন গোল!) কোন না কোন দিন সে দিল্লী পৌঁছবেই। কিন্তু বাস্তব স্থিতি এই দাঁড়াবে, যে ক'-ধাপ সে পূবদিকে এগুতে থাকবে সেই ক'-ধাপই সে দিল্লী থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। কোনদিন দিল্লী পৌঁছবে এ কল্পনা ক্রমশঃই অবাস্তব ব'লে মনে হবে।

পক্ষান্তরে 'সাম্যযোগী' সমাজ প্রতি পদক্ষেপেই রাষ্ট্রমুক্তির

দিকে এগুতে চায়। অন্ন-বস্ত্র শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যাপারেই সে রাষ্ট্রের হাত থেকে মুক্তি চায়। বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বন সাম্যযোগের তুই পা। এই তুই পায়ে ভর ক'রে সে ক্রমাগত শাসনমুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে চায়। যে ক'-ধাপ সে এগুবে সেই ক'-ধাপই সে শাসন-মুক্তির (Statelessness) দিকে যাবে।

বিনোবা বলেন, "রাজতন্ত্রের যুগ চলে গেছে ; অভিজাত-তন্ত্রের যুগও শেষ। প্রজাতন্ত্রের দিনও ফুরিয়েছে। আজ আগত সর্বরাজের দিন। সর্বরাজের অর্থ কেবল ভোটাধিকার মাত্র নয়, সকলের আন্তরিক সহযোগ। সবেতে আমি আর আমাতে সব, এই অনুভূতি-রাজ্যের যুগ আস্‌ছে।

"পৃথিবীর কোন তুই শক্তির সঙ্গে যদি সংঘর্ষ বাধে তো তা বাধবে লোকে যাকে সাম্যবাদ বলে তার আর সর্বোদয় ভাব-ধারার সঙ্গে। অন্যান্য যে সব শক্তি আজ দেখা যাচ্ছে, তার কোনটিই বেশীদিন স্থায়ী হবে না। এই তুই মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য যেমন বেশী বিরোধও তেমনি প্রচণ্ড।"

গ্রামরাজ্য (Independent Village Republic) বা রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত কাজ অনুগামীদের হাতে সঁপে দিয়ে মহাত্মাজী চলে গেলেন। অনুগামী-শ্রেষ্ঠ বিনোবার উপর স্বভাবতঃই সে দায়িত্ব এসে বর্তালো। সৃষ্টি করলেন তিনি 'সর্বোদয় সমাজ'। 'সর্বোদয় সংঘ' নাম না করে সর্বোদয় সমাজ কেন করা হ'ল সে সম্বন্ধে বিনোবা বলেছেন,—

"সংঘ শব্দ নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক, তাই তার ব্যাপ্তিও সীমাবদ্ধ।

কিন্তু সমাজ শব্দ ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক ; সর্বোদয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এর ব্যাপকতা পূর্ণত্ব লাভ করেছে। সংঘ এমন সংস্থা যাতে কেবল বিশেষ লোকেরাই আসতে পারেন। মানুষের বিকাশের পক্ষে যে প্রসার ও স্বাধীনতা দরকার এতে তা নেই।

"সর্বোদয় সমাজ কোন সংস্থা নয়। এ হচ্ছে সহ-বিচারের, সহ-চিন্তনের আধার। এ এক অনিয়ন্ত্রিত ভাবধারা যা আমরা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই ; বিশ্বব্যাপী যার বিস্তার তা কি কখনও শরীরী হতে পারে ?"

সর্বোদয় সমাজের প্রথম সম্মেলন হ'ল ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে মধ্যপ্রদেশের রাউ নামক স্থানে। দ্বিতীয় সম্মেলন হ'ল ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে আঙ্গুলে (উড়িষ্যা)। কিন্তু সর্বোদয় সমাজের পুরোহিত আচার্য বিনোবা শরণার্থীদের সেবায় ও কাঞ্চন-মুক্তির সাধনায় নিমগ্ন। ঠিক হ'ল ১৯৫১ সালের সম্মেলন হবে হায়দরাবাদের শিবরামপল্লীতে।

হায়দরাবাদ বিগত আড়াই বছর ধ'রে হিংসাবাদী রাজনৈতিক দল ও সৈন্যগণের লড়াইক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেখানকার কৃষককুলের অবস্থা তখন শোচনীয়। উৎপন্ন ফসলের মাত্র ১/১০ অংশ তারা পেত, সঙ্গে এক-আধখানা কম্বল ও এক জোড়া জুতো। জীবন ধারণের উপযোগী কোন ব্যবস্থাই তাদের ছিল না। সাম্যবাদী কর্মিগণ সেখানে গিয়ে মালিকদের কাছ থেকে জোর করে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সরকারী সৈন্যগণ মালিকদের জমি পুনরুদ্ধার করে আবার তাদের ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। সংঘর্ষে

বহু লোক হতাহত হতে লাগল। বহু সম্পত্তি নষ্ট হতে লাগল। এমনি করে আড়াই বছর কেটে গেল। দিনের বেলা আছে ফৌজের অত্যাচার ও রাতের বেলা হিংসাবাদী দলের উৎপীড়ন। চারিদিকে আতঙ্ক ও বিভীষিকা ছেয়ে গেল। বহু লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। এমন সময়ে হায়দরাবাদে বসল সর্বোদয় সম্মেলন।

বিনোবাজী আগেকার সম্মেলনগুলিতে যোগদান করেন নি। এবারও তিনি যাবেন না বলেই ঠিক করলেন। শরীরও তেমন সুস্থ ছিল না। তা ছাড়া, কাঞ্চন-মুক্তির সাধনায় তিনি তখন ডুবে আছেন। কিন্তু শংকর রাওজী তাঁকে ধরে বসলেন, 'আপনাকে যেতেই হবে। আপনি না গেলে সম্মেলন ক'রে কোন লাভ নেই।' হঠাৎ বিনোবাজী চিন্তামগ্ন হলেন। একটু পরেই বললেন, 'হ্যাঁ, আমি যাবো। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাবো।'

বাপু-কুটিরে প্রণাম করে ৮ই মার্চ (১৯৫১ সাল) রওনা হলেন তিনি হায়দরাবাদ অভিমুখে। ৩১৫ মাইল হেঁটে ৭ই এপ্রিল পৌঁছলেন শিবরামপল্লী গ্রামে। ৮ই এপ্রিল থেকে ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত সম্মেলনের কাজ চলল।

সম্মেলনে কর্মীদের কাছে বিনোবা বললেন, "গঠনকর্ম এখন নতুন পথে পরিচালিত হওয়া দরকার। প্রত্যেক কর্মীকে উৎপাদনমূলক শরীর শ্রম (প্রধানতঃ কৃষি) করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে ও সংস্থাগত ব্যাপারে সর্বত্র অর্থের ব্যবহার বর্জন করতে হবে। শ্রমের ভিত্তিতে সংস্থাগুলোকে স্বাবলম্বী ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে।

কৃষি ছাড়া আরও চার রকমের কাজের কথা তিনি বললেন—

১। শান্তিসেনা সংগঠন।

২। সূত্রাঞ্জলি অর্পণ (প্রতি ঘরে চরখা কিম্বা তকলীর প্রচলন)। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক স্বরূপ নিজের হাতে কাটা এক গুণ্ডি (লাছি) সূতা অর্পণ।

৩। মেথর প্রথার অবসান।

৪। শুদ্ধ ব্যবহার আন্দোলন।

সারা ভারতের কর্মিগণ নতুন প্রেরণা নিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলেন। কিন্তু বিনোবার মনে হায়দরাবাদের হিংসা বিপর্যস্ত এলাকা তেলেঙ্গনার কথা উঁকি মারতে লাগল। তেলেঙ্গনা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিল। অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের কাছে তেলেঙ্গনা ছিল এক প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় আহ্বান। সে আহ্বান উপেক্ষা করলেন না বিনোবাজী। তিনি ঠিক করলেন, তিনি যাবেন তেলেঙ্গনায়। শান্তি ও প্রেমের পথে দেশের ভূমিও ও অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে মুখে অহিংসার কথা বলা তো নিষ্ফল বাচালতা মাত্র।

শান্তির সৈনিক চললেন হিংসা বিধ্বস্ত তেলেঙ্গনার পথে। এই তেলেঙ্গনাই তাঁকে দেখিয়ে দিল মুক্তির পথ।

ভূদান যজ্ঞ

১৫ই এপ্রিল, ১৯৫১ সাল।

হায়দরাবাদ জেলে এলেন বিনোবাজী। হিংসাপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের সেখানে ভিড়। তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের তরফের কথা শুনলেন। তারপরে শুনলেন সাধারণ মানুষের কাছে তেলেঙ্গনার দুঃখ-দুর্দশার কথা। প্রার্থনা সভায় তিনি ঘোষণা করলেন,—

আপনারা জানেন আমি সর্বোদয় সমাজের সেবক। সর্বোদয় বলতে সবাইকে বোঝায়। তাই সাম্যবাদীরাও আমার চিন্তার বাইরে নন।

এবার তিনি চললেন তেলেঙ্গনার পথে। বললেন, হত্যায় কিম্বা অগ্নিকাণ্ডে আমি বিচলিত হইনি। আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হবে কি করে দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠা হবে। পুলিশ দিয়ে সংস্কার-সাধনের আশা করা বৃথা। জঙ্গল থেকে বাঘ তাড়াতে হ'লে পুলিশের দরকার হতে পারে, কিন্তু আমাদের তো মানুষ নিয়েই কারবার করতে হবে। যারা ভুল করেছে বা ভুল পথে গেছে তাদের ঠিক পথ দেখাতে হবে।

নতুন ভাবধারার জন্ম যখন হয় তখন নতুন নতুন অত্যাচার দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করা যায় না। আদর্শ দ্বারাই আদর্শের সঙ্গে লড়াই করতে হয়।

চললেন বিনোবা তেলেঙ্গনার পথে পথে।

বিধ্বস্ত পল্লী গুলো ভেসে উঠতে লাগল চোখের সুমুখে।

মানুষের মুখে অত্যাচার-উৎপীড়নের লাঞ্ছনা আঁকা। চারিদিকে শুধু মূক আর্তনাদ। এমনি ক'রে এসে পৌঁছলেন নলগোণ্ডা জেলার পঞ্চমপল্লীতে।

সকাল নটায় তিনি সারা গ্রামটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন, শুনলেন মানুষের কথা। তাদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল তার চোখের সামনে। এক কুঁড়ে ঘরে ঢুকে দেখলেন, একটি সদ্যজাত শিশু মাদুরের উপর শুয়ে আছে। মা তার পাশে মাটিতে বসে। বিনোবা শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। মা ব'লে উঠলো, আমার বাচ্চা ভারি পয়মন্ত! আপনি কোলে নিলেন।

বিনোবা হাসলেন, স্নেহভরা চোখে তাকালেন শিশুটির দিকে। মার কোলে এবার তাকে সঁপে দিয়ে বললেন—চমৎকার শিশু!

বিনোবা বেরিয়ে আসবেন, এমন সময় মা এসে প্রণাম করল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

বিনোবা এসে দাঁড়ালেন বাইরে। সেখানে ভিড় জমে গেছে তখন। বেশির ভাগই তারা হরিজন। তারা জানালে, দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী। বিনোবা বললেন, দুপুরে আমার কাছে এস।

বিনোবা গ্রাম ঘুরে ফিরে এলেন শিবিরে। একটার সময় এলো দলে দলে চাষী। বেশির ভাগই তারা হরিজন। বিনোবা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—

কি হ'লে আপনারা সুখী হন।

তারা একসঙ্গে বলে উঠল—আমরা চাষী, চাষের জমি পেলেই আমরা বেঁচে যাই।

বিনোবা আবার শুধালেন—কতটা জমি আপনাদের চাই?

কেউ তৈরী ছিল না প্রশ্নটার জন্যে। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়, ফিস্‌ফিসানি ওঠে। শেষে এক বুড়ো বললে, আশী একর হলেই চলবে।

বিনোবাজী আবার প্রশ্ন করলেন, এতেই আপনাদের হবে তো?

তারা উত্তর দিলে, হ্যাঁ, আমরা অন্য কাজও কিছু কিছু করি।

বিনোবা আবার বললেন, আচ্ছা জমি যদি আপনারা পান, মিলে-মিশে চাষ করবেন তো?

তারা তখুনি মাথা নেড়ে সায় দিলে।

তাহলে একখানা দরখাস্ত লিখুন সরকারের নামে। আমি দেখব চেষ্টা করে কিছু করতে পারি কি-না।

বিনোবা ভাবলেন, সরকারকে বলে-কয়ে এদের কিছু জমি পাইয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আবার মনে হ'ল, সরকার যদি জমি না দেন? কিম্বা দিতে যদি দেরী করেন? তার চেয়ে গ্রামের মানুষ কি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারেন না?

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, বিনোবা তাঁদের কাছে আবেদন জানালেন, আচ্ছা, এমন কি কেউ নেই যিনি এই গরীব হরিজন-দের জন্য কিছু জমি ছেড়ে দিতে পারেন?

চারিদিকে নীরবতা।

তারপরেই একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি জমি দেব। আমি একশো একর জমি দান করব। লোকটির নাম শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডি।

জনতা নিস্তব্ধ, বিস্মিত। বিনোবাজীও বিস্মিত। ভাবলেন, একি হ'ল ? মানুষ যেখানে সামান্য এক টুকরো জমি নিয়ে ঝগড়া করে, মারামারি করে—সেখানে চাইবামাত্র একশো একর জমি পাওয়া গেল ! কত একর জমি চাই তাও তো বলিনি। ভগবান বুঝি আমাকে শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডীর হাত দিয়ে ভারতের ভূমি-সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিলেন !

সারারাত ঘুমোতে পারলেন না বিনোবা। ভাবতে লাগলেন এমনি করে কি মিটবে ভূমিহীনের ক্ষুধা। ইতিহাসে তো তার কোন নজীর নেই। কিন্তু বিনোবার অন্তরে অভয় বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল—মা ভৈ ! জমি চাও মানুষের কাছে।

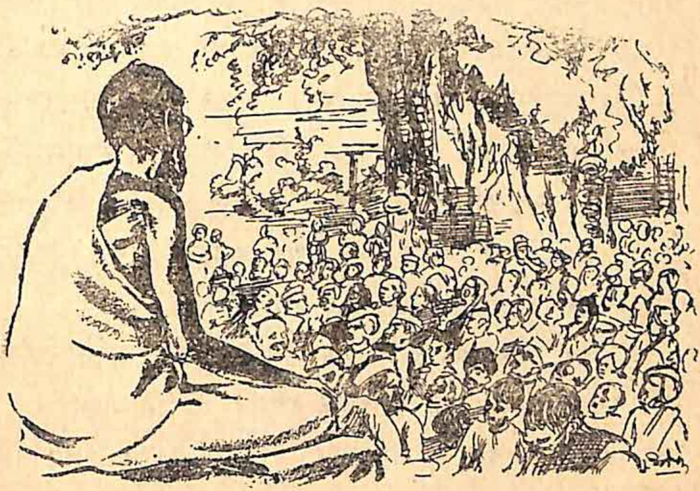
শ্রীরামচন্দ্রই যেন বিনোবাকে অভয় মন্ত্র দিলেন।

এর আগেও তিনি ভাবতেন ভূমি সমস্যার কথা। মেওদের সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিল, জমি চাই। ভূমিহীনদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে ভূমিতে। তিনি পঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতিও আদায় করেছিলেন কিন্তু সরকার সে প্রতি-শ্রুতি রাখেন নি। তখন থেকেই তাঁর ভাবনা—কি করে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া যাবে। তিনি বলেন—

ভাবনা মনে ঘুমিয়ে ছিল। তেলেঙ্গনায় এলো সুযোগ। শুরু হ'ল আর এক আন্দোলন।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৫১ সাল—ভূদান যজ্ঞ প্রথম শুরু হয়ে গেল। পরদিন থেকে প্রত্যেক সভায় তিনি দরিদ্র কৃষকদের জন্যে জমি চাইতে লাগলেন। অত্যন্ত বিনীত ভাবে, অত্যন্ত প্রেমের সঙ্গে তিনি জমি চাইতে লাগলেন। কখনও পরিবারের

ষষ্ঠ পুত্র রূপে ; কখনও জল, বায়ু, আকাশের মত ভূমিতেও যে সকলের সমান অধিকার আছে তা বুঝিয়ে ; আবার কখনও নিজেকে বামনাবতার রূপে উপস্থাপিত করে তিনি জমি চাইতে লাগলেন। আর প্রতিদিনই জমি পেতেও লাগলেন।



ছ-মাস এমনি করে তিনি ঘুরলেন হায়দরাবাদের গ্রামে গ্রামে। বারো হাজার একর জমি মিলল। হিংসার আতঙ্ক কমে গেল, শান্তি ফিরে এল।

২৬শে জুন সেবাগ্রামে ফিরে এসে বাপু-কুটিরে প্রণাম ক'রে বললেন, যে শক্তি এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আজ তা এখানে ফিরিয়ে দিয়ে রিক্ত হয়ে পওনার ফিরে যাচ্ছি।

পওনার ফিরে গিয়ে আবার তিনি মগ্ন হলেন কাঞ্চন-মুক্তির সাধনায়।

ভূমিদানের এই সফলতায় নিন্দুকরা বলতে লাগলেন, তেলেঙ্গনায় সাম্যবাদীদের অত্যাচার হয়েছে বলেই এত জমি পাওয়া গেছে।

বিনোবাজী কথাটা শুনলেন। ভাবলেন, তা তো নয়। সেখানে আমি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করেই জমি আদায় করেছি। আমি তো সেখানে মানবতারই দর্শন পেয়েছিলাম। ওঁরাই কি ঠিক বলছেন—সর্বোদয়ের আগে কি সর্বনাশের প্রয়োজন ?

ভাবনায় বিভোর হয়ে গেলেন বিনোবা। এমন সময় দিল্লী থেকে ডাক এল পণ্ডিত নেহেরুর। জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সুমুখে সর্বোদয়ের বিচার ধারা পেশ করতে হবে। বিনোবা রাজী হলেন। তিনি পায়ে হেঁটে চললেন দিল্লী।

যাচ্ছেন সরকারের ডাকে, কিন্তু নিজের কাজ তো ভুললেন না। পথে যেতে যেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় জমির জন্য আবেদন করতে লাগলেন। এমনি ক'রে যখন দিল্লী পৌঁছলেন, তখন ২ মাসে ১৮ হাজার একর জমি পেয়ে গেলেন। এবার আর নিন্দুকদের জিভ লক্‌লক্ করে উঠল না। অত্যাচারের ভয় তো এখানে নেই, তবু লোকে জমি দিয়েছে, তাও তেলেঙ্গনার চেয়ে ঢের বেশি।

দিল্লী পৌঁছলেন বিনোবা। ৭৯২ মাইল হেঁটে এসে পৌঁছলেন দু' মাসে।

তারিখটা সেদিন ১৩ই নভেম্বর।

দিল্লীতে এসে গান্ধীজীর সমাধি ভূমি রাজঘাটের কাছে এক কুটিরে রইলেন। কুটিরে আসতে লাগলেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী

থেকে শুরু ক'রে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত। এমন কি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা অজয় ঘোষ পর্যন্ত দেখা করতে এলেন।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা আগেই চলেছিল। বিনোবা তাদের বলেছিলেন আপনাদের সংবিধানে আপনারা সকল নাগরিককে কাজ ও খাবার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি আপনারা রাখেন নি। আপনাদের কাঁধে সবাইকে কাজ দেবার দায়িত্ব, আপনারা যদি তা অসম্ভব ব'লে মনে করেন, তাহ'লে পদত্যাগ করুন।

কি নির্ভীক স্পষ্ট বিনোবাজীর উক্তি। তিনি এবার তীব্র আক্রমণ চালাতে লাগলেন।

আপনারা পরিবার পরিকল্পনার নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তান জন্ম কমাও! কিন্তু আপনারা কারা যে এমন কথা বলবেন? আপনারা কি আমাদের চাকর, না মনিব?…

আপনারা কি ভেবে দেখেছেন, জনসংখ্যা কেন বৃদ্ধি পায়? সিংহ জন্ম দেয় কম, কিন্তু ছাগল জন্ম দেয় বেশি।…

আসল সমাধানটা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ নয়, জীবনকে ঠিক পথে পরিচালিত করা।

এবার এলেন তিনি গ্রাম-শিল্পের কথায়—

আপনারা গ্রাম-শিল্পগুলিকে স্বাবলম্বী হতে বলেছেন। আপনারা আমার পা কেটে ফেলে আমাকে দাঁড়াতে বলছেন। গ্রাম-শিল্প নিজে নিজে মরে যায়নি, তাদের পরিকল্পিতভাবে মারা হয়েছে। আপনারা একথা ভাবেন না কেন যে, গান্ধীজী অত

বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও কত কাজ করেছিলেন। এখন তো সহজেই তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করা যায়।

তারপরে খাদ্যের কথায় এলেন বিনোবাজী, বললেন,—আপনারা ১৯৫১ সালে খাদ্যে স্বাবলম্বী হবার শপথ গ্রহণ করে ছিলেন। কিন্তু যখন তা সম্ভব হ'ল না, আপনারা এক পরিকল্পনা কমিশন বসালেন। সেই কমিশন জানালেন, স্বাবলম্বী হওয়া অসম্ভব। ···আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন—যুদ্ধ যদি দেখা দেয়, আপনাদের এ-দেশের কি দশা হবে?

আপনারা ষাট লক্ষ টন খাবার আমদানী করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ···আপনাদের এ পরিকল্পনা তো চির-ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।···এতে কেউ উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপ্রেরণা পেতে পারে না।

বিনোবা কেঁদে ফেললেন সরকার আর কমিশনের এই উদাসীনতায়। গ্রাম-শিল্প, খাদি—দেশের সর্বাঙ্গীন দারিদ্র্য—সব কিছুর প্রতিই সরকার উদাসীন। তিনি আবেদন জানালেন, দেশকে স্বাবলম্বী করুন, তাকে খাদ্য দিন।

জওহরলালজী যদি ব্যক্তিগত-ভাবে এই শপথ গ্রহণ করতেন, তাতে কিছু যেত আসত না। কিন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই শপথ গ্রহণ করেছেন—তাই এ তো জাতিরই শপথ। এখন একমাত্র উপায়, যে-ভাবেই হোক এই প্রতিশ্রুতি পালন করা।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন বিনোবার এসব কথা পূর্ব্বেই জানতে পেরে জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। তারই জন্য তিনি তাঁকে দিল্লীতে ডেকেছিলেন।

এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হ'ল। কমিশন সবাইকে কাজ দেওয়ার কথা স্বীকার ক'রে নিয়ে বললেন, সবাইকে কাজ দেওয়ার নীতি আমরা স্বীকার করি কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। খাদ্য আমদানী বন্ধ করারও নির্দিষ্ট কোন তারিখ দিতে পারলেন না।

বিনোবা দিল্লীতে এগারো দিন রইলেন। তিনি নিজে দিল্লীর যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ—

"১৩ই নভেম্বর দিল্লী পৌঁছলাম। রাজঘাটের সান্নিধ্যে আমার নিবাসস্থান তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে থেকে আমি অপূর্ব শান্তি ও প্রেরণা লাভ করেছি। প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গেও খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। আমার বিচারধারা খুব স্পষ্টভাবেই তাদের কাছে উপস্থিত করেছি। সকলে মনযোগ দিয়ে তা শুনেছেন। আমার বিশ্বাস যোজনা কমিশন আমাদের আলোচনা অনুসারে প্ল্যানিংয়ে যথাসম্ভব পরিবর্তন করবেন। আলোচনা তো তিন দিনেই শেষ হয়েছিল কিন্তু তা হজম করতে আরও ৫।৭ দিন কেটে গেল। আগে থেকেই আমি দিল্লীতে ১১ দিন থাকবার সংকল্প করেছিলাম, ও কয়দিনের দরকারও ছিল। যেদিন আমি পৌঁছলাম সেদিন ছিল গুরু নানকের পুণ্য জন্মদিন। পরের দিন আমরা প্ল্যানিংএর আলোচনার জন্য বসলাম। তো, সেদিনও হলো জওহরলালজীর জন্মদিন; তা ছাড়া অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। বাপুর সমাধিক্ষেত্রের পবিত্র সান্নিধ্য ও এমন পুণ্য সমাগমে রাজঘাটে অনুষ্ঠিত উপাসনা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

"ভোরের প্রার্থনা ঠিক চারটের সময় আরম্ভ হ'ত। তুলসীদাসজীর 'বিনয় পত্রিকা'র অমৃতমধুর ভজন আমি গাইতাম, তাতেই সারাদিনের অবকাশ-শূন্য কার্যক্রমের মধ্যেও আমার বিশ্রাম লাভ হ'ত। সন্ধ্যার প্রার্থনা রাজঘাটের পদ্ধতি অনুসারে প্রকাশ্যভাবেই হত। প্রার্থনার পর

যেমন মনে এসেছে রোজই কিছু কিছু আমি বলেছি। তাতে ভূদান যজ্ঞের বিষয় ও সর্বোদয় বিচারধারা সম্বন্ধে অনেকটা স্পষ্টী-করণ হয়েছে।"

১১ দিন দিল্লীতে কাটিয়ে বিনোবা আশ্রমে না ফিরে উত্তর প্রদেশের কর্মীদের আগ্রহে উত্তর প্রদেশে ভূদান-যজ্ঞের ব্যাপক প্রয়োগ আরম্ভ করলেন। সময়টা ছিল সাধারণ নির্বাচনের সময়, রাজনৈতিক বক্তৃতায় চারদিক সরগরম। তা সত্ত্বেও দলে দলে লোক তাঁর ভাষণ শুনতে আসত। ৬ মাসে ১ লক্ষ একর ভূমিদান পাওয়া গেল।

মথুরার সর্বোদয় কর্মী সম্মেলনে বিনোবা বলেন,—

"যে-অহিংস-পন্থায় আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি তা পৃথিবীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অতুলনীয়। যা-কিছু আমরা পেয়েছি তা আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের বলেই সম্ভবপর হয়েছে। সেই তপস্যা-শক্তিতে বিশ্বাস রেখেই আমি ৫ কোটি একর ভূমিদানের কোটা নির্ধারিত করেছি। যদি আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন করতে চাই তবে আমাদের কাজে বর্তমানের চাইতে ১০০ গুণ ভক্তি, শক্তি ও প্রচেষ্টা লাগাতে হবে। অহিংসা এই বিরাট সমস্যা সমাধানে অসমর্থ হ'লে আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে গান্ধীজীর সমস্ত গঠনকর্মই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর যদি এ আন্দোলন সফল হয় তবে গান্ধী-কর্ম সর্বতোভাবে সাফল্য লাভ করবে। সুতরাং আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসী সমস্ত কর্মীরই সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।"

মথুরা সম্মেলনের পরে কাজের বেগ ও ব্যাপকতা অনেক বেড়ে গেল। বিনোবা সবাইকে বোঝাতে লাগলেন—

"আমরা যদি আগামী ৪।৫ বছরের মধ্যে ভূমি সমস্যার সমাধান ক'রে

নিতে পারি তবে পৃথিবীর নেতৃত্ব আমাদের কাছে আসবে। পৃথিবী আজ শ্রান্ত। অধিকাধিক অস্ত্র নির্মাণের দুষ্ট-চক্রে সে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আবার অহিংসার দ্বারা যে সমাধান হতে পারে এ বিশ্বাসও তা'র নেই। তাই বলি, আমাদের সকল কর্মী এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে তাঁরা যথার্থ কাজই করবেন। জগৎ এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে—পথ প্রদর্শনের জন্য। সুতরাং কর্মীরা যদি অন্য সব কাজ ছেড়ে এই কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন তবে তাঁরা দেখতে পাবেন গান্ধীজীর স্বপ্নকেই তাঁরা সফল করে তুলেছেন। সুতরাং গান্ধীজীর পথে যাঁরা বিশ্বাসী, পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে তাঁদের এ কাজে লেগে যাওয়া উচিত।

"এ কাজ উত্তম, কেবল উত্তমই নয়, মৌলিকও বটে। আবার কেবল মৌলিকই নয় সাময়িকও বটে, আর কেবল সাময়িকও নয়, বিপ্লব সৃষ্টিকারী।"

বিনোবার এর পরের জীবন ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলনেরই জীবন। তা এত ব্যাপক, এত গভীর ও এমনই অভিনব যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ক্রমাগত তিনি এগিয়ে চলেছেন, সারা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

বিনোবার জীবন বন্যার মত ছুটে চলতে লাগল দুর্বার গতিতে। সে বন্যায় ভেসে চলেছেন ভারতের রাজা-মহারাজার দল, জমিদার-জোতদারের দল, শিল্পপতি পুঁজিপতির দল, রাজনীতিবিদ্ ও অর্থনীতিবিদের দল।

এই প্লাবন মহাপ্লাবন, এরই নাম বিপ্লব। এই মহান বিপ্লবে নূতন ভারতের অভ্যুত্থান হবে। বিনোবা সেই অভ্যুত্থান ঘটাবার জন্য সারাজীবন তপস্যা ক'রে শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ হয়েছেন।

বিনোবা আজ জগতের কাছে এক মহাবিস্ময়। ভারতের জনগণের কাছে তিনি শুক-যাজ্ঞবল্ক ও শংকরাচার্যের পরম্পরা। গঠনকর্মীদের কাছে তিনি শুধু গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীই নন, তিনি তাঁর সর্ব কর্মের উত্তর অধিকারী।

পদযাত্রায়

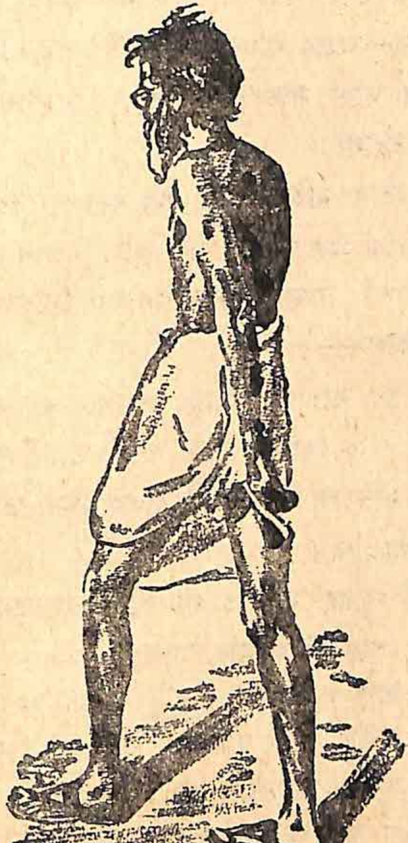
পুরাকালে রাজা মহারাজারা করতেন রাজসূয় যজ্ঞ। কিন্তু বিনোবা শুরু করলেন প্রজাসূয় যজ্ঞ। রাজার অভিষেক নয়, হবে প্রজার, জনতার অভিষেক।

ভারতে পাঁচ লক্ষ গ্রাম। তাঁর পণ হ'ল প্রথম কিস্তি স্বরূপ দু' বছরের মধ্যে অন্তত এই পাঁচ লক্ষ গ্রাম থেকে ২৫ লক্ষ একর জমি চাই। এই পাঁচ লক্ষ গ্রামের প্রতি গ্রামে বসাতে হবে অন্ততঃ একটি পরিবার—পাঁচ একর জমি দিয়ে। বিনোবা নিজেকে উৎসর্গ করলেন এই কাজে।

তেলেঙ্গনার পদযাত্রায় প্রতিদিন তিনি পেয়েছেন ২০০ একর জমি, দিল্লীর পথে পেয়েছেন প্রতিদিন ৩০০ একর, উত্তর প্রদেশে সেবাপুরী সম্মেলন হবার আগে পেয়েছেন ৫০০ একর, সম্মেলনের পর সেটা বেড়ে হয়েছে প্রতিদিন ১০০০ একর।

যেখানেই যান, জমি পান, মানুষ তাঁকে বঞ্চিত করে না, বঞ্চিত করে না দরিদ্র-নারায়ণকে। এমনি ক'রে মীরাট, শাহারানপুর, দেরাদুন, বিজনোর উত্তর প্রদেশের কোথায় না ঘোরা হ'ল। এরই মধ্যে এক সাইকেলযাত্রীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে পা জখম হ'ল। কিন্তু তবু কি বিরাম আছে যাত্রীর! তিনি সেই

জখমি পা নিয়েই রোজ চলতে লাগলেন। চলা যখন একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন সাথীরা তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে বয়ে নিয়ে চললেন। তবুও পদযাত্রা থামলো না।



উত্তর প্রদেশ সফর শেষ, এবার এলেন বিহারে। ঘোষণা

করলেন উদাত্ত কণ্ঠে—ভূমি-সমস্যার সমাধান না ক'রে আর আশ্রমে ফিরব না।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

গান্ধীজীর সেই পরম বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল আবার। পণ হ'ল তাঁর—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

কর্মীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, এক নতুন প্রেরণায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো।

গণতন্ত্র তার মহিমা নিয়ে শুধু সমাজবাদের বুলি কপচাতে লাগল, এদিকে প্রকৃত সাম্যযোগী তুলে নিলেন দরিদ্র নারায়ণের জাগরণের ভার। কিন্তু এমন মহান ভার নিয়েও তিনি তৃণাদপি সুনীচ। বললেন—

ভূমি-সমস্যা সারা দুনিয়ায় একভাবে না একভাবে সমাধান হতে বাধ্য। কতখানি জমি পাব তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনে। মানুষের মনের গভীরে এই যথার্থ ভাবনাই তো তার শিকড় চালিয়ে দেয়।

তিনি বিহারের মাটিতে পা দিয়েই বললেন—

তীর্থযাত্রী যায় তীর্থযাত্রায় ভগবান দর্শনে। আমিও তেমনি ভূদানযাত্রায় চলেছি। আমি এসেছি আপনাদের নিয়ে ভালবাসার ভিত্তিতে এক বিপ্লব সাধন করতে। আমি চাই বিহারের ভূমি সমস্যা আমার বিহার অবস্থান কালেই সমাধান হোক।...

...কিন্তু এর জন্য দরকার অহিংস পদ্ধতি। যদি প্রেম ও শান্তি দিয়ে ভূমি সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহলে সে তো অহিংস-নীতিরই জয় হবে। অহিংস নীতি যদি এই অর্থনীতিক বিপ্লব ঘটাতে পারে, তাহলে কি-না পারবে? অহিংসার প্রতি আমি পূর্ণ আস্থা পোষণ করি।

১৯৫২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর বিহার প্রবেশ হয়। ২৩শে অক্টোবর ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন পাটনায়। পাটনা থেকে ১৩ই ডিসেম্বর ঘুরতে ঘুরতে এলেন মানভূম জেলায়। এখানে এসে তি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু ওষুধ তিনি কিছুতেই গ্রহণ করবেন না। অবশেষে রাষ্ট্রপতি, প্রধান-মন্ত্রী সকলেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ছুটে এলেন। জনসাধারণও রুদ্ধ নিশ্বাসে লক্ষ্য করতে লাগল—কি হয় কি হয়। সকলের আগ্রহে তিনি ওষুধ গ্রহণ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে উঠলেন।

এখানে চাণ্ডিলে সর্বোদয় সমাজের বার্ষিক সম্মেলন বসলো। এইখানেই বিখ্যাত নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ভূদান-যজ্ঞের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করেন।

চাণ্ডিল সম্মেলনে বিনোবা এক অপূর্ব ভাষণ দিলেন, সে ভাষণ 'সর্বোদয়ের ইস্তাহার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলো।

তিনি বললেন স্বতন্ত্র জনশক্তির কথা। এই শক্তি হিংসা শক্তি, দণ্ডশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে বড়। সর্বোদয়ের লক্ষ্য তো দয়া দেখানোই শুধু নয়, দয়ার রাজ্য পত্তন করা। তাই তো চাই জনশক্তির সৃষ্টি। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব? উপায় বাতলিয়ে দিলেন তিনি।

প্রথমে বিচার শাসন। মানুষকে তাঁদের বিবেকের অধীনে আনতে হবে। তারা নিজেরা ভেবে সব কিছু করবে। দ্বিতীয় কর্তৃত্ব বিভাজন। মানুষের মধ্যে বিলি করে দিতে হবে কাজের কর্তৃত্ব। তাহ'লে আর স্বৈরাচারী আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হবে

না। এমনি করেই ভারতের গ্রামগুলি হয়ে উঠবে এক একটি গ্রামরাজ্য।

বিনোবা সম্মেলন শেষ করে চললেন পদযাত্রায়, ভূমিদানের সঙ্গে আর একটি যজ্ঞ জুড়ে দিলেন। এটি শ্রমদান যজ্ঞ নিজে কঠিন জমিতে কাজ শুরু করে দিলেন। সবাই এসে যোগ দিলে, সবার মুখে গান—

ভাই কোদাল চালাতে চল,
মাটিকে সোনা বানাতে চল!

এবার এলেন তিনি বৈদ্যনাথধামে। বৈদ্যনাথধাম হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থ, পাণ্ডারা এসে ধরলেন, বিনোবাজীকে মন্দিরে যেতে হবে ঠাকুর দর্শনে।

বিনোবা বললেন, হরিজনরা যদি দেবতা দর্শন করতে পায়, তাহ'লেই আমি মন্দিরে যাব, নচেৎ নয়।

পাণ্ডারা রাজী হলেন।

কিন্তু যখন তিনি হরিজন সাথীদের নিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, অমনি এল বাধা। কিছুসংখ্যক পাণ্ডা বিনোবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সামান্য আঘাত পেলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গের দুজন কর্মী লাঠির ঘায়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁদের হাঁসপাতালে পাঠানো হ'ল।

বিনোবা পরের দিন ভাগলপুর জেলায় এলেন। তিনি এক বিবৃতিতে সারা ভারতের মানুষকে জানিয়ে দিলেন, পাণ্ডারা যা করেছে তা তাদের অজ্ঞতা-প্রসূত, তিনি তাদের শাস্তি চান না। তাঁর মনে শুধু আনন্দ, তাঁর সাথীরা ছিলেন শান্ত।

তাঁদের মনে আততায়ীর প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হয়নি।··· কিন্তু এর প্রতিকার চাই। * * *

এমনিভাবে চলল পদযাত্রা, বিহার পরিক্রমা একদিন শেষ হ'ল। কিন্তু পদযাত্রার শেষ কোথায়······

সারা ভারত পড়ে আছে। আছে লক্ষ লক্ষ গ্রাম। সেখানে যেতে হবে। ভূমিহীন মানুষকে দিতে হবে ভূমি—সমাধান করতে হবে এই বিরাট সমস্যার। তাই তো পদধ্বনি বেজে উঠছে দরিদ্রনারায়ণের একনিষ্ঠ সেবাব্রতীর, তাইতো তাঁর এই পদযাত্রা—অভিযাত্রা।

ফরাসী কবি ও সত্যাগ্রহী ল্যাঞ্জা দেলভাস্তো—ভারতীয় নাম নিয়েছেন শান্তি দাস (Servant of peace)। তাঁরই রোজনামচা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা হ'ল সেই অভিযাত্রার কাহিনী—

তিনটে বাজল। ঘণ্টা পড়ল প্রার্থনার।

প্রার্থনা করলাম সবাই মিলে।

এবার যাত্রা শুরু হবে। পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে নিয়ে তৈরী। নির্দেশ না দিয়েই শুরু হবে যাত্রা। বিনোবাজী চলবেন এগিয়ে, অভিযাত্রার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে—আর পিছনে যে পড়ে থাকবে তার জন্যে তো নেই তাঁর ভাবনা।

যাত্রারম্ভের ক্ষণ এসে গেল। এগিয়ে চললেন তিনি। দু'জন সঙ্গী দুটো হ্যারিকেনের আলো নিয়ে চলেছে আগে আগে।

বিনোবার হাঁটু-কাপড় পরনে, পায়ে কাপড়ের জুতো, গায়ে মাথায় চাদর জড়ানো। দ্রুত পায়ে চলেছেন। পিছনে আমরা।

ঊষার উদয় অবধি নিঃশব্দে চলেছে সবাই।

পথ হারিয়ে ফেলছে, আবার পথ খোঁজা শুরু হ'ল লণ্ঠনের আলোয়! আবছা কালো প্রান্তর আশেপাশে।

বিনোবাজী আমাদের 'বাবাজী'। তিনি অন্ধকারে আমাদের ডেকে ডেকে বললেন,—

উপরে চেয়ে দেখ নক্ষত্রের রাশি, আর ভাব আমাদের এই রাত্রি যাত্রার কথা! দেখ, দেখ, যারা কাজ করে, অথচ বেতন চায় না, ভগবান তাদের জন্য কি পুরস্কার রেখেছেন! আমরা তো আমাদের বেতন আগেই পেয়ে গেছি।

আমাদের আলো দেখে গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। চাষীরা ছুটে আসে। ঢাকের বাদ্যি বাজে। বিনোবাজী তাদের চুপ করে বসতে বলেন, তারপর কিছু বলেন।

তারপরে ঊষার উদয় হয়। এবার বিরতি। আমরা পথে বসে পড়ি। বিনোবা এগিয়ে যান মাঠের ভিতর দিয়ে ঊষার আবাহনে। তিনি দিগন্তের ঐ রক্তিমসূর্যের প্রথম আভাসকে উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে বন্দনা করেন।

সত্যেন লভ্যস্ তপসাহ্যেষঃ আত্মা
সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি ঋষয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্
সত্যেন পন্থাঃ বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্তি ঋষয়ো হ্যাপ্তকামাঃ
যত্র তৎ সত্যস্থ পরমং নিধানম্ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

তারপরে প্রাতঃকালের আহার—জল আর মধু। আবার যাত্রা।

সূর্য উঠে আসে আকাশে। গ্রামে গ্রামে পথের পাশে জনতা। চাষীরা এসেছে। এসেছে মধ্যবিত্ত, ধনী, জোতদার। তারই মধ্য দিয়ে তিনি চলতে থাকেন।

চারিদিকে জয়ধ্বনি— জয় জগৎ! সন্ত বিনোবা অমর হো!

তারপরে চলতে-চলতে আমরা এসে পৌঁছই গন্তব্য স্থানে। সেখানে তোরণ গড়া হয়েছে। ফুল দিয়ে সব সাজানো—লেখা রয়েছে 'স্বাগতম্'।

তোরণ দিয়ে ঢুকেই গ্রামের স্কুলবাড়ি কি কোনো মন্দিরের সংলগ্ন ধর্মশালা।

সেখানে টেবিল কিম্বা চৌকি পাতা হয়, বিনোবাজী বসেন।

এবার সবাই এসে ঘিরে বসে। বিনোবাজী বসেন মাঝখানে। বিনোবাজী দশ কি বিশ মিনিট কিছু বলেন।

তাঁর বক্তৃতা সহজ-সরল। তিনি পুরাণ থেকে উদাহরণ দেন, মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত থেকে গল্প বলেন। আর উদাহরণ দেন চাষীদের নিত্যকার জীবনযাত্রা থেকে। তাঁর কথা সবাই বুঝতে পারে।

বিহার পরিক্রমা চলল। এখান থেকে চাই ৩২ লক্ষ একর জমি। না পেলে তিনি নড়বেন না। এ যে গৌতম বুদ্ধ আর মহাবীরের পবিত্র জন্মভূমি!

আমরা তাঁর সাথী। এ এক পাঁচ-মিশেলী দল, কেরাণী আছে, ইস্কুলের ছেলেমেয়ে আছে, তরুণী আছেন, ছোট ছোট

ছেলেমেয়েরাও আছে। জমিদার-জোতদারেরও অভাব নেই। যত চলি, তত নতুন মুখ দেখা দেয়। আবার পুরানো মুখদেরও আর সবাইকে দেখিনে। সবাই সাথী, কিন্তু একেবারে সবসময়ের সাথী তিনজন। প্রথম নিমাই ভাই। তাঁর খাবার তৈরী করে দেয় সে। বিনোবা আগে নিজে স্বপাকে খেতেন, এখন আর পারেন না ব'লে এই সেবা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়টি আদিবাসী ছেলে। কালো কয়লার মতো তার চোখ। রাতে বিনোবাজীর দোর গোড়ায় সে ঘুমোয়। তারপরে আছে কুসুম। বিনোবাজীর বক্তৃতার ও কাজকর্মের টোক্ রাখে মেয়েটি। কাগজে-কাগজে বিবরণী পাঠায়। দেওঘরে ওর ওপরেই হয়েছিল পাণ্ডাদের সবচেয়ে বেশী অত্যাচার।

আমরা যাত্রাপথে চলি, চলতে চলতে হয় নানা ধরণের আলোচনা।

একদিন আমার সঙ্গে ফরাসী সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেন। ভিক্টর হুগোর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। হুগো মহান্। তিনি ছিলেন দুঃখীর দুঃখের ভাগীদার। আবার কোনোদিন বা সঙ্গীতের কথা ওঠে, আধুনিক সঙ্গীত তিনি ভালবাসেন না, তিনি চিরায়ত সঙ্গীতের ভক্ত।

কত লোকের সঙ্গে দেখা হয় প্রতিদিন, কতরকমের মানুষ আসে তাঁর কাছে। একদিন একজন লোক এসে বললে, দেখুন, আমার একশো একর জমি আছে, আমি সেই একশো একর জমির সঙ্গে নিজেকেও উৎসর্গ করতে চাই।

বিনোবা বললেন, বেশ তো! কিন্তু আপনি কি বিবাহিত?

—হ্যাঁ।

—আপনার স্ত্রীর মত আছে ?

—তাঁকেও এনেছি। আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি নিজেই বলবেন।

—আপনি রাজী তো ? স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন বিনোবা।

—কেন হব না ? আমিও সেবা করব।

—আপনাদের ছেলেমেয়ে আছে ?

—হ্যাঁ, চারটি। উত্তর এল।

—তাহ'লে আমি পাঁচ ভাগের এক ভাগ নেব, বাকিটা আপনাদের ছেলেমেয়েদের জন্য ছেড়ে দিলাম। তারপর হেসে বললেন, দেখলেন তো, আমি যা নিই, তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে দিই।

তাঁরা দুজনেই ব'লে উঠল—হাঁ, বাবা, ঢের ঢের বেশি !

তিনি এ-গল্প তারপরে বহুবার করেছেন, বলেন এমন ঘটনায় তো কান্না পায়।

আর একজন অনেক জমি দান ক'রে নালিশ করতে এল। তার নামটা ছড়িয়ে পড়েনি, এমন কি কাগজেও ওঠেনি। সে দাবি জানালে, সে এই দানপত্র ফিরিয়ে নেবে।

বিনোবা বললেন, আপনার জন্য সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। আপনি যা আইন সঙ্গত ভাবে দান করেছেন, তা আইন-সঙ্গত ভাবেই ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব।

তারপর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—

দেখ, দেখ, মানুষ যা দেয়, তা কি করে হারায়। তারপরে

আবার লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার জন্যে সত্যি আমার দুঃখ হচ্ছে···

লোকটি জমি ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি ছেড়ে প্রণাম ক'রে চলে গেল।

একজন কমিউনিষ্ট এলেন একদিন, বললেন—

আপনার উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু উপায়টি একেবারে হাস্যকর। হিংসা ছাড়া কি করে এতবড় পরিবর্তন করবেন ?

বিনোবা বললেন, ভাই, বলুন তো, যেদিন আপনি কমিউনিষ্ট হলেন, সেদিন কি আপনার মহাপরিবর্তন হয়নি ?

—হ্যাঁ, সেদিন থেকে সবকিছুই বদলে গেছে।

কিন্তু আপনি কি স্বেচ্ছায় কমিউনিষ্ট হয়েছেন, না, কেউ জোর করে বন্দুক উঁচিয়ে শাসিয়ে আপনাকে পার্টিতে যোগ দিতে বলেছে ?

কি যে বলেন ! আমি মার্কস্ পড়েছি, তাঁর কথায় পেয়েছি সত্য, তাইতো আমি সাম্যবাদী হয়েছি।

মার্কস্ আপনার কাছে যা পেয়েছেন, আপনি সেটা কি ক'রে অসম্ভব ভেবে নিলেন ?

ভিড়ে একবার তিনি একটি শিশুকে প্রশ্ন করলেন,

তোমার ক'খানি মুখ ?

—একটা মুখ।

—ক'টি চোখ ?

—দুটি।

—আর সবার ক'টি চোখ ?

—আমারই মতো দু'টি।

—হাত ক'খানি?

—দুখানি।

—ক'টি নাক?

—একটি।

—আর সবার?

—আমার মতোই একটি।

তুমি কি কখনো দু'টো নাক আর তিনটে মুখওয়ালা মানুষ দেখেছ, আবার মোটে নাক বা মুখ নেই—এমন মানুষও কি দেখেছ?

—না।

তাহলে বল তো, কারো ভাগে হাজার একর জমি, কারো ভাগে বা একেবারে কিছুই নেই—এটা কেমন ব্যাপার?

জনতা বুঝতে পারল প্রশ্নোত্তর ছলে তিনি বুঝিয়ে দিলেন ভূমি সমস্যার মূল কথা।

বিনোবা এমনি করে বোঝান মানুষকে, আবার তাঁর বাণীও সহজ। দৃষ্টান্তও সহজ।

তিনি বলেন, জণগণের ইচ্ছাশক্তির মূল্য এক—(১)
রাষ্ট্রের শক্তি সেখানে শূন্য— (০)
দু'য়ে মিলে হ'ল দশ— (১০)
এই যে দশ হ'ল, এ কি এক এর জন্য, না শূন্যের জন্য?
গণিতবিদ্গণ তার মীমাংসা করুন।

এটা ঠিক যে, পরস্পরের সাহায্য ছাড়া ঐ দুটি সংখ্যার মূল্য খুব সামান্যই।

আমাদের প্রথম কাজ গ্রাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা। মামলা-মোকদ্দমা ঝগড়া-ঝাটি গ্রামেই বিচার-নিষ্পত্তি করা।

তারপরে আসবে রামরাজ্য। তখন আর মামলা, ঝগড়া কিছুই থাকবে না—আমরা এক পরিবার হয়ে বাস করব।

এমনি বাণী আর কাহিনী শুনি, দেখি বিচিত্র মানুষের মেলা। এমনি ক'রেই কেটে যায় দিন।

এরই মধ্যে এল হোলী উৎসব। বিনোবা বললেন হোলীর কথা—

আজ উৎসবের দিন। আমরা আজ পৃথিবীর সব চেয়ে মহান্ বিজয়ের উৎসব করছি—শংকর কামকে পরাজিত করেছিলেন। তপস্বী শিবকে প্রলুব্ধ করতে এসেছিল কাম কিন্তু শিবের তৃতীয় নয়নের বিদ্যুৎ বহ্নিতে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল।

আমরা যে আলো জ্বালাই উৎসবে, সে তো আমাদের পাপ প্রবৃত্তিকে ভস্মীভূত করবার জন্যেই। ছাই হয়ে যায় আমাদের গর্ব। এস আমরা ঈর্ষা-দ্বেষ উচ্চাকাংক্ষা, অহঙ্কার ভস্মীভূত ক'রে ফেলি।

একদিন পদযাত্রায় আমরা এক ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে এলাম। এখানে জড়ো হলেন জেলার বড় বড় জমিদারের দল। তাঁরা বললেন, আপনি জমি চাইতে এসেছেন। কিন্তু বড় দেরী ক'রে এলেন! সরকার এর মধ্যেই সব জমি কেড়ে নিয়েছেন। সরকার খাস করে নিয়েছেন জমি, আর সে জমিকে নষ্ট ক'রে ফেলছেন। যাহোক, আমরা ধ্বংস হচ্ছি, কিন্তু মন্ত্রীরা তো আমেরিকার তৈরী

মোটর কিনতে পারছেন, সব টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে।

বিদেশে সব না যাক্, গ্রামে তো কিছুই থাকছে না।

বিনোবা বললেন, আপনাদের অভিযোগের ভিত্তি আছে বই কি। আপনারা যে চোখে দেখেন, আমিও তার চেয়ে এসব ভাল চোখে দেখিনে। কিন্তু তবু আপনাদের কাছেই ভিক্ষের জন্য হাত পেতেছি। আপনারা অনেক হারিয়েছেন কিন্তু তার কারণ তো আপনাদের অনেক ছিল। তাছাড়া ওরা এতটা কেড়ে নেয়নি যাতে আপনাদের এখন দেবার মতো কিছুই নেই।

মুসলমানগণ বলেন, যদি নিজের দশায় দুঃখ হয় ত স্বর্গের দিকে তাকাও, আর যদি আনন্দ হয় তো তাকাও, নরকের দিকে। আমার দৃষ্টি সর্বহারাদের দিকে, তাই আপনাদের দশা দেখে কখনো হৃদয়ে করুণা জাগাতে পারিনে। মনে রাখবেন, আপনারা বুদ্ধের জন্মভূমির সন্তান। আপনারা জানেন, তিনি ছিলেন রাজা, তিনি সবকিছু ছেড়ে ভিক্ষাপাত্র সম্বল করেছিলেন।

কিন্তু আপনাদের হাতে তো ভিক্ষাপাত্র দেখছিনে।

আপনাদের যতক্ষণ কিছু আছে, ততক্ষণ যাদের কিছু নেই তাদের তার ভাগ দিতে হবে। সবকিছু যদি আপনাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়—তাহলেও আপনারা খুসি থাকবেন। আপনারা অভিজাত, শিক্ষিত, আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না!

সবাই শুনে বললেন, আপনি কেবল গরীবের মুক্তিদাতা নন, আপনি আমাদেরও মুক্তিদাতা।

নঈ তালীমী শিক্ষা, বিনোবাজী এ-বিষয়েও একজন পরম অভিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনিই এ-শিক্ষা প্রবর্তকদের একজন। কোন নঈ তালীম বিদ্যালয়ে গেলেই তিনি জিজ্ঞেস করেন প্রধান শিক্ষককে,

—আপনার বেতন কত?

উত্তর আসে,—দুশো টাকা।

—আর-আর মাস্টারদের মাইনে কত?

—একশো টাকা।

—বেয়ারাদের মাইনে কত?

—চল্লিশ টাকা।

—আপনার ছেলেমেয়ে কোথায় পড়ে?

—শহরের ইস্কুলে।

—স্ত্রী?

—তিনি সংসার দেখেন।

এটা তাহলে আপনার বুনিয়াদী শিক্ষার কেমন ভিত্তি? গান্ধীবাদের যা-কিছু সবেরই ভিত্তি স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ, কিন্তু আপনার ইস্কুলে তো সাম্যবাদ দেখলাম না।

আপনাদের মাইনে হওয়া উচিত এক ফালি জমি, তাতে থাকবে একটি কূপ। এই নিয়ে আপনার সহযোগীদের সঙ্গে আপনি কাজ করবেন। তাতে যা ফসল ফলবে তাই দিয়ে সবাই খরচ চালাবেন।

শুনে অধোবদন হলেন প্রধান শিক্ষক মশাই।

এমনি ক'রে আমরা এলাম রামগড়ে। সেখানকার রাজা

দান করলেন চার লক্ষ একর জমি। এক বিহারেই পাওয়া গেল ২৬ লক্ষ একর জমি।

বিনোবা বিহারেই সর্বোদয় বিশ্ব বিদ্যালয় গড়বেন এই তাঁর ইচ্ছে। তার জন্যে বুদ্ধগয়ায় জমি নিয়েছেন—বোধিবৃক্ষ থেকে সে জমি বেশী দূরে নয়।

কিন্তু যাঁর উপরে সব ভার, তিনি বেশিদূর এগুতে পারেননি। একদিন একজন লোক বিনোবাকে প্রশ্ন করলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কেমন হবে—কি তার আদর্শ? বিনোবা উত্তর দিলেন—

জমি আছে। আমি একটি কূপ খনন করিয়েছি। পথিক এসে এখান থেকে বালতিতে ক'রে জল তুলে তৃপ্তিভরে পান করতে পাবে।

কিন্তু লোকটি খুশি হ'লেন না, এ-উত্তরে। বললেন, কিন্তু তার আদর্শ কি হবে—কি হবে নিয়ম কানুন আর পাঠ্য সূচী?

—বলেছি তো জমি আছে, কূপ আছে, যার ইচ্ছে পান করবে। এই-ই তো আসল কথা। আর বেশি কি চান?

এমনি ক'রে বিহার পরিক্রমা শেষ হ'ল। এবার আমার বিদায় নেবার পালা। আমি বললাম—'এ আমার বড় লজ্জা, আপনার কাছ থেকে এত নিলাম অথচ প্রতিদানে কতটুকু দিলাম!' তিনি উদার পুরুষ, বললেন—'না, না, মোটেই তা নয়। আপনি তো এ কাজে আপনার হৃদয়ই দান করেছেন। আমরা তা অনুভব করেছি।'

প্রেম-যাত্রা

(বাঁকুড়ায়)

পদযাত্রায় চলেছেন বিনোবাজী।

বিহার থেকে উড়িষ্যায় যাবেন।

পথে বাংলা।

এই সেই বাংলা, যে-বাংলা একদিন তরুণ বিনায়ককে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল, যে-বাংলা তাঁকে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা দিয়েছিল। এই সেই দৃষ্টির নেতা, সৃষ্টির নেতা বাঙালীর বাংলাদেশ।

১লা জানুয়ারী। ১৯৫৫ সালের দুয়ার খুলেছে। বাংলার মাটিতে এসে তিনি পদার্পণ করলেন। যে বাংলায় আসার সাধ ছিল তাঁর প্রথম যৌবনের স্বপ্ন। আজ সুদীর্ঘ সেবাময়, তপস্যা-ক্লিস্ট জীবন অতিক্রম করে সত্যসন্ধ যুগ-পুরুষের বেশে তিনি এসে স্পর্শ করলেন বাংলার মাটি!

কি দিয়ে আমরা তাঁর অভ্যর্থনা করব? কোন্ আসনে আমরা তাঁকে বসাবো! বড় বড় তোরণ করে? স্তূপীকৃত ফুলের মালা দিয়ে? না, ভুরি ভুরি মিঠাই-মণ্ডা এনে? তিনি তো অকিঞ্চন। এ সব কোন কিছুরই যে প্রয়োজন নেই তাঁর।

তিনি এসেছেন দরিদ্র নারায়ণের প্রতিনিধিরূপে, দরিদ্র জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। প্রেমের ভিক্ষারী তিনি, দরিদ্র জনগণের প্রেমের ঠাকুর রূপে তিনি এসেছেন আমাদের দ্বারে। বলছেন, 'ওগো তোমাদের ঘরে যদি পাঁচটি ছেলে থাকে,

আমাকে (দরিদ্র নারায়ণকে) তোমাদের ষষ্ঠ সন্তান মনে ক'রে আমার অংশ আমাকে দাও।'

বাংলাদেশের এই ভূদান-যাত্রা তাঁর কাছে প্রেম-যাত্রা হয়ে উঠেছিল। তার স্মৃতি তাঁর কাছে মধু হয়ে আছে, তাই তিনি এর নাম দিয়েছেন প্রেম-যাত্রা। তিনি বলেছেন—

বংগাল মেঁ মেরী ভূদান-যাত্‌রা থোড়ে হী দিন চলী। পর উস্‌কা বহুত মধুর স্‌মরণ মেরে পাস রহ্‌ গয়া হৈ। মৈঁনে উস্‌ যাত্‌রা কো প্‌রেম যাত্‌রা হী নাম দিয়া থা।

বাংলায় আমার ভূদান-যাত্রা মাত্র অল্প কয়েকদিন চলেছিল কিন্তু তার অতি মধুর স্মৃতি আমার মনে রয়ে গেছে। আমি ঐ যাত্রাকে প্রেম-যাত্রা নাম দিয়েছিলাম।

বহুদিন থেকেই কর্মীরা চেয়েছেন, তিনি বাংলায় আসুন। বিহারে দু'বছরে ২৬ লক্ষ একর জমি দান হিসাবে মিলেছে, কিন্তু বাংলায় সে তুলনায় খুব কম জমি পাওয়া গেছে। বিনোবা তাতে হতাশ হন নি। তিনি বলেছেন, বাঙালী হিসেব খতিয়ে কাজ করে না। বাঙালী কাজ করে ভাবাবেগে। ভূদানের ভাবধারা বাংলার জনসাধারণ একবার বুঝে নিলে একদিনেই একাজ হয়ে যাবে।

কর্মীরা বলেছেন, কলকাতা-ই বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। কাজেই কলকাতায়ই থেকে পদযাত্রা হওয়া উচিত সবার আগে।

বিনোবাজী উত্তর দিয়েছেন, দূর থেকেই চলছে কলকাতার উপর আমার আক্রমণ। একটি জেলার গ্রামকে-গ্রাম যখন দান হিসাবে পাওয়া যেতে থাকবে তখন কলকাতার মানুষ ভাবতে

আরম্ভ করবে। এই জন্যই তো আমার কর্মক্ষেত্র কলকাতা নয়, গ্রাম।

তাই কলকাতায় গেলেন না বিনোবাজী। আগে গ্রাম, তার পরে তো শহর। ভূদান আন্দোলনে গ্রাম হবে অগ্রগামী, শহর হবে অনুগামী।

অসংখ্য গ্রামবাসীর অভিনন্দন ও পুষ্প-চন্দন-আলিম্পনের মধ্য দিয়ে প্রেমযাত্রা শুরু হয়ে গেল।

শালতোড়া গ্রামে তিনি গ্রামবাসীদের বললেন,—ভারতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন প্রথমে হয়েছিল বাংলাদেশে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ জয়লাভ করে এবং বাংলা-দেশের মালিক হয়। দেশ গোলাম হয়ে গেলে সেখানকার লোকেরা কি করে? হয় নিস্তেজ হয়ে পড়ে, নয় তো অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বিদ্রোহ করে। কিন্তু বাংলার শ্রেষ্ঠপুরুষেরা কি করলেন? তাঁরা ধর্ম-সংস্কারে, সমাজ-সংস্কারে মন দিলেন।

রাজা রামমোহন আমাদের শিক্ষা দিলেন যে, ধর্ম ও বিচার সংশোধিত হ'লে স্বরাজ আপনিই ফিরে আসবে।

পরাধীনতার পর তাঁরা ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে মন দিলেন। এমন দ্বিতীয় উদাহরণ আর কোথাও আছে ব'লে আমার জানা নেই।

বাংলায় পদার্পণ করে বাঙালীকে এমনি করেই অভিনন্দন জানালেন বিনোবাজী।

তিনি ভূ-দানের কথায় বললেন, ভূদান তো শুধু ভূমি-দান নয়, এ যে প্রেম-দান। তাঁর প্রেম হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করুক

বাঙালী এই তিনি চান। শুধু প্রেমই তিনি চান, আর কিছু নয়। যদি ভূদানে প্রেম থাকে, যদি সম্পত্তিদানে প্রেম থাকে, তাহলে তাই বাঙালী দিক্। আর যদি প্রেমহীন হয় সে দান, তিনি তা চান না। শুধু প্রেমদানই তিনি চান।

শালতোড়া থেকে পাবড়ায় এলেন দোসরা জানুয়ারী। গ্রামটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। গ্রামের দারিদ্র্য দেখে দুঃখ পেলেন। গ্রামের হরিজন যাঁরা, তাঁদের নিজেদের জমি নেই। এমন কি বসতের ঘরটিও নিজেদের নয়। জমির মালিক ঘর করার জমি দিয়ে বেগার খাটায়।

মনে গভীর বেদনা, গ্রাম দেখে ফিরে ঘণ্টাখানেক তিনি সূতো কাটলেন। মন শান্ত হ'ল না। বেড়াতে গেলেন পাহাড়ের দিকে। মন কিছুটা শান্ত হ'ল। কিন্তু বক্তৃতার সময়ে ঝরে পড়ল সেই বেদনা।

গরীবদের আমরা শোষণ করছি, আর প্রতিদিন তাদের অভিশাপ কুড়াচ্ছি।

... মালিক যদি একটু ভাবতেন, তা'হলে প্রেমের সঙ্গেই ঐ জমিটুকু গরীবদের দান ক'রে দিতেন। বলতেন, আমার উপর আপনাদের যদি প্রেম থাকে, তবে আমাকেও আপনারা সাহায্য করতে আসবেন। আমি মজুরি দেব।

... তিনি আবার বললেন, প্রেমহীন কেন হবে বাংলা দেশ? এ তো আধ্যাত্মিক বিভূতির দেশ। এই দেশে বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। ...তিনি তো মহারাষ্ট্রের মানুষ। কোথায় বাংলা আর কোথায় সেই মহারাষ্ট্র।

—তবু বাংলার নামেই তাঁর মন উৎসাহে ভ'রে উঠত। তিনি জানেন, এমন দেশে প্রেমের অভাব হ'তে পারে না।

শুধু সকলের কাছে যেতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে।

৩রা জানুয়ারী এলেন মেজিয়ায়। এখানেও গ্রামের মানুষ ছুটে এল, তাদের ম্লানমুখে জ্বলে উঠল উৎসাহের প্রোজ্জ্বল শিখা। বিনোবাজী তাঁদের শোনালেন ভক্তিভাব আর কর্মযোগের কথা। আধ্যাত্মিক চিন্তাকে কর্মযোগে রূপায়িত করতে হবে।... এই রূপ দেবার নামই করুণা। করুণার অর্থ কিছু-না-কিছু করা। বাংলার ভক্তিভাবকে দিতে হবে নতুন রূপ। গীতার অধ্যয়ন বাড়াতে হবে বাঙলা দেশে।

এবার বললেন শ্রমের মর্যাদার কথা, আর সে শ্রম হবে উৎপাদনমূলক কায়িক শ্রম। তাতে অন্তত আধঘণ্টা রোজ সময় দিতে হবে। বাগানের কাজ, সুতো কাটা, জল তোলা, চাকী চালানো যাহোক একটা উৎপাদনমূলক কায়িক শ্রম করতেই হবে। ভূদান-যজ্ঞের বুনিয়াদ তো এইখানে।

৪ঠা জানুয়ারী বন আশুড়িয়ায় এলেন। এখানে তিনি সমবেত জনতাকে বললেন,—ভূমি-তৃষ্ণা আজ সারা এশিয়া জুড়ে দেখা দিয়েছে। এই ভূমি-তৃষ্ণা দূর ক'রে দিতে হবে। চাষীদের হাতে তুলে দিতে হবে তাদের জমি। কিন্তু হিংস্র বিপ্লবের পথে নয়, আইন ক'রেও নয়—তাঁর প্রদর্শিত এই পথে। বেদ বলেছেন ভূমিই মাতা, বাংলার ঋষি বঙ্কিম মার স্তব করতে গিয়ে সেই ভূমি মাতার কথাই বলেছেন। কিন্তু আজকাল ভূমি মাতার উপর চেপে বসেছেন জমির মালিক ভূমি-পতি; এ তো

কদর্য গালি। তাই বেঁটে দিতে হবে ভূমি, বিতরণ করতে হবে ধন সম্পদ, শক্তি। যদি দারিদ্র্য থাকে তাও বিলিয়ে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন, বন্দেমাতরম্ আমরা বলি বটে, কিন্তু বেশি প্রয়োজন বন্দে-ভ্রাতরম্-এর।'

আরো বললেন, দরিদ্রনারায়ণ কথাটা বাংলা দেশেরই কথা, এখানকারই সৃষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দ এই শব্দের উদ্‌গাতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একে প্রয়োগ করেন। আর ভারতের ঘরে ঘরে একে পৌঁছে দেন মহাত্মাজী। এই শব্দ অনুসারে কাজ করতে হবে, দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে হবে। তবেই দরিদ্র যাবে লুপ্ত হয়ে অবশিষ্ট থাকবেন শুধু নারায়ণ। তখন সকল মানুষ হবে নারায়ণ, হবে সমান।

বন আশুড়িয়া থেকে বিদায় নিয়ে এলেন অমর কাননে, এখানেও সমবেত জনতা। তাঁদের কাছে তিনি বললেন ভূমি-সমস্যা সমাধানের কথা। হৃদয়-পরিবর্তনের মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান করতে হবে। মাত্র আড়াইটি বছর আগে উত্তর প্রদেশের মংরোঠ ব'লে একখানি গ্রাম পাওয়া গিয়েছিল, আজ ভূদানযজ্ঞে ১৫৫টি গ্রামদান লাভ হয়েছে। এই বাঁকুড়ায়ও দুটি পূর্ণ গ্রামদান পাওয়া গেছে। এ এক অপূর্ব ঘটনা, এই-ভাবেই গ্রামরাজ্য স্থাপিত হবে, সর্বোদয়ের কাজ শুরু হবে। কিন্তু এর ভবিষ্যৎ রূপ কি?

ভবিষ্যৎকে চোখের সামনে এনে তুলে ধরলেন—জমি সেখানে সমানভাবে বণ্টন করা হয়েছে, গ্রামশিল্প আর বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ চলছে।

তিনি বললেন, ১৯৫২ সালে আপনারা ভারতব্যাপী নির্বাচনে মাত্র চার মাস সময় দিয়েছেন। আমার প্রার্থনা, এক পক্ষকাল সবাই মিলে ভূদানের কাজ করুন। এর ফল হবে অভূতপূর্ব। আমার হাতে কোন ক্ষমতা নেই, সংস্থা নেই। এসব নেই ব'লেই সকলের উপর আমার অধিকার। যত কর্মী, যত দল আছে, তাদের সকলের উপরই আমার অধিকার। কারণ এ মাতৃভূমির কাজ।

৬ই জানুয়ারী এলেন বিহার জুড়িয়ায়।

এখানেও তাঁকে ঘিরে ধরল জনগণ, তাঁর অমৃতবাণী শোনার জন্যে উন্মুখ, অধীর হয়ে উঠল। তিনি তাদের কাছে ধরলেন, আধুনিক পৃথিবীর অস্ত্রশক্তির কথা,—

সব শক্তিগুলিই অস্ত্রশস্ত্র বাড়াচ্ছে। আমেরিকার ভয়ে রাশিয়া ভীত, রাশিয়ার ভয়ে আমেরিকা। পাকিস্তানও শক্তিশালী হতে চায়। সে আমেরিকার আশ্রয় নিয়েছে। আমেরিকাও পাকিস্তানের আশ্রয় নিতে চায়। সেও দুর্বল। দুনিয়ার শান্তি এমনি করেই ধ্বংস হচ্ছে। এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে চাই সমাজের শক্তি। ভূদানযজ্ঞে আমরা পাব সেই শক্তি। ভূমিসমস্যা সমাধানের পথে লোকশক্তি জাগ্রত হবে।

এখান থেকে চলে গেলেন বাঁকুড়া শহরে। সেখানে অহিংসার ব্যাখ্যা করলেন। অহিংসার প্রথম অর্থ—নির্ভয়, নির্ভর হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ—ভালবাসা এবং সহযোগিতা করা। তৃতীয় অর্থ—রচনাত্মক কাজে শ্রদ্ধা রাখা। অহিংসার এই তিন অর্থ। মানুষ যদি নির্ভিক হয় আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস রাখে,

তবে অহিংসার শক্তি বাড়বে। প্রেম ও সহযোগীতায় সমাজকে এক করে নিতে পারবে। তারপরে সংগঠনের কাজে আরো শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আধুনিক যুগ দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। ভারতের শক্তি বাড়াতে হ'লে একমাত্র নির্ভরতার আধারেই তা বাড়াতে হবে। দেশে এসেছে গণতন্ত্র, কিন্তু এটা বহুজনতন্ত্র। এক পক্ষ এখানে রাজ্য চালনা করে তো অন্য পক্ষ বিরোধিতা করে। আর উভয় পক্ষের বিরোধিতায় আগুণ জ্বলে ওঠে। এতে তো প্রেম আসতে পারে না। এ হ'লে তো চলবে না, চাই সর্বোদয়—অর্থাৎ সকলের রায়, সকলের সম্মতি। যেখানে নির্বাচন, সেখানেই কর্মনাশ। ভেদাসুরের বিনাশ চাই। চাই সবাই মিলে মিশে কাজ—চাই সদ্‌গুণতন্ত্র। তিনি আরো বললেন—

আমাদের কাজ গঠনমূলক। অন্যেরা তলোয়ার নিয়ে আসে, আমরা ধরি বীণা। তাদের সঙ্গে থাকে ক্রোধ, আমাদের সঙ্গে প্রেম। আমাদের কণ্ঠস্বর কর্কশ হ'লেও আমাদের ভাষণ সুমধুর।

বাঁকুড়া শহরে সমাজগঠন সম্বন্ধে আরো বক্তৃতা দিলেন, সহযোগীতার কথা বললেন।

সমাজের প্রবাহ গঙ্গা নদীর মতো। পুরানো জল বয়ে যায়, নতুন জল আসে।

সমাজেও পুরানো যায়, নতুন আসে। সমাজ চলে, প্রগতি আসে। তার অর্থ—নবীনতার বিকাশ। এতে বিরোধ লেগে যায় নূতনে, পুরাতনে। পুরাতন যদি নতুন বিচারধারাকে

স্বাগত জানান, পুরানো ও নতুন অভিজ্ঞতার সমন্বয় করেন, তাহ'লেই তো সহযোগিতার সৃষ্টি হয়, সমাজের উন্নতি হয়।

ওন্দাগ্রামে এলেন শহর থেকে। এখানে তিনি বুদ্ধিভ্রম আর অহিংসার কথা প্রচার করলেন। তিনি বললেন—

সমাজের কাছে আমার প্রার্থনা, তুমি হাজার হাজার বছর ধ'রে হিংসার উপর বিশ্বাস রেখে এসেছ, এখন অন্তত দশ বিশ বছর অহিংসার উপর বিশ্বাস রেখে চল।

তিনি এও বললেন, আমরা যদি অহিংসা অস্ত্রের সন্ধান করি তবে আমি বলব—ভূদানের প্রক্রিয়া অহিংসার একটি উৎকৃষ্ট অস্ত্র।

ওন্দা থেকে ১০ই জানুয়ারী এলেন বিষ্ণুপুরে। এখানকার বৈষ্ণব সমাজ একটি অভিনন্দন পত্র দিলেন। তিনি তার উত্তরে বললেন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। শ্রীচৈতন্য এখানে বইয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের পবিত্র ধারা। বুদ্ধদেবে পূর্ণতা বুঝি ছিল না, তাই মহাপ্রভুর প্রয়োজন হয়েছিল। ভাবধারায় পরিপূর্ণতা একজনকে দিয়ে আসে না। ইসলাম একথা জানেন তাই বলেছেন, মহম্মদ একজন মানুষ, তাঁকে ঈশ্বরের পদবী দেওয়া যায় না। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। মহম্মদ ঈশ্বরের বাণী বহনকারী রসুল, সেবক মাত্র।

বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকাদহ। সেখানে দেশের বর্তমান কর্তব্যের কথা বললেন। কি সে কর্তব্য? নিজেদের নিঃশেষ ক'রে দিয়ে জমিদার বা ধনীদের দরিদ্রনারায়ণের সেবায় লাগা চাই,

গরীবদের সঙ্গে মিশে যাওয়া চাই। প্রেমের পথে পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদের ঝগড়া মেটাতে হবে।

বাঁকুড়ার এই বাঁকাদহ গ্রাম তার শেষ আবাসস্থল। পরের দিন তিনি প্রবেশ করবেন মেদিনীপুর জেলায়। তাই তিনি বললেন—বাঁকুড়া জেলার সবাই উদ্বুদ্ধ হোন, সবাই মিলে মিশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভূদানের কাজ পূর্ণ করুন। এ জেলার কাছে আমার দাবি এক লক্ষ দান পত্র আর এক লক্ষ একর জমি।...আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা ত্যাগ করুন, অন্যকে বলুন এই কাজের কথা। ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি আপনাদের সমৃদ্ধি দিন। সকলে সুখে থাকুন।

প্রেমযাত্রায়

মেদিনীপুর

বাঁকাদহ ছেড়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করলেন বিনোবাজী। গড়বেতায় এসে হাজির হলেন ১২ই জানুয়ারী। যাত্রা চলেছে; জনগণ চলেছে পেছনে। তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন—গ্রামই ভারতের প্রাণশক্তি। সর্বোদয়ের মর্মকথা বুঝিয়ে দিল সবাইকে। সর্বোদয়ওয়ালারা কম জিনিসে তুষ্ট নন। তাঁরা শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি সব চান। গ্রামে গ্রামে বসবে শ্রীনিকেতন, শ্রমনিকেতন বসবে শহরে শহরে; আর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হবে শহর আর গ্রামের মাঝখানে। সর্বোদয় তো যন্ত্র বিরোধী নয়। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের মঙ্গল সম্পাদিত

হোক্ এই চায়। কিন্তু মানুষ যেন যন্ত্রের দাস না হয়। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার যুগে মানুষ হয়ে পড়েছে যন্ত্রের দাস। এ থেকে মুক্তি পেতে হবে।

চন্দ্রকোনা রোডে এলেন, এখানে বললেন, ভেদাসুরের কথা। এই ভেদবুদ্ধিই পাপবুদ্ধি। বেদে ঈশ্বরের বর্ণনায় আছে—তাঁর হাজার কান, হাজার হাত, হাজার পা। এইসব হাত-পা যখন পরস্পরকে সাহায্য করবে, তখনই ঈশ্বরের রূপ বিকশিত হয়ে উঠবে।

শালবনীতে পৌঁছলেন ১৪ই জানুয়ারী। সেদিন মকর-সংক্রান্তি। এ এক পুণ্যদিন, সূর্য-নারায়ণ এদিন উত্তর থেকে দক্ষিণে মোড় ফেরেন। এক ঋতু শেষ হয়, আর এক ঋতু শুরু হয়। এমনি দিনে জীবনের পরিবর্তনের কথা ভেবে নিতে হবে—এই কথাই তিনি মানুষকে জানালেন। মালিকানা-মুক্তি চাই, চাই বৃহত্তর জীবন—এই হোক এই ঋতু বদলের দিনের কামনা।

কারখানার মালিক ভাবুন—মালিকানা ত্যাগ ক'রে সমাজ সেবার কথা। জমির মালিকও ভাবুন। আজ শুভ সংক্রান্তির দিনে আপনাদের এই সংকল্প হোক, 'আমরা কেউ জমির মালিক হব না। ধনসম্পত্তি ও জমি সবই হবে গ্রামের।'

শালবনী থেকে গোদাপিয়াশাল।

আজ ১৫ই জানুয়ারী, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। বিবেকানন্দ ও তৎকালিন ভারতের কথা বললেন বিনোবাজী,—

তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভারত ছিল গোলামিতে পূর্ণ। সেই গোলামি দৃঢ়তর হয়ে ভারতের গলায় জড়িয়ে যায়

সিপাহী বিদ্রোহের পরে। ভারতের মানুষ তখন পুরোপুরি গোলাম হয়ে যায়। সেই সময়েই স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়।

বিবেকানন্দ একদিকে নিজেদের শক্তিকে যেমন মর্যাদা দিতে শেখালেন, অন্যদিকে নিজেদের দোষগুলিকেও দেখিয়ে দিলেন। 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি তাঁর দান। তিনি শেখালেন—সকলের মধ্যেই এক আত্মা বিরাজ করছে, যদি আমরা একথা বুঝে থাকি তবে সকলকে নিজেদের ভাই ব'লে গ্রহণ করা এবং তাদের সেবা করা আমাদের কর্তব্য। বিনোবাজী বললেন, বিবেকানন্দের জন্মদিনে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতের দারিদ্র এখনো কমেনি এবং বাংলা দেশে তার আধিক্য যথেষ্টই বিদ্যমান। ...তাই জনসাধারণের সেবার জন্যে আমাদের পরিব্রাজক হতে হবে। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে হবে।

...বাংলা দেশে যদি একজনও দরিদ্র থেকে যায়, আর তার সেবা করা না হয়, তাহলে বিবেকানন্দের আত্মা শান্তি পাবেন না।

গোদাপিয়াশাল থেকে ১৬ই জানুয়ারী এলেন মেদিনীপুর শহরে। শহরবাসীদের কাছে তাঁদের উপযুক্ত বিচার উপস্থিত করলেন। গণতন্ত্র ও শাসনমুক্ত সমাজের কথা বললেন। তিনি বললেন, গণতন্ত্রের শেষ কথা যদি এই হয় যে, সরকারের উপরই সবকিছু নির্ভর করবে, তবে সে গণতন্ত্র নামে মাত্র গণ-তন্ত্র হবে। তার পরিণাম হবে সৈনিক-তন্ত্র বা সৈনিক শাসন।

পাকিস্তানের মিলিটারী শাসনের কথা তুললেন। বললেন, যেখানে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে, মিলিটারীর হাতে চলে যায়—সেখান জনসাধারণ হয়ে পড়ে ভেড়ার মতো। ভেড়া

শুধু তার পালককে বেছে নিতে পারে—এই টুকুই তার অধিকার।

...কিন্তু এ সমস্যা তখনি মিটে যেতে পারবে, যখন ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হবে, জনসাধারণ নিজেদের শক্তিতে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে শিখবে।

মেদিনীপুর শহর থেকে গেলেন খড়্গপুর শহরে। এ এক শ্রমিকের নগর, শ্রমের কেন্দ্র। বিনোবাজীর জীবনে তিনি শ্রমিক হয়েছেন, চাষী হয়েছেন, তাঁতী হয়েছেন, মেথরের কাজও করেছেন। তাই এই শ্রমিকের শহরে এসে উদ্বেল হয়ে উঠল তাঁর মন। তিনি তো এই শ্রমিকেরই দোসর। তিনিও তো ভূদান আন্দোলনের শ্রমিক। খড়্গপুরবাসীদের কাছে তিনি বললেন, আমি চাই শ্রমিক আর মালিকের ভেদ ঘুচে যাক্। ভারতের নিজস্ব বিচারধারা বলে—সমাজের জন্য যা-কিছু করা হবে, তা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হবে—এখানে উচ্চ-নীচ ব'লে কেউ থাকতে পারে না।

শ্রমিকের এই শহরে আদর্শশ্রমিক বিনোবা ঘোষণা করলেন—

হে ভারতের শ্রমিক! এই দেশ তোমাদের। তোমাদের পরিশ্রমে এই দেশ গড়ে উঠেছে। তোমরাই এর বুনিয়াদ। অবশিষ্ট ভাইয়েরা যে সব কাজ ক'রে থাকে, তা তোমাদের সহায়ক রূপেই ক'রে থাকে।

এরই মধ্যে নানাজনের আনাগোনা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে একজন কলকাতার ভাড়াটে বাড়ির প্রতিনিধি। তিনি জানালেন, শহরবাসীর জন্য গৃহদানের কাজও করা উচিত। কলকাতার বাড়ির মালিকরা বাড়িভাড়া বাড়িয়েই চলেছেন, এর জন্যেও আইন করা দরকার।

বিনোবাজী বললেন, আইনে হবে না। এসবের জন্য চাই মানুষের হৃদয়-পরিবর্তন। বাড়ির মালিকদের কি হৃদয় ব'লে কিছু নেই? ভগবান তো প্রত্যেককে হৃদয় দিয়েছেন। বাড়ির মালিকদের বলতে হবে, আপনারা আপনাদের ভাড়াটেদের ভালবাসুন। এতে আপনাদের সম্মান বাড়বে, সুবিধেও হবে।

আবার একজন বাস্তুহারাও দেখা করতে এলেন। তিনি ছিলেন মুসলমান। তাঁর ঘরবাড়ি কিছু নেই, স্বজনও কেউ নেই কিন্তু তিনি ধীর। মনে হয়, কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

বিনোবা তাঁকে কথায় কথায় বললেন, আমরা হিন্দুই হই, আর মুসলমানই হই, সমস্ত ভারতের কৃষ্টি নিয়ে আমাদের এদেশেই বাঁচতে এবং মরতে হবে।

বিনোবাজীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, বাস্তুহারাদের জন্যে জমি পাওয়া যাবে কি-না?

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে তার জন্য আন্দোলন দরকার। পুরানো মানুষ দিয়ে এ-আন্দোলন হবে না। নতুন মানুষ চাই। ভূদানের হাওয়া যখন বইতে থাকবে, তখন বাস্তুহারারাও জমি পাবেন।...সরকারও তখন জমি দিতে থাকবেন। সরকার দুর্বল, তাকে আমাদেরই মজবুত ক'রে নিতে হবে। সরকার যদি বাল্‌তি হয় তবে জনসাধারণ তো কূয়ো। সরকার জনসাধারণেরই শক্তির এক অংশ মাত্র।

খড়্গপুর থেকে বিদায় নেবার সময় বললেন, পুরানো মূল্যের পরিবর্তন, নূতন মানুষের সৃষ্টি এবং হৃদয় পরিবর্তন করাই দেশের প্রকৃত কাজ।

১৮ই জানুয়ারী এলেন বলরামপুরে। সেখানে কর্মী সম্মেলনে ভূদানযজ্ঞ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তিনি জানালেন ভূমিদান ভিক্ষা নয়। ভিক্ষায় কাজ হয় না। ভূদানের কাজ দরিদ্র জনগণের অধিকার দাবির কাজ।

কৃপালনীজীর কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—তিনি বলেছিলেন রাজশক্তি হাতে না নিলে কি ক'রে কাজ হবে? বিনোবাজী উত্তর দিয়েছিলেন—কাজের জন্য শক্তি হাতে নেবার প্রয়োজন নেই। ক্ষমতা অধিকারীরা আমাদের কথা মতো চললেই হ'ল।

তিনি আরও বললেন, রাজশক্তি হাতে না নিয়েই কাজ করতে হবে। ক্ষমতাপ্রেমী যারা তাদের দিয়ে শুদ্ধির কাজ হয় না। তারা ক্ষমতা দেবীর উপাসক। পশ্চিমী গণতন্ত্রের ঐটেই মূলমন্ত্র।

কিন্তু সে তো অপূর্ণ মন্ত্র। পাঁচ জনের রায়েই ভগবান। অর্থাৎ সকলের অভিমতই ভগবানের অভিমত। সকলের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে, নৈতিক সংঘ গ'ড়ে তুলতে হবে। রাজশক্তি তাহ'লে আমাদের কথা শুনে চলবে, শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত, ক্ষীণ হয়ে যাবে। ভূদানযজ্ঞের বুনিয়াদ এই সব দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দু'পয়সার আইনে একাজ হয় না, এর জন্য চাই তপস্যা।

বলরামপুরেই তিনি বললেন বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা। ভূদানে চাই শ্রদ্ধা, চাই বিশ্বাস, তবে তো তার কর্মী হওয়া যায়। মার কাছে ছেলে বলে—আমার ক্ষুধা পেয়েছে, খেতে দাও। মার প্রতি ছেলের আছে শ্রদ্ধা, আছে বিশ্বাস। সেই শ্রদ্ধা নিয়েই জানাতে হবে নিজেদের কথা। এমনি ক'রেই তো

বিশ্বাসের শক্তি, শ্রদ্ধার প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে। এ কারুর পৈতৃক সম্পত্তি নয়, এ সম্পত্তি সকলের হ'তে পারে।

বলরামপুরে বাংলার সাহিত্যিকদের সঙ্গে সম্মেলন হ'ল। সম্মেলনে বিনোবাজী বাংলার সাহিত্যিকদের কাছে বাগ্‌দান চাইলেন। সাহিত্যিকগণ তাঁদের সম্মতি জানালেন।

বলরামপুর থেকে ভেটিয়ায় এসে গেলেন। এখানে এসে অবিশ্বাস ও আইনের পথের কথা বললেন। প্রসঙ্গক্রমে শান্তির কথা এল। শান্তি হচ্ছে জল—শস্য উৎপাদনে আবার তৃষ্ণা নিবারণে প্রয়োজন। শান্তিরও তেমনি প্রয়োজন দেশের সমৃদ্ধির জন্যে, আবার মানসিক স্থিতি ও হৃদয়ে-হৃদয়ে মিলনের কাজেও তার দরকার।

একটার জন্যে শান্তি চেয়ে আর একটার জন্য চাইনে বললে চলবে না। শান্তি চাই সর্বদার জন্যে, শান্তি চাই আত্মসন্তোষের জন্যে, প্রেমের জন্যে। শান্তির জন্যে মানুষের মনে স্বতন্ত্র পিপাসা না জাগলে, দুনিয়ায় শান্তি আসবে না।

ভারতের স্বাধীনতা শান্তির পথে এসেছে—একথা অনেকে ব'লে থাকেন। কিন্তু কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। তা যদি হোত, ভারত শান্তির জন্য শ্রদ্ধাশীল হোত, অহিংসার শক্তি অনুভব করত। দেশের এমন দুর্দশা হোত না। গান্ধীজী দুর্বলতার শিক্ষা দেন নি। কিন্তু অসহায় ভারতবাসী তাঁর শান্তির পথকে দুর্বলের শান্তির পথ ক'রে তুলল। তাঁর শিক্ষার ভুল প্রয়োগ করা হ'ল। কিন্তু ভূদান আন্দোলনের পিছনে আছে এই মহান্ শান্তি শক্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্প।

খাজুরায় চলে এলেন বিনোবা। এখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় হ'ল হৃদয় আর সঙ্গীত। তিনি রোজই প্রার্থনা সভায় শুনছেন সঙ্গীত। মন-প্রাণ ভ'রে ওঠে গানে। তিনি বললেন, যেখানে গান হয়, সেখানে তো ক্রোধ থাকা উচিত নয়। গান যাকে আকুল করে না, সে মানুষ সবরকমের হীন কাজ করতে পারে। গানের শক্তি অসাধারণ, গান হৃদয়কে স্পর্শ করে, অভিভূত ক'রে ফেলে। ভক্তিময় সঙ্গীত গাইতে-গাইতে ঘুরতে হবে, মানুষ বুঝবে সহজে সেই গানের বাণী। কর্মীদের শেখাতে হবে গান। চাই গানের শক্তি ভূদানের কাজে, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে মায়েদের শক্তি। তাহলে ভূদান যাত্রা হবে সার্থক, সুন্দর।

২২শে জানুয়ারী কুকাইয়ের সভায় তিনি বললেন ভারতের বিচার বৈশিষ্ট্যের কথা। ভূদান-ক্রান্তি বা বিপ্লবের মূল তো গ্রামে, এ ক্রান্তির অগ্রদূত গ্রামের মানুষ। কিন্তু এ-ক্রান্তিকে পৌঁছে দিতে হবে শহরে। সমাজ-কাঠামো পাল্‌টে দেবার এ আন্দোলন শুরু হবে গ্রামে, আর তা ক্রমে শহরে গিয়ে পৌঁছবে। ...সমাজবাদীরাষ্ট্র গড়তে হবে অহিংসার মাধ্যমে, সর্বোদয়ের দৃষ্টিতেই তা সম্ভব হবে। অন্য পন্থা নেই।

সর্বোদয়ের লক্ষ্য কি? সকলের হিত। আর পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদর্শ মেজরিটির হিত—অধিক সংখ্যকের হিত। ভারতের আদর্শ—সবাই সুখী হোক, দুঃখে যেন কেউ না থাকে।

সর্বোদয় বলে, প্রতিটি মানুষের বিকশিত হবার সুযোগ থাকবে, পূর্ণ অবকাশ থাকবে। সমাজ সেবার অবসর

থাকবে সকলের। সমাজ স্বামী—ব্যক্তির সেবা স্বামীর কাছে নিবেদিত হবে। কিন্তু ব্যক্তিরও পরিপূর্ণ বিকাশের অবকাশ থাকবে। উত্তম জীবন বিকাশের সঙ্গে চাই ক্ষেতের কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ। মানুষকে মাংসাহার কমিয়ে দিতে হবে, মানুষ হবে নিরামিষ আহারী। কর্মীরা যদি এই বিচার ঠিকমত প্রচার করেন, তাহ'লে প্রেমময় বাংলা দেশে সর্বোদয় আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠবে।

২৩শে জানুয়ারী গেলেন রসুলপুরে, সেখানে বললেন সর্বোদয় রাষ্ট্রের কথা। সেদিন নেতাজীর জন্মতিথি। তিনি নেতাজর বীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। বললেন—শ্রাদ্ধের অর্থ হলো, যাঁরা বড়, আমাদের পূর্বপুরুষ, তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা। বড়দের স্মরণ করলে আমাদের মঙ্গল হয়। তাঁদের সৎকাজ থেকে আমরা সৎ প্রেরণা লাভ করি।··· সুভাষবাবু প্রেরণা দিয়েছিলেন দিল্লী চলো! সকলের সঙ্গে এতে এমন অনেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন, যাঁদের চিন্তাধারা ছিল তাঁর থেকে ভিন্ন।···

তিনি এবার বললেন সর্বোদয় রাষ্ট্রের কথা। সাম্যযোগী সমাজে কথা। ভারতে সমাজবাদী-সমাজ গড়া হবে না, সাম্যযোগী সমাজ গড়তে হবে। ভূদানের তো সেই লক্ষ্য। দেশের সমস্ত জমি আর ধনসম্পত্তি দেশের হোক—এই বিচার-ধারা সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই বিরাট আন্দোলনের স্পর্শ দিতে হবে সবাইকে। একাজ করার জন্য চাই প্রেম। এ কাজ প্রেমের কাজ। সাম্যযোগ প্রেমের দ্বারাই সিদ্ধ হ'তে

পারে। এযুগের ক্ষুধাও এই—সাম্যযোগের প্রতিষ্ঠা প্রেমের ভিত্তিতে করতে হবে। তিনি রসুলপুরের সমবেত জনতাকে বললেন, আমি আশাকরি এই সাম্যযোগী সমাজ প্রতিষ্ঠায় আপনারা যোগ দেবেন।

বাংলার প্রেমযাত্রা শেষ হয়ে এল। চব্বিশ দিন আজ, কাল পড়বে শেষ পড়াও বা তাঁবু। আজ তাই নেকুড়সেনীতে এসে তিনি বাংলার কি কাজ সে সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

বাংলা দেশে পদযাত্রা চলেছে চব্বিশ দিন, ভূদান কিছু মিলেছে। আর ভূদানের পেছনে যে বিচার ধারা রয়েছে তাও জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। তাতে কাজও হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেরাও বলছে—

আমাদের গ্রামে ভূমিহীন কেউ—থাকবে না থাকবে না!

ভূদানযজ্ঞ (ভূমির মালিকানা বিলুপ্তি) সর্বোদয়ের ভিত্তি। এ তো সবে শুরু। ভূদানের পালা শেষ হ'লে আসবে সর্বোদয়ের আর সব কাজের পালা। ভূমি হবে ভিত্তি তারপর গ্রামশিল্প গ'ড়ে তুলতে হবে, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।

তিনি এরপর এলেন বাংলার করনীয় কাজে। রাজা রামমোহন, পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলায় অস্পৃশ্যতা এখনো রয়ে গেছে! অথচ এইখানেই প্রথম সমাজ-সংস্কারের চিন্তার উদয় হয়েছিল।

অস্পৃশ্যতার সে কঠোরতা আজ কোথাও আর নেই, কিন্তু এখনো তারা সমাজের এলাকার বাইরে। স্বাধীনতালাভের পরেও এই জাত-বিচার রয়ে গেছে। সর্বোদয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে

এদের কথাই আগে ভাবতে হবে। সর্বোদয়ের লক্ষ্য অন্ত্যোদয়। সবার নীচে যে রয়েছে, তার উদয় চাই প্রথম। আত্মার দৃষ্টি দিয়ে সবাইকে সমানভাবে দেখতে হবে। এই মারাত্মক ভেদ যদি চলতে থাকে তাহলে তো দেশের সর্বনাশ। তিনি পানিপথের একটা দৃষ্টান্ত এনে তুলে ধরলেন।

পানিপথের প্রান্তরে মারাঠা আর আহমেদ শাহ আবদালীর শিবির পড়েছে। সন্ধ্যাকালে আহমেদ শাহ লক্ষ্য করলেন মারাঠা শিবিরের জায়গায় জায়গায় জ্বলছে ছোট ছোট আগুণের কুণ্ড। তিনি এক সর্দারকে প্রশ্ন ক'রে জানলেন, ঐ শিবিরে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, একের ছোঁয়া অপরে খায় না। তাই ভিন্ন ভিন্ন আগুণের কুণ্ড জ্বেলে তারা রান্না চাপিয়েছে। আহমেদ শাহ অমনি ব'লে উঠলেন, তবে তো এযুদ্ধে আমি জিতে গেছি। তাই হ'ল, মারাঠারা হেরে গেল। কাজেই এই ভেদ বুদ্ধি, এই অস্পৃশ্যতা দূর করতে হবে। আর বাংলা তো সমাজ-সংস্কারের পৃষ্ঠভূমি। সুতরাং এখানেই সে কাজ প্রথমে করতে হবে।

দ্বিতীয় কাজ, বাংলা ভাষার প্রতি কর্তব্য, বাঙালীকে তা পালন করতে হবে। বাংলা সাহিত্য সারা ভারতের প্রেরণার উৎস। সেই ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, তার বিকাশে সাহায্য করতে হবে। আমি শুনলাম বাঙালীরা বেশির ভাগ চিঠিপত্র ইংরেজীতেই লেখেন। অন্য রাজ্যের কিম্বা অন্য দেশের লোকের কাছে লিখুন, কিন্তু একজন বাঙালী আর একজন বাঙালীর কাছে কি ব'লে ইরেজীতে চিঠি লেখেন!

তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। ভূদানযজ্ঞ নিয়ে বাংলার

মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় আর বাংলার সর্বোদয় নেতা শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর সঙ্গে যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয় তা ইংরেজীতেই হয়। এতে তিনি দুঃখিত। এদ্বারা বাংলা ভাষার প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধার অভাবই সূচিত হয়।

তিনি বাঙালীকে বাংলা ভাষার পরই রাষ্ট্রভাষা হিন্দী শিখতে বললেন। হিন্দী এখন সংস্কার-মুখী ভাষা।

তারপরে গোজাতির কথা। গোজাতির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, কসাইখানায় গোহত্যা করা চলবে না। ভারতের সমস্ত গোরু ও ষাঁড়কে রক্ষা করা দরকার ব'লে তিনি মনে করেন। কলকাতায় প্রতিদিন গোহত্যা চলছে, আর মানুষ অসহায়ভাবে তা দেখছে। এ তো মোটেই শোভন নয়।

ভূদানের কাজ বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ুক—তিনি এই চান। ভূদানযজ্ঞ একটি নূতন ধ্বনি। এর পিছনে আছে নূতন চিন্তাধারা। গ্রামের জমি হবে গ্রামের, গ্রামের উন্নতির দায়ীত্ব নেবেন গ্রামবাসী। চাষের জন্য প্রতি মানুষ পাবে জমি। এটা ভূদানের আর্থিক দিক। আবার তার আধ্যাত্মিক দিকও আছে। অহিংসা ও প্রেমের পথে চলবে এই কাজ। বঙ্গভূমি বৈষ্ণবভূমি, প্রেমভূমি। বৈষ্ণবদের মধ্যে যে প্রেম ছিল, সেই প্রেম চাই ভূদান-কর্মীদের মধ্যে। বিভিন্ন রাজনীতিক দলের কর্মীরাও একাজ করতে পারেন, আবার নির্দলীয়দেরও একাজ করতে বাধা নেই। সবাই একসঙ্গে মিলে-মিশে অনুরাগে ও বিশ্বাসে এ কাজ করবেন।

দেখতে দেখতে ২৫শে জানুয়ারী এসে পড়লো। বাংলার

প্রেমযাত্রাও শেষ হ'ল। বিনোবাজী এলেন মেদিনীপুরের দাঁতনে। এইখান থেকেই উড়িষ্যার সীমায় প্রবেশ করবেন। সেখানে চলবে আবার তাঁর পদযাত্রা।

দাঁতনে তিনি বাংলাদেশের শেষ ভাষণ দিলেন। বাংলাকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

এই পঁচিশ দিনে তিনি বাংলায় অনেক কিছু পেয়েছেন। বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুরে তিনি বাংলার অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিলতে পেরেছেন। তারা গরীব, তাই তাদের বাংলার মানুষ বলে 'ছোটলোক'। তা ছাড়া তিনি লক্ষ্য করেছেন জনগণ শুনেছে মন দিয়ে তাঁর কথা, তাঁদের হৃদয়ের গভীরে তা প্রবেশ করেছে। ভূমিহীনদের অধিকারের কথা স্বীকার ক'রে নিয়েছে, মনে মনে। এই যে বিচার-বীজ বোনা হ'ল, এই তো এই পদযাত্রার প্রথম লাভ। এর থেকেই শক্তির উন্মেষ হবে।

আর দ্বিতীয় লাভ, ভূদানের কাজে বাংলার সাহিত্যিকদের আশীর্বাদ। আন্দোলনের ভাবধারা সাহিত্যিকদের হৃদয় আকর্ষণ করেছে। তাঁরা নিজেরাই বলেছেন, সাহিত্যিকদের চেতনায় ভাটা পড়েছিল, এই নব প্রেরণায় আবার জোয়ার এল। বাংলার সাহিত্যিকদের আছে এক বিশেষ শক্তি। তাঁদের সম্মান সারা ভারতময়। তাঁদের আশ্বাসে তাই বিনোবাজী হৃদয়ে বল পেলেন।

তৃতীয় লাভ ভূদানের আধ্যাত্মিক বিচারে বৈষ্ণব সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কেবল বাইরের জাগরণেই কাজ হবে না, ভিতরে চাই পূর্ণ একাগ্রতা। হৃদয়ে প্রেম থাকলেই সেবাব্রত পূর্ণ হতে পারে। বর্তমান জীবন-রহস্য যাতে বুঝে

নেওয়া যায়, বাংলার বৈষ্ণব সমাজ সেই দিকে চিন্তা আরম্ভ করেছেন, এ এক মস্ত লাভ।

চতুর্থ লাভ, এখনো ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু তবু তিনি আশান্বিত। ভারতের সর্ববৃহৎ সংস্থা কংগ্রেস বাংলা দেশে একাজ গ্রহণ করবেন জানিয়েছেন। এই বৃহৎ সংস্থা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে একাজ গ্রহণ করেন, তা'হলে ভূদানযজ্ঞের বিরাট কাজ নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হবে। অবশ্য কংগ্রেসকে বিশুদ্ধ ও পক্ষরহিত হয়ে একাজে যোগ দিতে হবে। কারণ, রাজনীতিক সংস্থায় কিছু না কিছু অশুদ্ধি এসে যায়ই। তখন শুদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। এই কথা বুঝে নিয়ে কংগ্রেসী, প্রজাসমাজবাদী ও গঠন-কর্মীরা যদি একাজে নামেন, তবে এক বিরাট শক্তির উদ্ভব হবে। এই অহিংসক সমাজবাদ সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

আর একটি লাভের কথাও তিনি বললেন। বহু কর্মী তিনি এই পদযাত্রায় পেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে গভীর স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। আলোচনা সভায় তাঁর বিচার সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি আশা করেন পদযাত্রায় যাঁরা যোগদান করেছেন, তারা একাজ পরমেশ্বরের কাজ ব'লেই গ্রহণ করেছেন।

তা ছাড়া তিনি বাংলার জনগণকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এ-ই তো তাঁর মহালাভ। তিনি বললেন, বিহারের স্নেহে শক্তিশালী হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিলাম। বাংলার প্রেমে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উড়িষ্যায় যাচ্ছি।

তাছাড়া আর একটি কথা বললেন—সারা ভারত সুগভীর প্রেমের আধারে একরস হয়ে আছে। এ রস বিলিয়েছিলেন শংকরাচার্য, শ্রীচৈতন্য, তুকারাম প্রভৃতি মহাপুরুষগণ। তাই বাংলা দেশে এসে তাঁর একবারও মনে হয়নি তিনি অন্য প্রদেশের লোক। মনে হয়েছে, তিনি এই প্রদেশেরই একজন। মহারাষ্ট্রে গেলে বাংলার মানুষেরও তাই মনে হবে।

এই প্রসঙ্গেই এল ভাষা-ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কথা। তিনি জানান, এর পেছনে এই যুক্তি আছে যে, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠিত হ'লে সরকারী কাজগুলো লোকভাষায় চলতে পারবে। এতে জনসাধারণের সুবিধে হবে, তারা স্বরাজের দর্শন পাবে। ইউরোপে ভাষার ভিত্তিতে আলাদা হয়ে নতুন নতুন রাষ্ট্র তৈরী হয়েছে, কিন্তু ভারতে তো সেকথা কেউ ভাবে না, ভাববেও না। কারণ, এখানে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সমগ্র ভারতের জন্য প্রেম আছে, গৌরববোধ আছে। তিনি বললেন—

আমাদের এক রসেভরা দেশে জন্ম হয়েছে, এর জন্যে আমি নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করি। আমরা সবাই ভাগ্যবান।

নমস্কারের দিনে বাংলার সবাইকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। বাংলা ত্যাগ ক'রে ২৬শে জানুয়ারী প্রবেশ করলেন উড়িষ্যায়। উড়িষ্যায় শুরু হ'ল তাঁর পদযাত্রা।

বাংলার কথায় বিনোবা বলেন—

বাংলার ত্যাগ আছে, বাংলার শক্তিও আছে। বাংলা ভূদানযজ্ঞের বিচারধারা বুঝে যখন জেগে উঠবে, তখন সে লক্ষ হাতে দান করতে থাকবে, তখন তার হৃদয় হ'তে ত্যাগের প্রবাহ ও দানধারা অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হতে থাকবে।

ক্রান্তিযাত্রা

বাংলার পদযাত্রা শেষ হ'ল। এবার বাংলা থেকে বিদায় নিয়ে বিনোবাজী চললেন উড়িষ্যার পথে। ২৬শে জানুয়ারী তিনি উড়িষ্যায় এসে প্রবেশ করলেন।

প্রেমযাত্রার পর এবার এল ক্রান্তিযাত্রা। এমনিতে তো সব যাত্রাই তাঁর প্রেমযাত্রা কিন্তু উড়িষ্যায় তিনি ভূমিক্রান্তির দর্শন পেলেন সেইজন্য এই প্রদেশের যাত্রার নাম দিলেন 'ক্রান্তিযাত্রা'।

প্রেমধর্ম তো নিষ্ক্রিয় নয়, তার আছে শক্তি। এই শক্তি অনুভব করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ। তিনি সেই শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে সারা ভারতে বিলিয়েছিলেন প্রেম, করুণা। তাঁর শিষ্যরা যুগ যুগ ধ'রে সেই শক্তির প্রসাদ নিয়েই ধর্মযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। বাংলার শ্রীচৈতন্য এই প্রেমের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্রেম বিতরণ করেছিলেন। এই শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই চলেছেন তাঁদেরই মন্ত্রশিষ্য বিনোবা।

এ যাত্রা তাঁর কাছে, ধর্মযাত্রা, প্রেমযাত্রা, মহা সংক্রমণ—ক্রান্তিযাত্রা। ক্রান্তি কি?

ক্রান্তি শব্দ হিন্দীতে প্রচলিত। বাংলাভাষায় বিদ্রোহ, বিপ্লব, অ-ব্যবস্থা প্রভৃতি শব্দের প্রচলন।

কিন্তু এ তো নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে। এতে সংক্রমণ বা আরোহণের কথা নেই। তাই 'ক্রান্তি' শব্দটিই যথার্থ অর্থ-জ্ঞাপক, ক্রান্তি শব্দের অর্থ গতি। সূর্য এক রাশি থেকে আর

এক রাশিতে যায়, তখন হয় 'সংক্রমণ' বা সংক্রান্তি। এই গতিতে এক ঋতু যায়, নতুন ঋতু এসে দেখা দেয়। পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত দিনগুলি খসে পড়ে—আসে নবীন ঊষার আলোক নিয়ে নূতন বৎসর। এই তো ক্রান্তির কাজ। তাই বিনোবাজীর যাত্রার নাম ক্রান্তিযাত্রা।

উড়িষ্যায় বিনোবাজী বললেন,—মানুষের হৃদয়ই প্রকৃত কামধেনু। সেই কামধেনু উদ্বেল হয়ে আছে শতধারে প্রেমের ক্ষীরধারা ঝরে পড়বার জন্যে। তিনি তার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সে-আহ্বান তো তাঁর একার আহ্বান নয়, সে আহ্বান জনতাত্মার আহ্বান। তিনি জনতারই একজন। ভূমিহীন মানুষ চায় ভূমি, ভূমিবান মানুষ সে ভূমি দান করছে! আর দিকে দিকে ক্রান্তির স্ফূলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে—

ওরে ভয় নাই, তোর ভয় নাই—
নিঃশেষে দান কে করিবে আন
ক্ষয় নাই, তোর ক্ষয় নাই!

বিনোবাজী উড়িষ্যায় প্রবেশ ক'রেই বললেন, সে-যুগে মানুষ আসত ঘোড়ায় চড়ে, হাতে থাকত তরবারী। তাঁরা আক্রমণ করত, আর আমাদের এতো আক্রমণ নয়, এ হ'ল চংক্রমণ। ভগবান বুদ্ধ একে তাই বলেছেন।

অশ্বের স্থলে পদযাত্রা, তরবারীর স্থানে বীণা, দ্বেষের বদলে প্রেম—আক্রমণাত্মক বৃত্তির বদলে সেবাবৃত্তি।

বিনোবাজী চললেন চংক্রমণে, চললেন ক্রান্তি-যাত্রায়। গ্রামের পর গ্রাম থেকে মানুষ এসে দাঁড়ালো কাতারে কাতারে।

সবার মুখেই ধ্বনি —

জমীন কিসকী ?

—জো কাস্ত্ করেগা উস্‌কী ।

জমি কার ?

—যে চাষ করে তার !

বিনোবাজী এবার ধ্বনি তুললেন—

আমাদের গ্রামে ভূমিহীন কেউ—

সমস্বরে উঠল ধ্বনি—থাকবে না, থাকবে না !

তিনি আবার বললেন, আমাদের গ্রামে ভূমির মালিক কেউ—

আবার ধ্বনি উঠল—থাকবে না, থাকবে না !

তিনি বললেন, সারা উড়িষ্যায় আছে ৫০ হাজার গ্রাম, এখানে ৫০ হাজার সভা করতে হবে। সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে—ভূমিহীনকে ভূমি দিতে হবে। আলো বাতাস জল যেমন সকলের, ভূমিও তেমনি সকলের।

তিনি আরো বললেন—আমি চাই ভূমিহীনেরা দাঁড়াবেন নিজেদের পায়ে, নিজেদের দাবী উপস্থিত করবেন সমাজের কাছে। আমি চাই—ভূমিবানেরাও নিজেরাই এসে বলবেন—আমরা মালিকানা তুলে দিচ্ছি, দয়া ক'রে গ্রহণ কর, আমাদের উপকার করো।··· এইভাবে উভয়ে উভয়ের কাছে আসবে, পরস্পর একত্রিত হবে। সেই তো ভগবানের প্রণাম।

তাঁর মতে এ-কাজ করবেন কর্মীরা, আর করবেন পবনদেব। প্রচারের জন্য তো পত্র-পত্রিকা, রেডিয়ো প্রভৃতির তাঁর দরকার

নেই। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়বে এই বাণী, আর মানুষ তা গ্রহণ করবে।

তিনি বলেন ভূদান-যজ্ঞরূপ বাহনে চ'ড়ে আমি ধর্মচক্র প্রবর্তনে বের হয়েছি। এই ধর্মচক্রই সমস্ত জগতের বর্তমান রূপ বদলে দেবে।

ধর্মচক্র প্রবর্তনে চলেছেন বিনোবাজী চংক্রমণে চলেছেন।

যেখানে যান, সেখানেই বলেন এই ভূমিক্রান্তির কথা, নূতন মূল্য বোধের কথা।

একদিন তিনি বললেন, পরলোক প্রাপ্তির আশায় লোকে মন্দির, মসজিদ্ গ'ড়ে তোলে, চিত্তশুদ্ধির আশায় দান করে টাকাকড়ি। কিন্তু ভূদান তো সমাজ গড়ার জন্য, সমাজের কাঠামো বদলাবার জন্য, সমাজে সাম্য আনয়নের জন্য। এর উদ্দেশ্য নূতন মূল্য সৃষ্টি, সমাজের জন্য ব্যক্তির জীবন আহুতি।

বেগুনিয়ায় একদিন একজন কমিউনিষ্ট দেখা করতে এলেন। বিনোবাজীকে তিনি বললেন, বিশ্বশান্তির ব্যাপারে আমরা একমত। আমরাও জমির মালিকানা চাই না। কিন্তু আমরা কারখানার মালিকানাও চাই না।

বিনোবাজী বললেন—আমিও তা চাই না।

এবার কমিউনিস্ট ভাই বললেন, কিন্তু আপনারা গরীবদের কাছ থেকে দান নেন কেন?

বিনোবাজী উত্তর দিলেন, যাঁরা দান, যজ্ঞ ও তপস্যাকে সমাজ-শাস্ত্রের অঙ্গস্বরূপ মনে করেন তাঁরা বিশ্বাস করেন ধনী-দরিদ্র উভয়েরই কিছু-না-কিছু দান করা উচিত। কেননা উভয়েই

সমাজের অঙ্গ, অবয়ব।...সকলকেই কিছু-না-কিছু দিতে হবে। ভূমি, সম্পত্তি, শ্রমশক্তি, বুদ্ধি—সবকিছুই সমাজের, কারও নিজের একার নয়। সমাজের সেবার জন্য যিনি তা দান করতে অস্বীকার করবেন, তিনি সমাজের মানুষ নন। গরীবেরা সমাজের অঙ্গ, সমাজের মানুষ। তাই তাঁদেরও কিছু কিছু দান করতে হবে বইকি।...

কমিউনিস্টরা বিশ্বশান্তির কথা বলেন, গরীবের প্রতিও তাঁদের ভালবাসা আছে। তিনি কমিউনিস্ট কর্মীকে বললেন, তাঁরা যদি অহিংসা ও বিশ্বশান্তির কথা বুঝতে পারেন তবে আমি দেখতে পাচ্ছি—অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত কমিউনিস্ট-ভাইয়েরা ভূদানকর্মী হয়ে যাবেন।

এমনি ভাবে প্রচার করতে করতে চললেন উড়িষ্যার গ্রাম, জনপদ, শহর ছাড়িয়ে। অরণ্য অঞ্চলে পদযাত্রা শুরু হয়ে গেল। সেখানেও বিনোবাজীর কম্বুকণ্ঠ নির্ঘোষ তুললো—

আম গাঁরে ভূমিহীন—

আর অরণ্যচারী মানুষ, গ্রামবাসী মানুষ উত্তর দিলে,

রহিবে নাহি, রহিবে নাহি।

তিনি আবার ধ্বনি তুললেন—

আম গাঁরে ভূমি মালিক—

এ ধ্বনি কেউ শোনেনি, বিস্মিত তাঁর পদযাত্রার সাথীরা। তিনি এক নয়া ধ্বনির সৃষ্টি করলেন। কিন্তু জনতা তাঁকে চিনলে, জানলে—তাই নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলে—

রহিবে নাহি, রহিবে নাহি।

বারিপদায় পাহাড়ের পাদদেশে এক বৃক্ষের ছায়ায় বসে বিনোবার ভাষণ শুনল আরণ্যক জনতা। এতো ভাষণ নয়, তাদের মনেরই কথা।

গোকর্ণপুরের সভায় তিনি স্বরাজের লক্ষণের কথা তুললেন। স্বরাজ কি? স্বাধীনতা কি? জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ জানে না।

আপনারা কি জানেন, স্বাধীনতা এসেছে? প্রশ্ন করলেন।

এবারও সবাই উত্তর দিলেন—জানি না!

তিনি বললেন, এর কাবণ, আপনারা স্বাধীনতার স্বাদ পান নি। সূর্যোদয় হয়েছে, একথা কি কাউকে বলে দিতে হয়?

স্বাধীনতা আসেনি। স্বাধীনতা এলে গ্রামবাসিগণ জমির গ্রামীকরণ করতেন, নিজেদের কাপড় নিজেরাই তৈরী করতেন—নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করতেন।

তাহ'লে আসেনি স্বাধীনতা—কিন্তু কি ক'রে তা আসবে?

তিনি বললেন, একদিকে চলছে আমাদের কাজ, আর এক দিকে বিজ্ঞানের কাজ। বিজ্ঞানও হিংসা ত্যাগ করতে বলছে। আমরা দুয়ে মিলে একে সফল করে তুলব।

চলতে-চলতেও কর্মীদের সঙ্গে কথা হয়, তিনি নিজেও অহরহ ঐ একই চিন্তা করেন। একদিন বললেন, সূর্য উদিত হ'লে যেমন সমস্ত গ্রামেই উদিত হয়, তেমনি একই তারিখে সমস্ত গ্রামে ভূমি বণ্টনও করা যেতে পারে। কিন্তু সেজন্য চাই নিরন্তর জ্ঞান প্রচারকারী পরিব্রাজক। আবার কোন কর্মী হয়ত শুধান, সরকারের স্বরূপ কি হবে?

প্রার্থনা-সভায় তারই উত্তর দেন বিনোবাজী—মানুষের অবস্থার উপর সরকারের স্বরূপ নির্ভর করে।…জনতা যেমন জাগ্রত হবে, সরকারের আবশ্যকতাও তেমনি হ্রাস পাবে।

আমাদের শেষ লক্ষ্য শাসন-মুক্তি। শাসন-হীনতা এলো-মেলো ব্যাপার। তার অবসান ক'রে আনতে হবে সুশাসন। আবার সুশাসন থেকে আনতে হবে শাসন-মুক্তি। শাসন-মুক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সুশাসন চালাতে হবে। আবার শাসন-মুক্তির জন্য জনশক্তি সংগঠনেরও প্রচেষ্টা করতে হবে।

এমনি প্রশ্ন চলে সভায়, পদযাত্রার সময়, যেখানে তিনি যান—সেখানে। বিনোবাজী ধীরভাবে উত্তর দেন। তাঁর উত্তরে সর্বোদয়ের মহান পথ সকলের সুমুখে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

যেখানে যান, সেখানেই আমের পল্লব, মঙ্গল কলসে গ্রাম সেজে ওঠে, প্রদীপ আলপনার ছড়াছড়ি দেখা যায়। গ্রামখানি নিজেকে সমর্পণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে।

এই তো ভূদানযজ্ঞ—অহিংসার অনুশক্তির পরীক্ষা। কোন সভায় গ্রামের মুখপাত্র মুখিয়া বলেন,—

আমরা সর্বস্ব দান করতে প্রস্তুত।

আর গ্রামবাসীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিনোবা বলেন—একাজ আপনারা করছেন না, আমরাও করাইনি। যার কাজ তিনি করাচ্ছেন। হাইড্রোজেন ও য়্যাটম বোমা দিয়ে হিংসার ক্ষেত্রে যেমন পরাক্রম দেখানো হয়, সমগ্র গ্রামদানে তেমনি অহিংসার পরাক্রম দেখানো হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, য়্যাটম বোমার বিস্ফোরণে সমস্ত জগতের

হাওয়া দূষিত হয়ে যায়, আর আমরা মনে করি, সমগ্র গ্রামদানে সমস্ত জগতের হাওয়া পরিশুদ্ধ হয়।

সভা শেষ হ'লে তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে গিয়ে শ্রমদানের কাজে নামেন। মাথায় ঝুড়ি, মুখে উপনিষদ—এই তো ভারতের চিরন্তন আদর্শ।

বিনোবাজীকে অপূর্ব দেখায়। মাথায় মাটির ঝুড়ি নিয়ে চলেছেন। তিনি বলেন, দেখ না কি হয়! এই যে সংবাদ, এতো হাওয়া প্রচার করে দেবে।

সত্যিই এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে চলে যায় খবর। যারা গ্রামদানের প্রতিকূল ছিলেন, তাঁরাও যেন কেমন হয়ে যান। তাঁরা এসে বলেন,—আমরা কিছু ভূমিদান করব।

বিনোবাজীর উত্তর—আমি সর্বস্ব দান চাই।

আলাপ-আলোচনা হয়। তারপরে গ্রামদান হয়ে যায়।

গ্রামদানের হাওয়া বয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে।

আবার গ্রামদান হ'লেই তো কাজ শেষ হয় না। শাসন-মুক্তির পরীক্ষাও চালাতে হবে। গ্রামবাসী হবেন স্ব-স্ব অধীন, গ্রামের তৈরি জিনিসে তাঁদের চালাতে হবে, গ্রামের তাঁতের কাপড় তাদের পরতে হবে। গ্রামবাসীদের বিচারও হবে গ্রামে।

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পদযাত্রায় সহযাত্রী—তিনি তাঁকে বললেন, আগে জ্ঞানী ব্যক্তিরা দণ্ড গ্রহণ ক'রে তা থেকে দূরে থাকবার পরীক্ষা চালাতেন। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়। অতি হিংসার আশ্রয়ে দণ্ডশক্তি আজ আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত। তাই আজ জ্ঞানীদের শাসন-মুক্তির পরীক্ষা চালাতে হবে।

শুধু কি বাণী বিতরণ, শুধু কি শ্রমদান যেতে যেতে। প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হন বিনোবা—পর্বত, নদী, ঝরণা, পাখীর কাকলী—সবই আকর্ষণ করে তাঁর মন। তিনি সমাহিত হয়ে যান।

এমনিকরে চলে পদযাত্রা, এমনিকরেই চলে গ্রামদানের পর্ব।

তিনি বলেন—সেবাপরায়ণ হতে হবে ভারতবাসীকে। ভগবানকে বলা হয় দীনবন্ধু। তিনি দীনের পালন করেন। ভূদানযজ্ঞের দ্বারা দীনের কেবল পালনই নয় দীনতা ঘুচিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ।

অরণ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামদানের হাওয়া। গ্রামদান করে গ্রামবাসী—সেখানে নতুন পরিকল্পনায় কাজ শুরু হয়।

বিনোবাজী চলতে থাকেন, আর কর্মীদের বলেন—

গ্রামে গ্রামে চল, গাহিতে গাহিতে যাও, নাচিতে নাচিতে চল! এই মহান ক্রান্তির কাজ নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিদের দ্বারা হবে না। আয়েসী অলসদের কাজ এ নয়। ভক্তিরস পান করে যারা মাতোয়ারা হয়েছে একাজ তারাই করতে পারবে।

অহিংসার য়্যাটম বোমার পরীক্ষা চলছে। কিন্তু এতো ধ্বংসের হিংসার হিরোশিমা নয়, এযে মহামিলনের পুণ্যক্ষেত্র। চংক্রমণে চলেছেন বিনোবাজী আর গ্রামকে গ্রাম লুটিয়ে পড়ছে, গ্রামের মালিকানা লুপ্ত হচ্ছে। সমস্ত জমি গোপালের হয়ে যাচ্ছে।

কে ভেবেছিল, উড়িষ্যার এই পশ্চাৎবর্তী অঞ্চলে, পীড়িত, উপেক্ষিত, দলিত বনবাসীরা হবে এই প্রেমযাত্রার, ক্রান্তিযাত্রার পুরোধা। অথচ প্রেমের ক্ষেত্র পুরীধামে, জগন্নাথের মন্দিরের

অঙ্গনে তো এক শ্বেতাঙ্গিনী ভগ্নীকে প্রবেশ করতে দেয়নি পাণ্ডারা—বিনোবাও প্রবেশ করেননি ; প্রেমের ক্ষেত্রে অ-প্রেমের উদয় দেখে সেদিন তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ আর ব্যথা নেই—আজ শুধু আনন্দ—অনাবিল আনন্দ।

এই বনবাসীরা তো তাঁর কাছে ঋষিতুল্য। ঋষি যেমন নিজেকে মালিক মনে করেন না, সত্যের পথে চলেন—ভগবানকেই একমাত্র মালিক মনে করেন—এরাও তাই। তাই তিনি তাদের বললেন, আপনারা ঋষিতুল্য, ঋষির জীবন যাপন করুন! বলুন—এসম্পত্তি, এই জমি—আমার নয়, ভগবানের।

তিনি বনবাসীদেব ঘরে ঘরে যান, অসুস্থ স্ত্রীলোককে সান্ত্বনা দেন, শিশুদের পিঠ চাপড়ান, আবার যেখানে যাঁতায় গম পিষছে কোন বৃদ্ধা—সেখানে তাকে সাহায্য করতে বসে যান। কিন্তু আবার ব্যথা জাগে মনে। এরা অরণ্যচারী, এরা মদ্যাসক্ত। তিনি বলেন—

মদ ছাড়ুন আপনারা, মদ না ছাড়লে তো উন্নতি হবে না।

গ্রামবাসীরা উত্তর দেয়—দেবতার পূজোয় মদ লাগে, আমরা কি ক'রে মদ ছাড়বো?

অমনি বিনোবাজী উত্তর দেন—দেবতার মদের দরকার নেই। আমি অনেক শাস্ত্র পড়েছি—দেবতা চান পত্রং-পুষ্পং-ফলং-তোয়ং। ক্রান্তির ফল ফলছে উড়িষ্যার অরণ্য-প্রান্তরে। সর্বস্বদানী গ্রামের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে, বিনোবাজী সেই জমি বিলিয়ে দিচ্ছেন গ্রামবাসীদের মধ্যে। লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি পাচ্ছে প্রতিটি পরিবার।

ঘুরতে ঘুরতে বিনোবা এলেন কুজেন্দ্রী গ্রামে। এখানে উড়িষ্যার নিষ্ঠাবান সেবক শ্রীবিশ্বনাথ পট্টনায়ক এক আদর্শ গ্রাম তৈরী করেছেন। বিনোবাজী গ্রামে ঢুকে দেখলেন, গ্রামের সকলের পরনে হাতেকাটা ও হাতেবোনা খদ্দরের কাপড়। ঘরে ঘরে উঠছে চরকার গুঞ্জন, বোনেরা কাটছেন সূতো, ভাইয়েরা বুনছেন তাঁত।

এক বাড়িতে গিয়ে দেখেন, একটি দশ বছরের বালক বুনছে তাঁত, আর তারই বোন তাকে সাহায্য করছে। বিনোবাজী দেখে চমৎকৃত হলেন। এই তো শাসন মুক্তির গ্রাম, স্বরাজের গ্রাম। এখানে একটি বালকও পরশ্রম-নির্ভর পরগাছা নয়, এই গ্রামে এখন চাই শিক্ষা। আমাদের ভারতে পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল। শৈশবে ছেলে শিখত বাপের ব্যবসা, আবার জ্ঞানীরা এসে শেখাতেন বিদ্যা, এই দুই শিক্ষায়ই গ্রাম উন্নত হ'ত। কিন্তু আজ তো সে শিক্ষা নেই। বিনোবাজী সেই শিক্ষাদানের পক্ষপাতী।

আদর্শ গ্রাম কুজেন্দ্রী ছেড়ে তিনি চললেন। শুধু কুজেন্দ্রী তেই নয় ভারতের গ্রামে গ্রামে এমনি হওয়া চাই। আর সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই তো তাঁর এই অভিনব পদযাত্রা।

গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নতুন পথ তৈরী হয়েছে, সেই পথেই চললেন।

পাপড়াহাণ্ডী গ্রাম পড়ল পথে। সেখানে আগস্ট আন্দোলনে শহীদ হয়েছিল ১৩ জন গ্রামবাসী। বিনোবা সেই শহীদ ক্ষেত্র দেখতে চললেন। দেখে এসে গ্রামবাসীদের বললেন—

জগত আপনাদের বীরত্বের কাহিনী না জানলেও, ভগবানের কাছে আপনাদের বীরত্ব পৌঁছে গেছে। আপনাদের মতো অসংখ্য বীরের ত্যাগের ফলেই দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন এ স্বরাজ কেবল দিল্লী ও কটক অবধি পেঁাছেছে, গ্রামে গ্রামে এখনো এ স্বরাজের উদয় হয়নি। ইংরেজ মালিক গেছে, কিন্তু ছোট ছোট মালিক এখনো কায়েম আছে। গ্রামের পর গ্রামে যখন মালিকানা ঘুচে যাবে, তখনই আসবে প্রকৃত স্বরাজ।

নবরঙ্গপুরে তিনি বললেন বুনিয়াদী শিক্ষার কথা—

আমি চাই আমাদের ছেলেরা ব্রহ্মবিদ্যার গান গাইতে গাইতে হাতে ঝাড়ু নিয়ে মেথরের কাজ করবে, খেতে পরিশ্রম করবে। আজকের বিদ্যায় তো হস্তশিল্প নেই, ব্রহ্মবিদ্যাও নেই।

উড়িষ্যায় ২৩০ খানি সর্বস্বদানী গ্রাম পেয়েছেন বিনোবাজী, আর ৬১,০০০ একর ভূদান লাভ হয়েছে। কিন্তু এ শুধু গঞ্জাম আর বালেশ্বর জেলায়। কোরাপুট জেলায় এক অভিনব ব্যাপার ঘটে গেল। জমির পর জমি—গ্রামের পর গ্রাম দান চলতে লাগল। ক্রান্তির স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে, আগুন জ্বলছে চারদিকে—একথা বোঝা গেল।

ভূদানযজ্ঞের পরিণতি গ্রামদান—আর তারই অপূর্ব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে গ্রামে গ্রামে। সর্বোদয় সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে।

বিনোবাজী সর্বস্বদানী গ্রামগুলির জন্য পাঁচটি সূত্র স্থির ক'রে দিলেন।

মনে করতে হবে, জমির মালিক ভগবান। ভগবানের অধীনে গ্রামবাসী জমির ট্রাস্টী। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না।

পরিবারে যে ক'জন মানুষ—সেই অনুসারে জমি বেঁটে দিতে হবে। জমিতে পরিবারের সবাই খাটবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিবারের লোকসংখ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবার জমির বণ্টন হবে। প্রতি গ্রামে থাকবে সামূহিক জমি। গ্রামবাসীরা চাইলে কয়েক বছর পরে সমগ্রভূমিই সামূহিক হবে, সমগ্রভাবে সেখানে চাষ হবে। এখন ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক পৃথক খেতে চাষ হবে বটে, কিন্তু পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। তারপরে গড়ে তুলতে হবে গ্রামশিল্প। তুলোর চাষ যেমন করবে গ্রামের মানুষ, তেমনি চরকা কেটে সুতো তৈরী করবে, তাঁত বুনবে। অন্যান্য জিনিসও তৈরী হবে এখানে। গ্রামে ব্যক্তিগত দোকান থাকবে না। একটি মাত্র দোকান থাকবে ; সেটি সকলের। গ্রামে সব ছেলেমেয়েকেই সমানভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে। তাই 'একঘণ্টার বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। সকালে পড়বে ছোটরা আর বিকেলে বড়রা।

গ্রাম নির্মাণের প্রধান আধার জনশক্তি, সেই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে—কাজে লাগাতে হবে। সমস্ত গ্রামের আর্থিক ও নৈতিক দুই উন্নতিই তাদের দ্বারা হবে। গ্রামের ফসল যেমন বাড়বে, তেমনি গো-জাতির সেবারও উন্নতি হবে। দুধ, ঘি বেশি পাওয়া যাবে। জনশক্তিই গ্রাম্য শিল্প গড়ে তুলবে—এমনি করে গ্রামগুলি হয়ে উঠবে শ্রীময়ী—গ্রাম হবে মানুষের শ্মশানক্ষেত্র নয়, মানুষ নারায়ণের মন্দির। উড়িয়্যার কোরাপুট জেলায় সেই সর্বোচ্চ চূড়ার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আর সে-চূড়া আজ আকাশচুম্বী।

কোরাপুট উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমায়। একদিকে তার মধ্য প্রদেশ, অন্যদিকে অন্ধ্ররাজ্য। দশ হাজার বর্গমাইল এর আয়তন। মোট ভূমির আয়তন চৌষট্টি লক্ষ একর। কিন্তু মাত্র চৌদ্দ লক্ষ একর আবাদী জমি, বাকী আটাশ-ত্রিশ লক্ষ একর শুধু জঙ্গল। তাছাড়া আছে বিশ-বাইশ লক্ষ একর পতিত জমি। জেলাটি অনগ্রসর। এখানে শুধু নদী আর পাহাড়। জেলার অধিবাসী আদিবাসী। তারা দরিদ্র। তারা মহাজনের কুচক্রে প'ড়ে উর্বর ভূমি ছেড়ে পাহাড়িয়া অঞ্চলে গিয়ে বাস করে। এখানকার জমি নিকৃষ্ট, তাই তাদের দারিদ্র ঘোচে না। এই দারিদ্র ঘোচাবার চেষ্টা করেছেন কয়েকজন যুবক। এদের কাউকে বা পুলিশের গুলীতে প্রাণ দিতে হয়েছে আগষ্ট আন্দোলনে, কেউ বা কারারুদ্ধ হয়েছেন। তবু এঁদের মধ্যেই বিশ্বনাথ পট্টনায়ক আদর্শ গ্রাম স্থাপন করেন কুজেন্দ্রী। বিনোবাজীর আগমনে সেখানে আরো সাড়া পড়ে গেল। বিনোবাজীর কথায় গ্রামের পর গ্রাম স্বরাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল, তারা গ্রামরাজ বসালো।

১৯৫৭ সালের হিসেবে কোরাপুটে গ্রামদানের সংখ্যা উঠেছে ১৩৯৯ খানিতে। ঐ গ্রামগুলির ভূমির পরিমাণ প্রায় ২৬১১৫৮ একর আর পরিবার সংখ্যা ৪০ হাজার। এই গ্রামগুলিতে ভূমি বিতরণের কাজ চলছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে গ্রামরাজ, চাষবাসের উন্নতি, সেচ ব্যবস্থা, কুটিরশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি—সবই চলছে। আদিবাসী মানুষ, গরীব মানুষ—এইভাবে মহান সর্বোদয়ের সাধনায় মন-প্রাণ নিবেদন করছেন।

ধন্য কোরাপুট, ধন্য তোমার মানুষের দল !

ক্রান্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পেয়েছ তোমরা, আর সেই স্ফুলিঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে ক্রান্তির অগ্নি। এই মঙ্গলময় অগ্নি ছড়িয়ে পড়বে ভারতের দিকে দিকে—ভারতের সঙ্গে জগতও এই অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হবে।

ধন্য কোরাপুট ! ধন্য উড়িষ্যা !

পুরীধামে ২৬শে থেকে ২৮শে মার্চ সর্বোদয় সম্মেলন বসলো। হাজার হাজার কর্মী তাতে যোগদান করলেন। বিনোবাজীর নির্দ্দেশে বহু কর্মী পায়ে হেঁটে বিশ্বশান্তির বাণী প্রচার করতে করতে নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে এলেন। তিনি বললেন—ভূদান যজ্ঞে ভূমিদান মানে বিশ্বশান্তির পক্ষে ভোট দান। উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ভূমি বিপ্লবের প্লাবন ছড়িয়ে পড়লো—

কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর

বিনোবাজী উড়িষ্যা থেকে সেপ্টেম্বর মাসে প্রবেশ করলেন অন্ধ্র প্রদেশে। অন্ধ্রের কর্মীরা ও সরকারী কর্তৃপক্ষ স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন আচার্যকে। অন্ধ প্রদেশেও গ্রামদানের ঢেউ উঠল। অন্ধ্র প্রদেশে মাস তিনেক পরিভ্রমণ ক'রে বিনোবাজী প্রবেশ করলেন হায়দরাবাদে।

১৯৫৬ সালের ৩০শে জানুয়ারী—তিনি প্রবেশ করলেন পোচমপল্লী গ্রামে. পাঁচ বৎসর পূর্বে যেখানে হয়েছিল ভূদান আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত। গ্রামখানা প্রদক্ষিণ ক'রে ভাবে

গদগদ হয়ে গেলেন বিনোবা। গ্রামবাসীদের প্রণাম জানিয়ে তিনি বললেন, পাঁচ বছর আগে এই গ্রামেই আমি অহিংসার দর্শন ও ঈশ্বরের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম। ভূদান আন্দোলন আজ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু ভূদানের উদ্গমস্থান এই ছোট গ্রামটি ভারতের এক মহা পুণ্যস্থানে পরিণত হয়েছে। এতদিন পরে আপনাদের দেখে আমি অপার আনন্দ লাভ করলাম।

দুই মাস হায়দরাবাদের নলগোণ্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে পরিভ্রমণ ক'রে বিনোবাজী আবার অন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ১৩ই মে (১৯৫৬) মাদ্রাজ রাজ্যে গিয়ে পৌঁছলেন। মাদ্রাজের কর্মীরা বিনোবাজীকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর পদযাত্রায়—যোগদান করলেন। ২৭ থেকে ২৯শে মে মাদ্রাজের কাঞ্চীপুরমে সর্বোদয় সম্মেলন হলো। সারা ভারতের কর্মীরা যোগদান করলেন।

মাদ্রাজ রাজ্যে বিনোবাজীর পদযাত্রা চললো ১৯৫৭ সালের ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত। মাদ্রাজের মাদুরা জেলায় তিনি প্রচুর গ্রামদান পেলেন। মাদুরা জেলার গ্রামগুলিই গ্রামদানী গ্রাম-গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রাম—এখানে লোক বসতি যেমন অধিক জমিও তেমন উৎকৃষ্ট এবং বাসিন্দাদের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব রকমের লোকই আছেন।

মাদ্রাজ রাজ্যে পরিভ্রমণ করতে করতে ১৪ই এপ্রিল তিনি ভারতের দক্ষিণ সীমানা কন্যা কুমারীতে পৌঁছলেন। কন্যাকুমারীর সমুদ্র সৈকতে উপবেশন ক'রে কিছুক্ষণের জন্য তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। অদূরে বিবেকানন্দ 'রক'টির দিকে

অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ঐ খানে ব'সে ভারতের মুক্তি কামনার অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দ সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এখানকার প্রেরণা নিয়েই তিনি বিদেশযাত্রা করেছিলেন এবং বিদেশে বেদান্তের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন।

বিনোবাজীও সাক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে কন্যাকুমারীর পবিত্র সান্নিধ্যে সংকল্প গ্রহণ করলেন—

যে পর্যন্ত ভারতে গ্রাম্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা না হবে সে পর্যন্ত তার প্রতিষ্ঠা কল্পে অবিরাম সচেষ্ট ও জাগ্রত থাকব। এর সিদ্ধির জন্য ভগবান আমাদের শক্তি দিন।

মাদ্রাজ রাজ্যে পরিভ্রমণ শেষ ক'রে ১৮ই এপ্রিল (১৯৫৭) বিনোবাজী কেরলে প্রবেশ করলেন। কেরল তখন কম্যুনিষ্ট শাসিত প্রদেশ। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ও রাজ্যপাল বিনোবাজীকে স্বাগত অভিনন্দন জানান ও পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন।

অনেকের ধারণা ছিল কেরলে কম্যুনিষ্ট সরকার, কি জানি কেমন সহযোগিতা করেন; কিন্তু বিনোবাজীর কাছে কেরল সরকারও যা মাদ্রাজ সরকারও তাই। নির্দলীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন এবং সর্বমানবের প্রতি সমান প্রেমসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে কেউ শত্রু নয় কেউ মিত্র নয় সকলেই তাঁর কাছে সমান। কম্যুনিষ্ট সরকার এবং কর্মীরাও সহযোগিতা করতে লাগলেন। কেরলে গ্রামদানের ঢেউ উঠল। কয়েকমাসের মধ্যেই পাঁচশতের মত গ্রামদান পাওয়া গেল। কেরলের বিশিষ্ট নেতা কেলপ্পনজী ভূদান আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

কেরলের কালাডীতে মে মাসে সর্বোদয় সম্মেলন বসলো। বিনোবাজী ঘোষণা করলেন—

সন্ সত্তাবনমেঁ হো স্বরাজ
সব্‌কী ধরতী সব্‌কা রাজ

সাতান্ন সাল ভারতের যুগসন্ধিক্ষণ। ১৭৫৭ সালে ভারত পরাধীন হয় পলাশীর প্রান্তরে। ১৮৫৭ সালে ভারতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের নামে গণ-বিদ্রোহ হয়। আর ১৯৫৭ সালে ভারতের জনগণ ভূমিবিপ্লব সম্পন্ন ক'রে প্রকৃত স্বরাজ লাভ করবে।

কেরল থেকে ২৩শে আগষ্ট (১৯৫৭) তিনি প্রবেশ করলেন মহীশূর রাজ্যে। মহীশূরের 'ইয়েল ওয়ালে' ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর অখিল ভারত সর্বসেবা সংঘের পরিচালনায় সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে কংগ্রেস কম্যুনিষ্ট প্রজা সমাজতন্ত্রী সব দলেরই নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। সকলেই বিনোবাজীর গ্রামদান আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই কাজে তাঁদের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

বিনোবাজী বললেন, এ কাজে এখন পর্যন্ত তিন হাজার গ্রামদান পাওয়া গেছে। সারাভারতে পাঁচ লক্ষ গ্রাম, এই পাঁচ লক্ষ গ্রামেই পৌছাতে হবে ভূদানের বাণী। নতুন সমাজ গঠনের সংকল্প গ্রহণ করাতে হবে পাঁচ লক্ষ গ্রামে। এরজন্য চাই কমপক্ষে ৭০ হাজার স্বয়ং সেবক। এঁরা হবেন শান্তিসৈনিক এবং সেবা সৈনিক।

মহীশূর থেকে ২৩শে (১৯৫৮) মার্চ তিনি প্রবেশ করলেন

মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের কর্মীরা স্বাগত জানিয়ে উপহার দিলেন ১৫৭ খানা গ্রামদান।

মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত তীর্থস্থান পন্ঢরপুরে সর্বোদয় সম্মেলন বসলো—৩০শে মে থেকে ১লা জুন (১৯৫৮)। মহারাষ্ট্রে পাঁচ মাস পরিভ্রমণ ক'রে তিনি প্রবেশ করলেন গুজরাটে। গুজরাট মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান। ভূদানের কাজও সেখানে ভাল ভাবে চলছিল। গুজরাট থেকে বিনোবাজী আজমীর গেলেন। আজমীরে ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ (১৯৫৯) সর্বোদয় সম্মেলন বসলো।

আজমীর থেকে বিনোবাজী চলে গেলেন পাঞ্জাবে। পাঞ্জাব থেকে ২২শে মে প্রবেশ করলেন কাশ্মীর রাজ্যে। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী এসে স্বাগত জানালেন। কাশ্মীরে তখন চলছিল বন্যা। সকলে নিষেধ করছিলেন পদযাত্রা করতে কিন্তু বিনোবাজী সমানে চালিয়ে গেলেন তাঁর পদযাত্রা—তের হাজার ফুট উচ্চ পীর পাঞ্জাল অতিক্রম ক'রে তিনি চলে গেলেন।

কাশ্মীরেও তিনি ভূমিদান পেলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রেমলাভ করে ফিরে এলেন কাশ্মীর থেকে পাঞ্জাবে, সেপ্টেম্বর মাসে। পাঞ্জাবের অমৃতশরে অখিল ভারতীয় সাহিত্যিক সম্মেলন আহুত হলো। এই সম্মেলনে ভারতের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকগণ যোগ দিয়েছিলেন। বিনোবাজী তাঁদের কাছে 'সাহিত্যের ধর্ম' ব্যাখ্যা করেন। এই অমৃতশরেই তিনি ঘোষণা করেন—

এতদিন তিনি জনবাস বা বনবাস করেছেন, এখন তিনি

অজ্ঞাত বাস করবেন। তাঁর পদযাত্রার কার্যক্রম ৪।৫ দিনের বেশী একসঙ্গে তৈরী হবে না, সংবাদপত্রে তাঁর খবর প্রকাশিত হবে না। তিনি জনতাত্মার গভীরে প্রবেশ করতে চান এই জন্যই তাঁর এই অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন।

এতদিন পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তিনি যে প্রদেশে থাকতেন সেই প্রদেশেই সর্বোদয় সম্মেলন হ'ত এবার তিনি জানালেন তাঁকে বাদ দিয়েই যেন সর্বোদয় সম্মেলন করা হয়। তিনি 'মুক্ত-বিহার' করতে চান। সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন হ'লে সেই অনুযায়ী তাঁর পদযাত্রার কার্যসূচীও কয়েক মাস আগে থেকেই তৈরী করতে হয়। তিনি তা চান না, তিনি চান 'স্বচ্ছন্দ-বিহার'।

তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ১৯৬০ সালের সর্বোদয় সম্মেলন বসলো গান্ধীজীর পবিত্রস্মৃতি-বিজড়িত সেবাগ্রাম আশ্রমে। তিনি বললেন—বাপুর প্রয়াণের ১২ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এবার সেখানেই সম্মেলন হোক। কর্মীরা যেন নিজ-নিজ প্রদেশ থেকে পায়ে হেঁটে সম্মেলনে যোগদান করেন। যাঁরা তা পারবেন না তাঁরা অন্ততঃ নিজেদের প্রদেশের সীমার ৫০ মাইল আগে থেকে হেঁটে এসে গাড়ীতে উঠবেন এবং সেবাগ্রাম থেকে ৫০ মাইল দূরে নেমে হেঁটে এসে রাষ্ট্র পিতার পবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। এই পদযাত্রা কালে তাঁরা সর্বোদয়ের বাণী ও বিশ্বশান্তির কথা প্রচার করবেন।

২৬শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ (১৯৬০) সেবাগ্রামে সর্বোদয় সম্মেলন বসলো। দীর্ঘদিন পর বিনোবাজীর অবর্তমানে এই প্রথম

সর্বোদয় সম্মেলন, সবাই তাঁর অভাব অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু আর একদিক থেকে এই সম্মেলনে প্রেরণা যোগাতে লাগল মহাত্মাজীর পবিত্র সান্নিধ্যের স্মৃতি। তাই কর্মীরা রাষ্ট্রপিতার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ক'রে নতুন বল নিয়ে ফিরে এলেন।

৮ মাস পাঞ্জাবে পদযাত্রা করার পর বিনোবাজী ৮ই এপ্রিল উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাবের এই পদযাত্রাকালে তিনি ১৩৬৭ একর ভূমি দান পেয়েছেন আর পেয়েছেন ১৬টি সম্পূর্ণ গ্রামদান। সম্পত্তি দান হিসেবে পেয়েছেন ৫০ হাজার টাকা।

এক জলন্ধর জেলায়ই ৪০ হাজার সর্বোদয় পাত্র বসান হয়েছে, অন্যান্য জেলায় ২১ হাজার।

অনেকেরই ধারণা ছিল পাঞ্জাবের মতো সমস্যা কণ্টকিত ও উদ্বাস্তু প্রপীড়িত প্রদেশে বিনোবাজীর পদযাত্রায় কোন সুফল পাওয়া যাবে না। কিন্তু উপরের বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁদের অনুমান ঠিক ছিল না।

বিনোবাজী এতদিন 'অজ্ঞাতবাসে' অর্থাৎ অনিশ্চিতভাবে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর কাছে চম্বল এলাকা থেকে ডাক এল। এই এলাকা ৮০০ বর্গ মাইল জুড়ে ৭০০ বৎসরের পুরাতন একটি ভীতিপ্রদ ডাকাতের এলাকা। মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের একটি বিস্তির্ণ অঞ্চলে এদের অভিযান ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে যারা বহু বছর ধ'রে লুণ্ঠন ও নরহত্যা ক'রে আসছে যাদের বশে আনার জন্য শেরশাহের আমল থেকে সরকার পক্ষ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আসছেন। বহু কুশলী পুলিশ অফিসার

যাদের গ্রেপ্তার করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন তাদেরই পক্ষ থেকে ডাক এসেছে বিনোবাজীর কাছে।

বিনোবাজী রাজী হলেন সেই ভয়ঙ্কর অঞ্চল পরিদর্শন করতে। ধীরে ধীরে তিনি এগুতে লাগলেন চম্বলের দিকে।

ডাকাত অধ্যুষিত অঞ্চলে

পদযাত্রা তো থামে না, ক্লান্ত হন না তো পদযাত্রী পথিক। ধর্মযাত্রা তো শেষ হয় না, থামেন না তো ধার্মিক। প্রেমযাত্রারও শেষ নেই, প্রেম তো অসীম, অনন্ত। শেষ নেই ক্রান্তিযাত্রার—ক্রান্তির স্ফুলিঙ্গ উড়ে উড়ে পড়ে, আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আর গ্রামময় ভারত সেই আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়, গ্রাম-সমাজ, গ্রামরাজ নতুন ক'রে গড়ে ওঠে। আর তা গড়ার কাজে আত্মনিবেদিত-প্রাণ বিনোবাজী আর তাঁর সাথীর দল এগিয়ে যান—ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

অবশেষে ১৩ই মে (১৯৬০) তাঁদের পদধ্বনি বেজে উঠল চম্বলে, চম্বল উপত্যকায়। পাহাড় ঘেরা উপত্যকা, মাঝে মাঝে মধ্য প্রদেশের গিরি সংকট। এইখানে এই নিবিড় অরণ্যে, দুর্গম গিরির নিভৃতে থাকে দস্যুদল। বহুদিন থেকেই এটাই তাদের আশ্রয় স্থল। বর্গী আর পিণ্ডারিদের প্রধান ঘাঁটি ছিল এখানে। এই গিরিউপত্যকাই আবার ছিল সিপাহীবিদ্রোহের, তাঁতিয়া টোপের লীলাক্ষেত্র, এইখানেই বিপ্লবীরা তাঁদের আজাদ এলাকা সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন। এখানে এখন শুধু ডাকাতদের আস্তানা।

কিন্তু ডাকাত হলেও তারা মানুষ, তারা ডাকাতি করে, আবার গার্হস্থ জীবনও যাপন করে। তারা ধার্মিক, এক হাতে রাইফেল, আর এক হাতে জপমালা নিয়ে বেরোয়, লুটতরাজ করে। তারা বুঝি সজ্জন—কিন্তু অভাবে তারা অসৎজন, আবার প্রতিশোধ গ্রহণেও তারা নিষ্ঠুর। এই চম্বলেই ছিল বিখ্যাত ডাকাত মানসিংহ—আছে রূপা, চরণা, মল্লা, লক্ষণ, সুলতানা, গুজার। তারা ডাকাতি করতে চায় না, নরহত্যা করতে চায় না। তাই বিনোবাজীকে চিঠিও লিখেছিল। বিনোবাজী তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, হিংসার পথ ছাড়তে বলেছিলেন। তারা জানিয়ে ছিল, সরকার যদি ক্ষমা করেন, তবেই তারা তা করবে। তারপর একদিন মানসিংহের পুত্র তহশীলদার সিংহ জেল থেকে বিনোবাজীকে পত্র দেন। আমার তো ফাঁসী হবেই তার আগে আমি একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি না আসতে পারলে কোন প্রতিনিধি পাঠালেও চলবে। বিনোবাজী তখন যেতে পারেননি প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন জেলে। আজ তিনি চম্বলে নিজেই এসেছেন।

চম্বলের গিরিগুহায় বেজে উঠল প্রেমযাত্রী, ক্রান্তিযাত্রীর পদধ্বনি। বিনোবাজীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল—আপনি কি ডাকাতদের অঞ্চলে যাবেন?

বিনোবাজী উত্তর দিলেন, ডাকাতদের অঞ্চলে যাবার আমার ইচ্ছে নেই।

—কিন্তু ভিন্দ মুরৈনা তো ডাকাতদেরই অঞ্চল।

—আমি সেখানে অবশ্যই যাব, কিন্তু আমি তো সে-অঞ্চলকে

সজ্জনদের অঞ্চল ব'লে জানি। সমগ্র ভারত যেমন সজ্জনদের দেশ, ঐ অঞ্চলটিও তেমনি। কে ডাকাত আর কে ডাকাত নয়, তার মীমাংসা একমাত্র ভগবানই করবেন। যাকে ডাকাত বলা হয়, একমাত্র সে-ই ডাকাত এমন কথা ঠিক নয়। আরও অনেক ডাকাত আছে এবং থাকা সম্ভব, যারা পরমেশ্বরের চোখে এদের চেয়ে বেশি দোষী প্রমাণিত হবে।

আপনি কেন যাচ্ছেন? তাঁকে শুধালে মানুষ।

তিনি বললেন, আমি তো কোন সমস্যা সমাধান করতে যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি সজ্জনদের সেবক হিসেবে।...আমি তো বহুবার বলেছি, একদিন আমার সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ এসে গেছেন, কিন্তু সমস্যা তো রয়েই গেছে। তাই আমি মনে করি না যে, আমাকে দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হবে। তবু মানুষ চায় সমাধান হোক ডাকাত-সমস্যার, পুলিশও তাই চান।

পুলিশ বিভাগ আনন্দিত, তাঁরা বললেন, তিন বছর আগে আমরাই বিনোবাজীকে আনার চেষ্টা করেছিলাম। এবার তিনি নিজেই এসেছেন! তিনিই সমাধান করে দেবেন। অভিশপ্ত চম্বল শান্তিপূর্ণ চম্বলে পরিণত হবে।

বিনোবাজী তো সমস্যার সমাধান করতে আসেন নি, তিনি এসেছেন সজ্জন দর্শনে—সকলের মধ্যে ভগবদ্দর্শনে। তাই তিনি বললেন, আমি সকলকে সমান ভালবাসি।...

সকলকে সমান ভালবাসা, সকলের মধ্যে ভগবদ্দর্শন—এরই ফলে আমার কথায় লোকের বিশ্বাস আসে।

সেই বিশ্বাসের কথাই জানেন বিনোবা, সেই তাঁর মনোবল। তিনি জানেন এ-সমস্যা সমাধান করবেন ভগবান।

চম্বলে প্রবেশের পর তিনি পুলিশদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বুঝান—

"পুলিশের কাজ অত্যন্ত কঠিন। তাদের অন্তর কোমল রাখতে হবে এবং হাতে কঠোর কাজ করতে হবে। পুলিশের চেয়ে সাধুসন্তদের কাজ সহজ। তাদের হৃদয় নরম, হাতও নরমই থাকে। পুলিশকে মাত্রা রক্ষা ক'রে চলতে হয়। সৈনিকদের কাজও এত শক্ত নয়। তাদের কাছে কেউ কৈফিয়ৎ চাইবে না যে বিরোধীদের ওপর এত কঠোর ব্যবহার করা হ'ল কেন? সৈন্যদের পক্ষে জয়লাভই যথেষ্ট। কিন্তু পুলিসের ব্যাপার আলাদা। যেখানে ৫ সের শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক, সেখানে সাড়ে ৫ সের শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। সেজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হয়। এ কাজ যোগ সাধনার মতোই কঠিন। অন্তর কোমল, উপর-উপর কঠোর। আবার মাত্রার প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে। বাবা-মাও সন্তান পালনের সময় এই রকম ব্যবহারই ক'রে থাকেন।

"জনসাধারণের সেবার জন্য নিজেকে বিপদাপন্ন করবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা, উৎপীড়কদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করা এবং তাও যেন অতিরিক্ত না হয়—এ তো যোগীপুরুষদেরই কাজ।

"পুলিশের কাছে আমি চাইব যে, তাদের বুদ্ধি যেন সমত্বযুক্ত হয়। তাদের মধ্যে যেন ক্ষোভ না থাকে। তারা হিসাব ক'রে কাজ করবে। সর্বদা বন্দুক চালনা তাদের কাজ নয়; অপরকে রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন করাও তাদের কাজ। এইজন্য পুলিশকে সাধুপুরুষ ও বীরপুরুষ দু'য়ের ভূমিকাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সেনা বাহিনীকে শুধু বীরপুরুষের কাজ করতে হয়। কেবল ৩২" ইঞ্চি বুকের পাটা হ'লেই চলবে না। প্রশস্ততার সঙ্গে সঙ্গে গভীরতারও প্রয়োজন।

"এখন আমার যে কাজ তাতে আপনারা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন? এক তো আমি যেখানে যাবো আপনারা আমার পিছনে পিছনে ঘুরবেন না। যে-ই আমার কাছে আসতে চাইবে সে-ই যেন নির্ভয়ে আসতে পারে। জানি না কে-কে আমার কাছে আসবে। যখন আপনাদের হাতে তাদের সমর্পণ করা হবে তখন যেন কঠোর ব্যবহার না করেন। কেউ যদি বধ-যোগ্য হয় তবে বিচারক তাকে ফাঁসী দেবেন। যার অনুতাপ হবে সে শাস্তি এড়াতে চাইবে না। কাউকে ক্ষমা করবার মালিক ভগবান। ভগবান তুল দণ্ডে মেপে শাস্তি দেন। ভগবান শাস্তি দেন সংশোধনের জন্য।...কাল আপনাদের ডেপুটি মিনিষ্টার ঠিকই বলেছেন। যারা আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হবে না।

"আপনাদের কাজ ও আমার কাজ একই। আপনারা এমন হবেন যে, প্রথমে মাখন শেষেও মাখন, মাঝখানে কঠোর। খুব ঠাণ্ডা পড়লে মাখন কিছু শক্ত হয় কিন্তু তা প্রস্তরে পরিণত হয় না। পুলিশের শক্তি অগ্নি না হয়ে বরফের সমান হোক।

"আপনাদের গীতা, রামায়ণ ও গ্রন্থসাহেব অধ্যয়ন করা উচিত। আপনারা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের সৈনিক। রামচন্দ্রের সৈন্যেরা কি মদ খেতে পারে? তারা ফল খেয়ে জীবন ধারণ করে। আপনাদের সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করতে হবে। সত্যনিষ্ঠা ও কর্তব্য পালনের মর্যাদা বজায় রেখে চলতে হবে। আপনাদের কাজ অত্যন্ত কঠিন। প্রতি পদক্ষেপে আপনাদের পরীক্ষা। ভগবান করুন আপনারা যেন দেশের সত্যকার সেবকে পরিণত হতে পারেন।"

এমনি ক'রে পুলিশদের বুঝিয়ে তিনি চলতে লাগলেন। তাঁর আশা যাদের টানে তিনি এখানে এসেছেন, তারা আসবেই।

এ ধরণের পরিকল্পনায় সবাই বিস্মিত, এমন কি পুলিশরাও শঙ্কিত হয়ে উঠল—আর বিনোবাজীর অভিযানে আতঙ্কিত হ'ল সাধারণ মানুষ। কিন্তু দস্যুর আত্মশুদ্ধির কাহিনী কি তারা ভুলে গেল ?

অঙ্গুলীমাল না বুদ্ধের উপদেশে শুদ্ধ হয়ে নবজীবন পেয়েছিল? তারা ভুলতে পারে, ভোলেননি বিনোবা। তিনি ভারতের ঐতিহ্যবাহী সত্যদ্রষ্টা ভারত-পুরুষ—তিনি কি ক'রে ভুলবেন ?

তিনি যাদু জানেন না, তবু এ যেন যাদুরই খেলা।

অবতার ও কানাইয়া—নামজাদা ডাকাতের সর্দার এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ল, সপরিবারে এল লিচ্ছি।

কি চায় তারা ?

চায় এই গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে, চায় নবজীবনের পথে চলতে। বিনোবাজী তাদের কোল দিলেন।

কিন্তু তিনি বললেন না, অপরাধ স্বীকার করলে তাদের ক্ষমা করা হবে, বা লঘুদণ্ড দেওয়া হবে। তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন—পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সবরকমের দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বিনোবাজীর কথায় তারা সম্মত হ'ল। তারা এসে লুটিয়ে পড়তে লাগল তাঁর পায়ে, তাঁর শরণাগত হ'ল।

বিনোবার শিবিরে সে কি দৃশ্য !

মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ আর রাজস্থানের হোমরা-চোমরা পুলিশ অফিসারেরা মোতায়েন, আর সেই শিবিরে তাঁদেরই

সঙ্গে আছে ডাকাতরা। এতদিন যারা পরস্পরের কাছে ছিল হিংস্র জন্তুর মতো, আজ তারা বন্ধু, মিতা, বন্ধুর মতোই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, হাতে হাত মেলাচ্ছে।

কিন্তু এই যে অহিংসার যাদু, এতো সবাই মানতে রাজী নয়। বিনোবাজীর অভিযান নিয়ে উঠল বহুস্থানে তর্ক-বিতর্ক। কারও মত—বিনোবাজী একি করছেন? পুলিশের কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন? আবার কেউ বললে—আইন-শৃঙ্খলা তো জলাঞ্জলি দিচ্ছেন বিনোবাজী।

বিনোবাজী শুধু জানালেন—ফৌজদারী দণ্ডবিধি তার কাজ করবে, পুলিশ তার কাজ করবেন—তিনি শুধু এসেছেন সজ্জন দর্শনে। তাদের হৃদয়ের পরিবর্তন করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর নেই।

তিনি বললেন যারা আত্মসমর্পণ করেছে, যাতে তাদের সকলের প্রতি ন্যায় বিচার হয়, তা আমরা চেষ্টা করব। আমরা উকিল দিয়ে সাহায্য করব। তাদের ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা করব। যুদ্ধ পর্ব শেষ হয়েছে, এখন শান্তি পর্ব শুরু হবে।

ক্রমে ১৯ জন কুখ্যাত ডাকাত ও ডাকাত দলের অধিপতি আত্মসমর্পণ করল। তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও তারা ফিরিয়ে দিল। তাদের দলগুলোও তারা ভেঙ্গে দিল।

...তিনি এখানে এসে আর একবার অহিংসার সাক্ষাৎ পেলেন। অহিংসায় বিশ্বাস প্রথমে ছিল তাঁর বুদ্ধিগত, এখন দেখলেন তার বাস্তব চিত্র। আগে ছিল হৃদয়ের মধ্যে আবদ্ধ এখন দেখলেন বাস্তব মূর্তি।

তিনি দস্যু-অধুষিত ভিন্দের নাম রাখলেন 'ধর্মক্ষেত্র', এই ভিন্দক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করার কাজ তো সহজ নয়। সহজ তো নয় দুর্জন থেকে সজ্জনমণ্ডলী গঠন। তাই তিনি চম্বলে যাবার আগে বলেছিলেন—নিষ্কাম সেবক গড়ে তোলাই আমার অভিলাষ। আজ তার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে—একদল নিষ্কাম সেবক গঠন, ভূদানের কাজ ও ডাকাত-সমস্যার সমাধান। ডাকাতদের সমস্যা—ভীরুদের সমস্যা, কৃপণের সমস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের সমস্যা। কৃপনই চোরের জন্মদাতা।

ডাকাত দমন করা হয়েছে শত-শতবার কিন্তু ডাকাত-বৃত্তি তো দমন করা হয় নি। এই জন্য অস্ত্রবলে ডাকাত-দমনের পদ্ধতি ভুল। ...

সেই ভুলটা ধরিয়ে দিতেই তিনি গিয়েছিলেন সেখানে।

ভুল ধরাও পড়ল।

অভাবে, দারিদ্র্যে, পীড়নে, প্রতিহিংসায় যারা বিদ্রোহী হয়েছিল, যারা ডাকাত-বৃত্তির জন্যই ডাকাত-বৃত্তি নেয়নি বাধ্য হয়ে নিয়েছিল, তারাই ছুটে এল বিনোবাজীর প্রেম, মৈত্রী ও শান্তির বাণী শুনতে। তারাই এসে আত্মসমর্পণ করলে, অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিলে, বললে—এতদিন পরে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।

কেউ বললে, এতদিন পরে নিশ্চিন্তে ঘুমোব।

বিনোবাজী জগতকে দেখিয়ে দিলেন, ডাকাত ডাকাত নয়। ডাকাত অভাবী মানুষ, গরীবলোক। ডাকাত-বৃত্তি যাদের তারাই আসল ডাকাত। সে ডাকাত আছে বম্বেতে, দিল্লীতে,

কলকাতায়। আমাদের মধ্যে গণ্যমান্য যারা তাদের মধ্যেই তো আছে বড় বড় ডাকাত। তারা ডাকাতি করে আর তাদের নামডাক বাড়ে, তাদের তুলনায় ভিন্দ ও মুরৈনার ডাকাতরা তো কাঁচা ডাকাত।

কিন্তু এই অভাবী মানুষদের অভাব তো দূর করতে হবে। এতদিন অভাবের চাপে যে দুষ্ক্রিয়া ছিল পেশা, আজ তো আর তা চলতে পারে না। তিনি তাই বললেন—

ভূমিহীন ডাকাতদের দিতে হবে ভূমি।

তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের সাহায্য দিতে হবে।

এসব কাজের ভার নেবেন গান্ধী-স্মারক নিধি, হরিজন সেবক সংঘ, কস্তুরবা-স্মারক নিধি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। সর্বসেবা সংঘও এগিয়ে আসুন। তাছাড়া আছেন জনগণ, আছেন পুলিশ, আছেন সর্বোদয় কর্মীর দল—তারা একাজ করবেন। তবেই তো ভিন্দক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হবে।

২৩শে মে বিনোবাজী ভিন্দ জেলে গিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের বলেন—

"আপনারা অনুতপ্ত হয়েই এখানে এসেছেন। ভগ্নীরা আপনাদের কাজে আনন্দ প্রকাশ করে 'রাখী' বেঁধে দিয়েছেন। এখন থেকে আপনারা অত্যন্ত নম্রভাবে চলবেন। নম্রতার সঙ্গে কথা বলবেন। কঠোর ভাষা, তিরস্কারের ভাষা পরিত্যাগ করবেন। এতদিন আপনারা ভুলপথে চলেছিলেন কিন্তু এখন তো ঠিক পথ পেয়েছেন। এই পথে দৃঢ়তার সঙ্গে থাকুন। আপনাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন যাঁরা

বাইরে রয়েছেন তাঁদের চিন্তা ভগবানের ওপর ছেড়ে দিন। আমার তো খুবই বিশ্বাস আপনারা ভগবানে নির্ভরশীল হয়ে উঠবেন 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ সাধুরের স মন্তব্য'—গীতা এমন আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে আমার প্রতি অনন্য ভক্তিমান সে পাপী হ'লেও ক্রমে ক্রমে সাধু হয়ে যায়। এই আশ্বাস নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। আমরা ব'লে থাকি—পাপোঽহং পাপকর্মাহং—প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পাপ ক'রে থাকি। সুতরাং আপনাদের ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

"ক্রোধই সব অনর্থের মূল। হাতে অস্ত্র থাকলে ক্রোধের সময় তা ব্যবহার করার ইচ্ছে হয়। শাস্তি তো অস্ত্রেরই হওয়া উচিত। ক্রোধ হ'লে আমরা এমন সব কথা বলি যাতে আমাদের বিরোধীদের মনে আঘাত লাগে। যার হাতে লাঠি থাকে সে রাগের মাথায় লাঠি দিয়ে অন্যের মাথা ভাঙ্গে। কারও হাতে বন্দুক থাকলে সে রাগের সময় বিরোধী লোককে গুলি ক'রে ফেলে। সব কিছুর জন্য দায়ী আমাদের ক্রোধ। সরকারের বিচারালয়ে অপরাধের তারতম্য হয় কিন্তু ভগবানের বিচারালয়ে সকল অপরাধের মানদণ্ডই এক। অস্ত্রের তারতম্যে ফলেরও তারতম্য হয়। অপরাধের জন্য তো অস্ত্রই দায়ী। অস্ত্র হাতে থাকলে অস্ত্র ব্যবহার করার কথাই মনে হয় এবং ক্রোধ ও সঙ্গে-সঙ্গেই এসে পড়ে। অস্ত্রের অপরাধ মানুষের উপর চাপানো হয় কেন?

"সুতরাং আপনারা এবং অন্যান্য বন্দীরা সকলেই ভাই-ভাই। ভাইয়েদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আমি এখানে এসেছি।"

এমনিভাবে তিনি জেলে গিয়ে আত্মসমর্পণকারী ডাকাতদের বোঝালেন, তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করলেন।

তিনি চম্বলে এসেছিলেন ঈশ্বরের ইংগিত পেয়ে। কিন্তু মানুষ ভেবেছিল—বিনোবার এই অভিযান সফল হবে কি?

বিনোবাজী বলেছিলেন—এতো বিনোবার অভিযান নয়,

ভগবানের অভিযান। সফল হোক আর না হোক, তাতে কি আসে যায় তাঁর? ...

তিনি বলেন—এসব যা হয়েছে তা-কি আমার শক্তিতে হয়েছে?

না।

তবে কি আমার সঙ্গীদের প্রযত্নে ঘটেছে?

না।

তবে কি চম্বলের এই ভাইয়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই অহিংসার শরণ নিয়েছেন?

না।

ঈশ্বর এদের হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, এদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করেছেন, এ অভিযান তো পরমেশ্বরেরই অভিযান। তাই তো তিনি একে এমনি ক'রেই সফল ক'রে তুললেন। তাঁর সেবক বিনোবাকে দিয়ে তিনি তা সফল করালেন, বিনোবা হলেন উপলক্ষ্য।

বিনোবাজী বলেন—

আমি এতে কি করেছি? এতো ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি যদি একে নিজের কেরামতি ব'লে মনে করি, তবে ডাকাতেরা তো স্বর্গে চলে যাবে, কিন্তু আমার গতি হবে নরকে।

তিনি আবার বলেন—ওরা সাধারণ মানুষ, সাধারণ ওদের চেহারা, ওদের মধ্যে ক্রূরতা নেই, ভয়ঙ্কর কিছু নেই। শুধু ওরা ভুল পথে গিয়েছিল। পুলিশ ওদের পিছনে লেগে ওদের আরো পাকা ক'রে দিয়েছিল।

এই ভ্রান্ত মানুষকে ঈশ্বরই আজ ফিরিয়ে এনেছেন সত্যের পথে, অহিংসার পথে। তিনি তাঁর সাড়ে ন' বছরের পদযাত্রায় এই পথভ্রষ্ট, ভ্রান্ত মানুষদেরই দেখে আসছেন। অবস্থার চাপে তারা খারাপ, তারা মন্দ। কিন্তু দুর্জন তো তিনি দেখেন নি। তাই তিনি বললেন—

আমাদের এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আমরা যখন উপর থেকে অভিযান চালাই, কোন কাজ হয় না। বিশটি সমস্যার সমাধান হ'লে আবার পঁচিশটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই জন্য মূলে হানতে হবে আঘাত, সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে এই অব্যবস্থা।

চম্বলের ভিন্দ-মুরৈনা অঞ্চলের কাজ সম্পন্ন ক'রে সাধু বিনোবা চললেন ইন্দোর অভিমুখে এবং এখানকার কাজ ঠিক-ভাবে পরিচালিত করবার জন্য ১০ জন কর্মী নিয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন ক'রে দিলেন।

বিনোবাজীর এই অভূতপূর্ব সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই সতস্ফূর্ত অভিনন্দন জানালেন।

এর উত্তরে বিনোবাজী বললেন :—

"চম্বলে যা ঘটেছে তা ঈশ্বরের কৃপা। আমার বিশ্বাস এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ঈশ্বর স্বয়ং। কিন্তু এর জন্য যদি কাউকে প্রশংসা করতে হয় তবে সকলের আগে প্রশংসা করতে হবে শরণাগত ডাকাতদের, তারপর পুলিশদের ; তারপর প্রশংসার পাত্র হবেন আমার সহকর্মীরা। তাঁরা দূর দূরান্তর জঙ্গলে গিয়ে নির্ভয়ে ডাকাতদের সঙ্গে মিলিত হয়ে-

তাদের বুঝিয়েছিলেন। আর সর্বশেষ প্রশংসার পাত্র হলাম আমি—তাও টাকায় এক নয়া পয়সা হিসেবে। এই প্রশংসাটুকুও আমি ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করে মুক্ত হয়ে আজ এখান থেকে যাচ্ছি।"

ইন্দোরে বিনোবা

চম্বল এলাকা থেকে বেরিয়ে ২৪শে জুলাই বিনোবাজী ইন্দোর এসে পৌঁছলেন।

আগে থেকেই তিনি কর্মীদের জানিয়ে রেখেছিলেন যে ইন্দোরকে সর্বোদয় নগরে পরিণত করতে হবে। এবং তার জন্য সারা ভারতের বাছাবাছা কয়েকজন কর্মী কিছুদিন থেকেই সেখানে কাজ আরম্ভ করেন।

ইন্দোরে প্রবেশ করেই তিনি 'পরিচ্ছন্ন ইন্দোর' সপ্তাহ পালন করার নির্দেশ দিলেন। ইন্দোরের সমস্ত রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা আরম্ভ হয়ে গেল। সর্বোদয় কর্মীদের সঙ্গে তিনিও ঝাড়ু হাতে নেমে পড়লেন। দেখতে দেখতে শহরের লোকেরাও এসে যোগদান করতে লাগলেন। ক্রমে ইন্দোর এক আদর্শ পরিচ্ছন্ন শহরে পরিণত হ'ল।

বিনোবাজী বলেন—

"ইন্দোরকে সর্বোদয় নগরে পরিণত করবার জন্য তিন-চার বছরের শিশু এবং অসুস্থ লোক ছাড়া বৃদ্ধ শিশু এবং যুবক সকলেই কাজ করতে হবে। এমনি ক'রে ইন্দোরের এক লক্ষ লোক বাদ দিলেও বাকী তিন লক্ষ লোকের সেবায় ইন্দোর এক আদর্শ নগরে পরিণত করতে হবে।"

তিনি আরও বলেন—

"বোনেরা ঘর পরিষ্কার রাখেন, তারা তা রাখুন কিন্তু বাড়ীর আবর্জনা ফেলবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে একটি ক'রে পাত্র রাখতে হবে। রাস্তার যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা চলবে না। পায়খানা প্রস্রাবখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

... ৪২ বৎসর পূর্বে আমি যখন গান্ধীজীর কাছে আসি, তখন থেকেই আমি সাফাইয়ের কাজ আরম্ভ করি।

সর্বোদয় পাত্রের আলোচনায় তিনি বললেন—

"শিশুরা যখন সর্বোদয় পাত্রে শস্য রাখতে অভ্যস্ত হবে তখনই তারা প্রকৃত দেশ সেবক হবে। শিশুকালে আমার মা তুলসী গাছে জল না দিলে খেতে দিতেন না। এই ভাবে মায়েরা যদি শিশুদের উত্তম অভ্যাস শিক্ষা দেন তবে শিশুরা সর্বোদয় পাত্রে শস্য না রেখে অন্ন গ্রহণ করবে না। মায়েরাই উত্তম নাগরিক গঠন করতে পারেন। প্রত্যেক শিশুকেই সমাজের জন্য কিছু-না-কিছু ত্যাগ করতে শেখান চাই।"

তিনি আরও বলেন,

"সর্বোদয় পাত্রের মাধ্যমে আমাদের দেশের বোনেরা অনেক কাজ করতে পারেন। যে শস্য সর্বোদয় পাত্র থেকে পাওয়া যাবে তা শান্তি সৈনিকদের কাজে লাগান যাবে। আমরা তো বাধ্যহয়ে সরকারকে কর দিয়ে থাকি কিন্তু যে-কাজ জনশক্তির উদ্বোধন করে সে কাজে স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়া চাই। ইন্দোর শহরে মোট ৮০ হাজার পরিবারের বাস। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ১০ হাজার পরিবার সর্বোদয় পাত্র রেখেছেন। বাকী ৭০ হাজার পরিবার যতক্ষণ না রাখছেন ততক্ষণ আমাদের বিশ্রাম করা চলবে না।"

এক ভাই প্রশ্ন করলেন—যে পরিবার একেবারে গরীব সে পরিবার কি ক'রে রোজ পাত্রে চাল রাখবে?

বিনোবাজী বললেন--"যাঁরা দিতে পারবেন না তাঁরা সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন একমুঠো চাল দেবেন বাকীটা তাঁদের প্রতি-বেশীরা পূরণ করে দেবেন। এমনি ভাবে কি গ্রামে কি শহরে কোন একটি পরিবারও থাকবে না যে-ঘরে সর্বোদয় পাত্র থাকবে না। ইন্দোরে যদি আমরা রোজ ৮০ হাজার মুঠো ক'রে শস্য পাই তবে আমরা যা বলবো সরকারকে তাই মানতে হবে।"

"আজ পরিকল্পনা কমিশন আমাদের কাছে পরামর্শ করতে আসেন—তার কারণ কি? কারণ, আমরা কিছু কাজ করেছি। আমরা প্রায় দশ লক্ষ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বেঁটে দিয়েছি। ৪৫ লক্ষ একর জমি আমরা পেয়েছি।"

ইন্দোরে বিনোবাজী শহর পরিচ্ছন্ন করেন, সর্বোদয় পাত্র বসান, সর্বোদয় সাহিত্যের প্রচার করেন, শান্তি সৈনিকের ট্রেনিং দেন—এমনিভাবে দিন কাটতে লাগলো। একদিন হঠাৎ তাঁর নজর পড়লো দেওয়ালে টাঙ্গান সিনেমা পোষ্টারের দিকে। এই সব প্রাচীর-পত্রে আমাদের বোনেদের যে অশ্লীল ভঙ্গীর চিত্র দেখান হয়েছে তা দেখে বিনোবাজী অত্যন্ত মর্মবেদনা পান। তিনি বলে ওঠেন—

"আমাদের বোনেরা কেন এইসব অশ্লীল পোষ্টারের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন না? তাঁরা কেমন ক'রে এ অপমান সহ্য করছেন?"

সেইদিনই জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বললেন—

"আমি ইন্দোরে এসে এত দুঃখ পেয়েছি যে তা ভাষায়

প্রকাশ করতে পারছি না। এখানকার দেয়ালে দেয়ালে যে-সব অশ্লীল চিত্র দেখতে পেলাম তাতে আমার চোখে জল এসে গেছে। পিতামাতারা এসব কেমন ক'রে সহ্য করছেন ? আমার মনে হচ্ছে শান্তিরক্ষা ও শীলরক্ষা এই দুই কাজের দায়িত্ব ভগ্নীদেরই গ্রহণ করতে হবে। মনু বলেছেন—১০ জন উপাধ্যায়ের সমান একজন আচার্য, শত আচার্যের সমান একজন পিতা আর সহস্র পিতার সমান একজন মাতা। যে দেশে মহিলাদের এত সম্মান দেওয়া হয়েছিল, সেই দেশে উন্মুক্ত স্থানে মায়েদের এরকম অশ্লীল ভঙ্গীর চিত্র কেমন ক'রে প্রদর্শিত হয়! কি লজ্জার কথা! এ অবস্থার প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের দেশে বেদকে মাতৃরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, বেদকে মার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ; আর এখন মাতৃত্বের ওপর এমন আঘাত করা হচ্ছে, আমরা তা মুখ বুজে সব সহ্য ক'রে যাচ্ছি! এভাবে কি আমরা প্রগতির পথে এগুতে পারব ?"

এরপর তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় এই সব অশ্লাল পোষ্টার বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান। তিনি সিনেমা কোম্পানী গুলিকে অর্থলোভ ত্যাগ ক'রে অশ্লাল পোষ্টারের প্রচার বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং কর্মিগণকে পরিকল্পনা পূর্বক এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে নির্দেশ দেন।

বিনোবাজীর আবেদনে কয়েকজন ফিল্ম বিতরক ও পরিচালক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁরা বিনোবাজীকে বলেন। "আপনি উপর থেকে এ ধরণের চিত্র বন্ধ করার চেষ্টা করুন।'

উত্তরে বিনোবাজী বলেন,—"আমি উপর ওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলব। এর আগে আমি যা বলেছি তা দিল্লীর কর্তাদের কাছে পেঁাছে গেছে। কিন্তু আমার আশ্চর্য বোধ হয় যে, সবকিছুর জন্যই কি আমরা উপরের দিকে তাকিয়ে থাকব? আমি তো আপনাদের মানুষই মনে করি। গাধার উপর যে কোন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যায়, গাধা তা সহ্য করে; কিন্তু মানুষও তা সহ্য করবে?

"প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে আপনাদের সকলকে আমি নোটিশ দিয়ে রাখছি যে যদি শাসন কর্তৃপক্ষ বা আপনাদের পক্ষ থেকে কোন গাফিলতি দেখা যায় তবে এজন্য অখিল ভারতীয় স্তরে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হ'তে পারে। গত ১০ বছর ধ'রে আমি ভুল পথে পরিচালিত সত্যাগ্রহের বিরোধ ক'রে এসেছি কিন্তু এ সত্যাগ্রহ আমি নিজেই চালাব। সারা ভারতে এই সত্যাগ্রহের মানসিক প্রস্তুতি হয়ে গেছে।

"আপনারা নিজেরা যদি এ সব অশ্লীল প্রাচীর-পত্র অপসারণের ব্যবস্থা করেন তবে ভাল, নইলে সত্যাগ্রহ চলবে। ...

আপনারা ইচ্ছে করলে নিজেদের ঘরের মধ্যে এ সব প্রাচীর-পত্র লাগাতে পারেন কিন্তু নাগরিকদের চোখের উপর এরকম অশ্লীলতা করবার অধিকার কারুর নেই। বাড়ীর দেয়ালের বাইরের অংশ নাগরিক জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ-যুক্ত।"

বিনোবাজীর আবেদনে সাড়া দেখা গেল। ইন্দোরের বৃদ্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে 'সর্বোদয় বানপ্রস্থী মণ্ডল' নামে একটি সমিতি গঠন করা হ'ল। এই সমিতি 'পরিচ্ছন্ন দেয়াল ও

বিশুদ্ধ বিচার' এই আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

আগামী দীপাবলী উপলক্ষে দেয়ালগুলি সাফ্ হওয়ার পর সেখানে যাতে মহাপুরুষদের বাণী টাঙ্গিয়ে রাখা হয় তার জন্য 'বানপ্রস্থী মণ্ডল' এর পক্ষ থেকে শহরের প্রত্যেক নাগরিককে আবেদন জানান হয়।

ক্রমে-ক্রমে এই আন্দোলন ইন্দোরের ন্যায় অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়লো। মধ্য প্রদেশের রায়পুর, বিলাসপুর, ছিন্দওয়াড়া, জব্বলপুর, সিউনী প্রভৃতি শহরে নাগরিকদের সমিতি গঠিত হয়েছে। কোন কোন জায়গায় সিনেমার মালিকগণ স্বেচ্ছায় অশোভনীয় পোষ্টার অপসারিত করেছেন। উত্তর প্রদেশের কাণপুর, আগ্রা, আজমগড়, গোরক্ষপুর, কাশী প্রভৃতি জায়গায়ও সমিতি গঠিত হয়েছে। ক'লকাতায় 'সর্বোদয় বিচার পরিষদ' এ কাজের ভার নিয়েছেন।

ভূপালের জনৈক সিনেমা ব্যবসায়ী বিনোবাজীর এই নৈতিক আন্দোলনের সাফল্য কামনা ক'রে চিঠি পাঠিয়েছেন এবং তাঁর 'হলে' যাতে অশ্লাল সিনেমা না চলে তার ব্যবস্থা করবেন ব'লে জানিয়েছেন। তবে তিনি সরকারকেও শুদ্ধ করার কথা বলেছেন।

আসাম-যাত্রা

ইন্দোরে বিনোবাজীর কাজ আশানুরূপ সাফল্যের সঙ্গে চলাছল এরই মধ্যে আসামে ভাষার প্রশ্নে দাঙ্গা উপস্থিত হ'ল। হাজার হাজার বঙ্গভাষী নরনারী বাড়ী ঘর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করলেন। বহু লোকের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। নানা-ভাবে তাঁদের উপর অত্যাচার করা হ'ল। পণ্ডিত নেহেরু আসাম সফরে গেলেন। অন্যান্য নেতারাও গেলেন। অবস্থা কিছুটা আয়ত্বে এল বটে কিন্তু অশান্তি দূর হ'ল না। গৃহত্যাগীরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে সাহসী হলেন না। দাঙ্গার ভয়ে সর্বত্র বিভীষিকা ছেয়ে রইল। আসাম ও বাংলা থেকে নানালোকের আবেদন যেতে লাগল বিনোবাজীর কাছে। সবাই তাঁকে আসামে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন।

বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে সর্বোদয় কর্মীরা আসাদের দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবা করতে গেলেন। সর্বসেবা সংঙ্ঘ থেকে আশাদেবী আর্যনায়কম্ এলেন, বাংলা থেকে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, কুমার চন্দ্র জানা, শক্তিরঞ্জন বসু, দুর্গাচরণ দত্ত, সৌরেন্দ্র কুমার বসু প্রভৃতিরাও গেলেন। তাঁরা আসামের সর্বোদয় কর্মীদের সহযোগিতায় ৫০টি অঞ্চল থেকে দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় সেবার কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন।

তাঁরাও সেখানে বিনোবাজীর উপস্থিতির প্রয়োজন অনুভব করতে লাগলেন। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুও বিনোবাজীকে আসাম যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন।

আসামের ঘটনাবলির সংবাদে এবং জনগণ ও কর্মীদের আহ্বানে ইতিমধ্যেই বিনোবাজী আসাম যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, এর ওপর আবার প্রধানমন্ত্রীর আবেদন এলো। বিনোবাজী কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন—ভাবলেন যাঁর হাতে সমগ্র দেশের রক্ষার ভার, যাঁর হাতে এত সৈন্য রয়েছে, তিনিও কেন নিজেকে অসহায় ভাবছেন ? তাহ'লে হিংসাশক্তি এক্ষেত্রে কার্যকরী নয় এবং নৈতিক শক্তি অধিক কার্যকরী ব'লে কি প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন ? যদি তাই হয় তবে আর আমার বিলম্ব না ক'রে এখুনি যাওয়া উচিত।

বিনোবাজী আসাম যাওয়ার প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন। যদিও ইন্দোর থেকে আসামের দূরত্ব ১৫০০ মাইল। তবুও তিনি আসাম যেতে রাজী হলেন। প্রতিদিন ১০ মাইল ক'রে হাঁটলেও আসাম পেঁছুতে অন্ততঃ পাঁচ মাস সময়ের প্রয়োজন।

ইন্দোরের কাজের দায়িত্ব সেখানকার কর্মীদের উপর দিয়ে ৩০শে সেপ্টেম্বর বিনোবাজী আসামের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা আরম্ভ করলেন। আসাম যাত্রার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এই ক'টি কথা বলেন—"দেখব, শুনব, শিখব, বুঝব ও ভালবাসব—এই পঞ্চবিধ কার্যক্রম নিয়েই আমি আসাম যাচ্ছি।"

আসাম যাত্রার পথে তিনি পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করবেন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে এজন্য ব্যাপক প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেল। তাঁর পদযাত্রা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"আমি গঙ্গার মত চলবো। গঙ্গার গন্তব্যস্থান সাগর, কিন্তু পথে কি গঙ্গার কোন কাজ থাকে না ? গঙ্গা তাঁর দুই পাশের

জমি সরস করতে করতে, তাকে শস্য-শ্যামল করতে করতে এগিয়ে যায়, আমিও তেমনিভাবে এগিয়ে যাব।"

তেমনিভাবেই বিনোবাজী এগিয়ে যেতে লাগলেন—কঠোর হৃদয়কে কোমল করতে করতে, নীরস প্রাণে রসের ঝরণা বইয়ে দিতে দিতে, কৃপণের মন উদার করতে করতে।

এমনিভাবে ভ্রাতৃদ্বেষ-জর্জরিত হিংসোন্মত্ত আসামে তিনি প্রেম ও শান্তির বারি সিঞ্চন করতে চললেন।

ইন্দোর থেকে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অতিক্রম ক'রে ১০ই ফ্রেব্রুয়ারী তিনি পশ্চিমদিনাজপুর জেলার ইকরছালা গ্রামে পশ্চিমবঙ্গে পদার্পণ করেন। বিহার ও বাংলার সীমা হুল্লায় সর্বোদয় কর্মীগণ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শ্রীযুক্তা আশাদেবী আর্যনায়কম্ প্রভৃতি বিনোবাজীকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি বলেন,—

"শুধু প্রেম নয় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিয়েই আমি বাংলাদেশে প্রবেশ করছি। বাংলার ঋষি-মণীষীদের প্রতি আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের প্রভাব আমার উপর সীমাহীন। উচ্চ চিন্তা প্রবাহে অভিষিক্ত বাংলার প্রতি আমার অন্তরে গভীর প্রেম ও আস্থা রয়েছে।"

ইকরছালায় অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি বললেন,

"ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ হ'ল বীজমন্ত্রস্বরূপ এবং মালিকানার অংশ ত্যাগ সেই লক্ষ্যে পৌছবার তন্ত্র। জল ও বাতাসের মতো ভূমিও মুক্ত থাকা প্রয়োজন। ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা উচিত নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশের দাবিতেই ভূদান-যজ্ঞের আরম্ভ হয়।

প্রতি পরিবারের ৬ষ্ঠ ভ্রাতা ও দরিদ্র নারায়ণের প্রতিনিধি রূপেই আমি এই দাবি উত্থাপন করি। কিন্তু সম্পূর্ণ মালিকানা ত্যাগই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। সম্পূর্ণ গ্রামদানের দ্বারা তা সফল হয়েছে।

"এখন আমার দাবি বিঘাপ্রতি এক কাঠা চাষের জমি—পতিত জমি নয়। আমি এই সামান্য অংশ দাবি করছি কিন্তু এ দান বৃষ্টি বিন্দুর মতো নির্মল ও পবিত্র হওয়া চাই। বাংলা দেশ থেকে আমি খাঁটি সোনা পেতে চাই।...

"যে বাংলা দেশে জমির পরিমাণ ২ কোটি একর, সেখান থেকে ২।৩ লক্ষ একর জমি পাওয়া যাবে না এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না।"

১১ই ফেব্রুয়ারী বাংলার রাজ্যপাল ইসলামপুরে এসে বিনোবাজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর আসাম যাত্রার সাফল্য কামনা করেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শান্তিসেনার কাজের জন্য তাঁর হাতে ২২ হাজার টাকা তুলে দেন।

বাংলাদেশে তাঁর ২৩ দিন পদযাত্রা হ'ল। ৫ই মার্চ তিনি আসামে প্রবেশ করলেন। এবারকার পদযাত্রায় তিনি পশ্চিমদিনাজপুর, দার্জিলিং জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় পরিভ্রমণ করেন।

৮ বছর পর বিনোবাজীর এই দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে পদযাত্রা। এবার তাঁর সভায় লোক সমাগম পূর্ববারের চাইতে অনেক বেশী। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি শহরে তো অভূতপূর্ব জন সমাগম হ'ল। জলপাইগুড়ি শহরে প্রায় ত্রিশ সহস্রাধিক নর-নারী তাঁকে অভিনন্দন জানায়। মধ্যরাত্রি থেকেই দলে দলে লোক শহরের দিকে আসতে থাকে। বেলাকোবা থেকে

জলপাইগুড়ি পর্যন্ত সারা পথে অগণিত নরনারী, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও জয়ধ্বনি ক'রে বিনোবাজীকে স্বাগত জানান। জলপাইগুড়ি পেঁৗছে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন—

"জলপাইগুড়ি জেলা জনে-ধনে ও ভূমিতে সমৃদ্ধ এতে আমি আনন্দিত। আমি আশাকরি এখানে প্রেমসম্পদও যথেষ্ট আছে। শিশুদের মধ্যে আমি যে অনাবিল স্নেহ ও প্রেম লক্ষ্য করেছি, শিশুদের পিতা-মাতার কাছ থেকেও আমি তাই পাব আশাকরি।"

ভারতের অর্থনীতির সমালোচনা ক'রে একদিন তিনি মন্তব্য করলেন—

"ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোটি চৌতলা। তার ভিত্তি বা ভূমিতল হচ্ছে গ্রাম, একতলা হচ্ছে জেলা শহর, দোতলা হচ্ছে প্রাদেশিক রাজধানী, আর সর্বোচ্চ তলা হচ্ছে দিল্লী। উপরের তলাগুলোকে বেশ সাজানো ও শক্তিমান করা হচ্ছে কিন্তু এই চৌতলা কাঠামোর ভিত্তিভূমি যে পল্লীগ্রাম তা চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে···শহরগুলোর অসম উন্নতিতে পল্লীগ্রামের আরও অবনতি ঘটবে।"

জলপাইগুড়িতে তিনি বাংলার সাহিত্যেকদের সঙ্গে মিলিত হন। সাহিত্যিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরে তিনি সর্বোদয়ের আদর্শের কথা বলেন,—

"আমাদের উদ্দেশ্য সরকারী আওতার বাইরে থেকে দেশবাসীকে যথাসম্ভব শাশ্বত মঙ্গলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা। জনগণের মধ্যে জাগরণ এলে ক্ষমতা উপরের তলা থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আসবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে এই মাথাভারী শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন আপনা থেকেই কমে আসবে। এই হ'ল গ্রাম স্বরাজের আদর্শ। জনগণ

যদি না জাগে এবং শক্তি ও ক্ষমতা যদি কেন্দ্রীভূতই থাকে তবে শোষণ ব্যবস্থায় বাধা দেবার কোন উপায় থাকবে না। ...

"আজকাল কোন এক ব্যক্তির কাছে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না থাকলেও কোন বিশেষ দলের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। আমরা চাই এই ক্ষমতার সবটাই জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। জনগণের মধ্যে চেতনা ও চরিত্রের সৃষ্টি না হ'লে জনগণ কেমন ক'রে ক্ষমতা লাভ করবেন? এই চেতনা ও চরিত্রের অধিকারী হ'লে ক্ষমতা তাঁদের হাতে আপনি এসে ধরা দেবে।

"আমাদের কাজ তাই একেবারে নীচুতলা থেকে। কেবল ওপরের তলায় আদর্শ ছড়ালে সে আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। জনসাধারণ যদি এই আদর্শকে একবার বুঝে নিতে পারে তবেই সর্ব-প্রকারের স্বৈরশাসনের ও শোষণের অবসান ঘটবে।

"জনগণের মধ্যে গ্রামস্বরাজের বোধকে জাগ্রত ক'রে দিতে না পারলে দেশের ভিতর থেকেই অসংখ্য রকমের শোষণ দেখা দেবে। গ্রামগুলোকে শোষণ ক'রে ক'রে শহরগুলো ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকবে। ধরা যাক্ এক কলকাতা শহরের কথা। আগে গোটা বাংলাদেশকে শোষণ ক'রে এ বেড়ে উঠেছে—এখন অর্ধেকের বেশী পাকিস্থানে চলে গেছে তার ফলে সবখানি শোষণের টান পড়েছে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গের ওপর। লণ্ডন শহরও বেঁচে আছে শোষণের উপর। সে বেঁচে আছে সমস্ত জগতকে শোষণ ক'রে, কিন্তু ক'লকাতার জগতকে শোষণ করবার ক্ষমতা নেই—তার ক্ষমতা শুধু পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলোকে শোষণ করবার। এক রকমের বৃদ্ধ পশু আছে, যারা নিজের খিদের জ্বালায় আর কিছু না পেয়ে নিজেরই হাত-পা গুলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, ক'লকাতায় অবস্থাও তেমনি হয়েছে।

"শুনেছি যুদ্ধের সময়ে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ গ্রাম্য লোক কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মারা গেছে। আমার মনে হয় এ একটা সাঙ্কেতিক

ঘটনা—কলকাতা যে এমনিভাবে বাংলার গ্রামগুলোকে এবং গ্রাম্য নিরীহ চাষী মজুরদের নিরন্তর শোষণ করছে এ ঘটনার সংকেত সেই দিকে।

"এই শোষণ উপরের তলা থেকে বন্ধ করা যাবে না। আইনের দ্বারা বন্ধ করা যাবে না; এই শোষণ বন্ধ করার উপায় দেশের জনগণকে সর্বোদয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা এবং গ্রাম-স্বরাজের আদর্শকে এক প্রচণ্ড শক্তিরূপে গড়ে তোলা। তখন আর বর্তমানের মতো মাথাভারী সরকারের দরকার থাকবে না। তখন সরকারের আদর্শ আর সর্বোদয়ের আদর্শে বিরোধই থাকতে পারবে না।"

১লা মার্চ বিনোবাজী কুচবিহার শহরে প্রবেশ করলেন; বিরাট জনতা রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। কুচবিহারের মহারাজা বিনোবাজীকে মাল্যভূষিত করলেন।

স্বাগত ভাষণের উত্তর দান প্রসঙ্গে বিনোবাজী বললেন—

"এক সময়ের রাজধানী এই কুচবিহার শহর এখন সংস্কার-ধানীতে পরিণত হোক্। উত্তম সংস্কার শহরে সৃষ্ট হ'লে তা সহজেই জনসাধারণের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।"

প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইন্দোর শহরের কথা বলেন। শহর-গুলোকে যেমন পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে তেমনি মনেরও পরিচ্ছন্ন-তার প্রয়োজন। সেখানে তিনি যে অশ্লীল পোস্টারের প্রদর্শন দেখেছেন তা তাদের চিত্তের অপরিচ্ছন্নতারই পরিচায়ক।

তিনি সমবেত জনগণকে বিশেষ ক'রে মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

"চিত্তের এই অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে আপনারা দাঁড়ান। ইন্দোরে ঐ সব অশ্লীল পোষ্টার পুড়িয়ে ফেলার আন্দোলনে মহিলারাই অগ্রণী হয়েছিলেন।"

২রা মার্চ তিনি চৈতন্য দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে শহর-বাসীদের সঙ্গে হরি-সংকীর্তন ক'রে কুচবিহার শহর পরিক্রমা করেন। বিকেলের সভায় তিনি চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন—

"চৈতন্যদেব ছিলেন সূর্যের মতো। সূর্যের দ্বারা যেমন ঘরের রান্নার কাজ হয় না, কিন্তু যে আগুন দিয়ে রান্না করা হয় তা তারই দ্বারা সৃষ্ট হয়, চৈতন্যদেবও তেমনি প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম না করলেও তাঁর কাজের ফলে দেশে যে ঐক্য-ভাবনা ও প্রেমের সৃষ্টি হয়েছিল তা স্বরাজ আন্দোলনের কাজে বহু লোককে প্রেরণা জুগিয়েছে, বহু সেবকের সৃষ্টি করেছে।"

৪ঠা মার্চ তুফানগঞ্জে বিনোবাজীর পশ্চিম বাংলার শেষ শিবির। ৫ই মার্চ সকালে তিনি আসাম প্রবেশ করেন। বাংলাদেশের এই ২৩ দিনের পদযাত্রায় বাংলাদেশ তাঁর প্রেমের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তিনি অকাতরে প্রেম বিলিয়ে গেছেন। পদযাত্রার পথে পথে প্রতিদিন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। কনকনে শীতের মধ্যেও শেষরাত্র থেকে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ মঙ্গলঘট, পুষ্পমাল্য, চন্দন-তিলক নিয়ে রাস্তার দুইধারে দাঁড়িয়ে মহান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে। অজানা-অচেনা কত লোক যে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে, কত লোক যে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে তার হিসেব নেই। তাদের কাছে তিনি তো অপরিচিত নয়, যুগ-যুগ ধ'রে ভারতে যে সন্ত-পরম্পরা চলে এসেছে তার সঙ্গে জনতার পরিচয় আছে। তারা চিনতে ভুল করেনি, যদিও তারা অনেকেই তাঁর ভাষা বুঝতে পারেনি,

তবুও ভাব বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। অনেক স্ত্রী-পুরুষ তো তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলেছে—

"বাবা দর্শন পাইলাম।"

ভক্তিতে বিগলিত সেই সব দৃশ্য যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা জানেন জড়বাদের প্রচণ্ড নিষ্পেষণে আজও ভক্ত-হৃদয় শুকিয়ে যায়নি—ফল্গু ধারার মতো আজও তা থেকে নিত্য প্রেমের নির্ঝর বয়ে চলেছে এবং ভারতীয় জীবনধারাকে সঞ্জীবিত করছে, পুষ্টির জোগান দিচ্ছে।

বাংলা দেশের এই ২৩ দিনের ভ্রমণে বিনোবাজী যেমন সকলকে প্রেম দিয়েছেন তেমনি নিজেও সকলের প্রেমলাভ করেছেন। তিনি বলেছেন, ছয় বছর আগে বাংলা দেশের যে অবস্থা ছিল এখন নিঃসন্দেহে তার উন্নতি হয়েছে।

এবার তাঁর প্রতিদিনকার সভায় হাজার হাজার লোক ভাষণ শুনতে এসেছে, দর্শন পেতে এসেছে।

এই ক'দিনে দশ হাজার কাঠা ভূমিদান তিনি পেয়েছেন, আট হাজার টাকার সর্বোদয় সাহিত্য বিক্রী হয়েছে এবং সর্বোদয়ের কাজের জন্য জনগণ তাঁর হাতে একত্রিশ হাজার দু'শ একান্ন টাকা অর্পণ ক'রে দিয়েছে।

৫ই মার্চ অতি প্রত্যূষে বাংলা ও আসামের সীমায় বক্সিরহাটে আসামের রাজ্যপাল, কংগ্রেসের সভাপতি ও সর্বোদয় কর্মিগণ বিনোবাজীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান। অশ্রুপূর্ণনয়নে পশ্চিম-বাংলার সর্বোদয় কর্মিগণ তাঁকে বিদায় দেন।

সমবেত পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের জনগণের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি বলেন—১৫০০ মাইল দূর থেকে আমি আসামে এসেছি এখানকার জনগণের আহ্বানে ও পণ্ডিত নেহেরুর অনুরোধে। এখানে আমি গুণ-দর্শন ও গুণ-বর্দ্ধনের চেষ্টাই করবো।

আসামের সর্বজনপূজ্য কবির নাম উল্লেখ ক'রে তিনি বললেন—

"যিনি অপরের কেবল দোষ দর্শন করেন তিনি অধম, যিনি অপরের দোষ ও গুণ উভয়ই দর্শন করেন তিনি মধ্যম, যিনি অপরের কেবল গুণই দর্শন করেন তিনি উত্তম, আর যিনি অপরের গুণ দর্শন ও তা বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন তিনি উত্তমোত্তম। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমি আসামে প্রবেশ করেছি।"

তিনি আরও বললেন—

"লোকে বলে আসাম একটি সমস্যাবহুল দেশ। আমি জিজ্ঞাসা করি, সমস্যা নেই কোথায়? সমস্যা তো জগতের সর্বত্র। সমস্যা জীবনেরই লক্ষণ। জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই এই সমস্যা চলে আসছে। রাম এলেন, কৃষ্ণ এলেন, বুদ্ধ এলেন তবুও সমস্যা রয়েই গেল। কাজেই আমি কোন সমস্যার সমাধান করার কথা বলি না।...

"আমি যা দেখব তা আমি অকপটে বলবো। আপনাদের দোষ যা দেখব তাও বলবো গুণের কথাও বলবো। দোষ দূর করা ও গুণবর্দ্ধন করাই আমার কাজ।"

এমনি ক'রে তিনি আসামে প্রবেশ করলেন। দাঙ্গা বিধ্বস্ত আসাম সন্ত ঋষির পুণ্য স্পর্শে শান্তি পূর্ণ আসামে পরিণত হোক।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেখানে সংখ্যাগুরুর সমমর্যাদায় বসবাস করার অধিকার লাভ করুক—পূজ্য বিনোবাজীর কাছে ভারতের জনগণ এইটুকুই আশা করেন। সারা ভারত সাগ্রহে তাঁর কর্ম-পদ্ধতির দিকে তাকিয়ে আছে।

তাঁর জয় মানে মানবতার জয়—প্রেমের জয়—নৈতিক শক্তির জয়।

আর তিনি যদি পরাজিত হন, তবে তা যে কত ভয়ঙ্কর হবে তা ভাবা যায় না। অখণ্ড ভারত হয়ত তাহ'লে খণ্ড-খণ্ড হয়ে যাবে।

ভারতের সর্বত্র সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় সংখ্যা-গুরুর চাপে নিষ্পেষিত হবে। আর পশু-শক্তির হাতে মানবতার কণ্ঠরোধ হবে।

বিনোবাজীর আসামে শান্তিমিশনের কাজের গুরুত্ব সেইজন্য অত্যন্ত গভীর। ঈশ্বর তাঁকে জয়ী করুন।

ভারতের শিক্ষাদাতা সংকটত্রাতা

যাত্রী মশাল নিয়ে চলেছেন, গ্রাম দান নিচ্ছেন, গ্রামের জমি গ্রামকে বিতরণ ক'রে দিচ্ছেন, গ্রামরাজ বসাচ্ছেন। সর্বোদয় তাঁর লক্ষ্য, অন্ত্যোদয় তাঁর লক্ষ্য, লক্ষ্য তাঁর ভারতের শান্তি, বিশ্বের শান্তি। আর সেই কথাই বলছেন, প্রচার করছেন গীতা, প্রচার করছেন মানবতার ধর্ম। উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে তিনি ভ্রমণ করেছেন, মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে তাঁর বাণী প্রচারিত হয়েছে, দক্ষিণ ভারতে তালিমনাদে তিনি ঘুরেছেন। কাশ্মীরের উত্তুঙ্গ চূড়ায়ও তিনি তাঁর বাণী প্রচার করেছেন। চম্বলে তাঁর বাণী পরস্বাপহারী নরহত্যাকারী দস্যুর অন্তরে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। শান্তি ও ক্রান্তির অগ্রদূত তিনি।

তাঁর ভাষণে মণিমুক্তা ছড়িয়ে পড়ছে, যে মণিমুক্তা আহরণ ক'রে নিচ্ছেন জনগণ—তাঁদের অন্তরের মণিকোঠায় শতনরী, সহস্রনরী করে গেঁথে রাখছেন। গ্রামময় ভারতকে এমনি ভাবেই তিনি জাগিয়ে তুলছেন, গ্রামময় ভারতের হৃদয় ও বুদ্ধি জেগে উঠছে, আর সেই বুদ্ধি শহরের বেনিয়া বুদ্ধিকেও প্রভাবিত করছে। শহরকে জয় ক'রে নিচ্ছে গ্রাম, ক্ষমতার মদমত্ত শক্তিতে নয়, প্রেমের শক্তিতে। এই শক্তির উদ্দীপনায়ই উড়িষ্যার এক কোরাপুট জেলার বনবাসী গ্রামীণ মানুষেরা গ্রামের পর গ্রাম দান করেছে। তিনি গেছেন জেলার পর জেলায়, সেখানে মানুষ শুনেছে তাঁর কথা। পদযাত্রা তাঁর ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতে—কন্যা কুমারিকা থেকে কাশ্মীর আবার গুজরাট থেকে আসাম। তিনি চলেছেন তো চলেইছেন। এক অভিনব পথের পাঁচালী সৃষ্টি করতে করতে এগিয়ে চলেছেন অভিযাত্রী। ভারতের পূর্বসাধক ছিলেন বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, বিবেকানন্দ আর গান্ধীজী—তিনি তাঁদেরই উত্তরসাধক, বংশধর। তিনি এই বিরাট মহাকাব্যের সর্বশেষ নায়ক।

তিনি চলেছেন পথে, অজ্ঞান মানুষকে জ্ঞান বিলিয়ে দিচ্ছেন, মালিক মানুষকে মালিকানা ত্যাগ করতে বলছেন, ভ্রান্ত মানুষকে সত্যের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।

বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ লাভ করেছেন, তাঁর মন্ত্র 'শরণং গচ্ছামি' অমর হয়ে আছে। শংকরের 'সোঽহম্' মন্ত্র আছে, তিনি নেই। শ্রীচৈতন্য নেই, তাঁর 'জীবে দয়া নামে রুচি' মন্ত্র রয়েছে ; স্বামী বিবেকানন্দ নেই, তাঁর 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার' মন্ত্রটি আছে। গান্ধীজী নেই, আছে তাঁর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বাণী। বিনোবাজী আজ আছেন আমাদের মধ্যে, আমরা শুনতে পাচ্ছি তাঁর অমৃতময়ী বাণী—'সমাজায় ইদং ন মম'। এ বাণী অমর, অজর, অব্যয়। এই বাণী চিরকাল থাকবে।

ভারতের সংকটকালের সর্বত্যাগী মহাপুরুষ তিনি। তাই তো ব্রিটিশ-রাজ গ্রামময় ভারতের যে অর্থনীতিক কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়ে নিজেদের লুণ্ঠনের রাজ্য গড়েছিল, আজ স্বাধীনতার দিনে তিনি সে-কাঠামো পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। স্বরাজ এসেছে, কিন্তু সে স্বরাজ শতকরা একশত জনের স্বরাজ নয়। বিনোবাজী তাই বলেন—"স্বরাজ-পার্শেল লণ্ডন থেকে এল, তার অনেকখানি মালই খালাস হ'ল নয়া দিল্লীতে ; তারপরে বাকিটুকু কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, লখনৌ বা পাটনায়—মাল গ্রামে আর পৌছতে পারল না।"

তাইত তাঁর এই কঠোর ব্রত। স্বরাজকে গ্রামে গ্রামে পৌছে দিতে হবে। তিনি বলেন,—

দেশে আর ভূমিহীন মানুষ থাকবে না। সবাইকে দিতে হবে জমি, পুরো কাজ দিতে হবে তাদের—যাতে তারা স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে।

ভূমির মালিকানা ঈশ্বরের—একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে।

এই যে মজুরী বা বেতনের বৈষম্য—এও দুর করতে হবে।

অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষমতা গ্রামের উপরেই বেশির ভাগ ন্যস্ত থাকবে, গ্রামবাসীকে এ অধিকার অর্জন করতে হবে।

তিনি বলেন—যত পার জমি আমাকে দাও, যেটুকু তোমার ভরণ-পোষণ আর নিজের চাষের জন্য লাগবে সেই টুকুই রেখে দাও। একথা বলেন তিনি যথেষ্ট জমির মালিকদের, যারা হাতীওয়ালা ব'লে খ্যাত।

যারা ঘোটকওয়ালা বা ধনী চাষী—তাদের বলেন, তোমার জমির এক ষষ্টাংশ আমাকে দাও, বাকিটা নিজে রাখ।

যারা ষাঁড়ওয়ালা বা সামান্য জমির মালিক, তাদের বলেন, যা পার দাও, কিন্তু দিতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তো আমি তোমাদের আরো বেশি দেব।

তারপর তিনি সবাইকে বলেন—

মালিকানার হাত তুলে নাও জমি থেকে, জমি তোমারও নয়, আমারও নয়। জমি মা, তিনি অন্নদায়িনী, তিনি সমৃদ্ধিদাত্রী। জমি ভগবানের, তিনিই জমির সৃষ্টিকর্তা। আকাশ, বাতাস, জল, আলোর মতো জমিও তাঁরই সম্পত্তি। যে এতে কাজ করবে, সে-ই তার ফল ভোগ করবে।

এ যুগ তো প্রেম, ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের যুগ। রায়ত আর ভূমি-দাসদের উপরে মালিকানা চিরদিনের মতো লুপ্ত হবে। ভারত এখন স্বাধীন। গরীবেরও সেরা-ধনীর মতো একটিই ভোট। গরীবই এখন প্রকৃত শাসক, তারা মন্ত্রীসভা এবং সবকিছুই ওলট-পালট ক'রে দিতে পারে। গরীবের যখন সর্বময় ক্ষমতা, মালিকানা তো মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে থাকতেই পারে না।

বিনোবাজী দান ভিখারীর মতো চান না। তিনি নূতন জীবনের দ্বার খুলে দিতে চান। তাঁর ভূদান যজ্ঞ শংকরাচার্যের সেই দানের কথা মনে করিয়ে দেয়। শংকর বলেছেন—দানং সংবিভাগঃ, দান মানে সমবণ্টন।

ভূমি যাতে ন্যায্যভাবে, সমভাবে বিতরিত হয়, তাই চান আচার্য বিনোবা। দাতা করবেন সেখানে তাঁর কর্তব্য। আর এ-দান নেওয়া হবে দরিদ্রনারায়ণের দাবী হিসেবে। সবাই এখানে কাজ করবে, একজনের লাভে অন্যকে খাটানো চলবে না। তাঁর এই দান এক যজ্ঞ।

তিনি এই যজ্ঞ করে সবাইকে এই শিক্ষা দিতে চান যে, ক্ষুধার্ত প্রতিবেশীর জন্য সকলেরই কর্তব্য আছে। দুর্দশাগ্রস্ত ভ্রাতাকে উপবাসী রেখে নিজের সুখভোগের কথা ভাবা মনুষ্যত্ব নয়।

তিনি চান—সমগ্র গ্রামবাসীই একটি পরিবারের মতো হয়ে বাস করুক। সকলকে তিনি সকলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করাতে চান। অর্থাৎ ব্যক্তির জীবন হবে সমাজের জন্য—এই তত্ব তিনি প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেকটি পরিবারে ফুটিয়ে তুলতে চান। ক্রমে-ক্রমে গ্রাম-সমাজ এক-হৃদয় হয়ে উঠবে এবং এই অনুভূতির বুনিয়াদের উপরই বিশ্ব-হৃদয় বা ব্যাপক আত্মার অনুভূতির উপলব্ধিও আসবে। তখনই গ'ড়ে উঠবে বিশ্বশান্তির-বিশ্ব মৈত্রীর ও বিশ্বানুভূতির সত্যিকারের ভিত।

বিনোবাজীর এই মহান্ প্রয়োগ দুনিয়ার আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অভিনব ও বিস্ময়কর প্রয়োগ। বিজ্ঞান আজ যতটা বিস্তার লাভ করেছে আধ্যাত্মিকতাকেও ততটাই বিস্তারিত করতে হবে, অধ্যাত্মবাদ আজ যদি কেবল ব্যক্তিগত উত্থান ও মুক্তির কথায় পড়ে থাকে ব্যাপকাত্মার উত্থান ও উপলব্ধির কথা চিন্তা না করে, তবে হৃদয় ও বুদ্ধির, অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতে বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। বিনোবা আজ এই ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে বাঁচাবার জন্য কঠোর তপস্যা করে যাচ্ছেন। এই দিক্ থেকে পূর্ব পূর্ব আচার্যদের চেয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্র যেমন বিশাল তেমনই দুরূহ। সেইজন্য তাঁর ধ্বনি—জয় জগৎ, জয় হিন্দ্ নয়।

ভূদান যজ্ঞের দান স্বার্থসিদ্ধির দান নয়, বিচ্ছিন্ন একক দানও নয়;

পরলোকের পরমধনের প্রতিশ্রুতিও সে দেয় না। এ দান চিরন্তন সমাজ দেবতার চরণে ব্যক্তির আত্মসমর্পণ। সমাজই ঈশ্বরের সাকার রূপ, দরিদ্রনারায়ণ তার প্রতীক। ফলের দিকে তাকিয়ে এদান নয়, এ এক আত্মোৎসর্গ, এ এক বিরাট চেতনার কাছে আত্মসমর্পণ।

বিনোবাজী ভারতের গ্রামে-গ্রামে দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে এই মহাদানের কথাই প্রতিদিন বলছেন।

তিনি বলছেন প্রেমদান কর, বুদ্ধি দান কর, শ্রম দান কর, ভূমি দান কর। তোমার কাছে যা আছে তা-ই তুমি সমাজের জন্য দান কর। তোমার বুদ্ধি দাও মানুষের সেবায়। তুমি যদি বিচারক হও, তো ন্যায়বিচার কর, যদি চিকিৎসক হও, তো মানুষের রোগ দূর করতে চেষ্টা কর। যদি শ্রমিক হও তো শ্রমদান কর, গরীব হ'লেও শ্রম দিয়ে তো তুমি সমাজের কল্যাণ করতে পার।

বিনোবাজী সম্পত্তিদানের কথায় বলেন—সম্পত্তি দান মানে আয়ের অংশ দান। জীবনভোর তা দিতে হবে সমাজকে।

সমাজ থেকেই সবকিছু আমরা তা পেয়েছি, সমাজের সেবায়ই লাগাতে হবে। এই তাঁর সম্পত্তি দান যজ্ঞের মূল কথা।

দাতাকে নিজের আয়ের অংশ জীবন ভোর দান করতে হবে। টাকা দাতার কাছেই থাকবে। তিনি সমাজের কল্যাণের কাজে তা ব্যয় করবেন। ব্যয়ের হিসেব নিয়মিত রাখবেন, নিয়মিত ভাবে তা বিনোবাজী বা তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তি কিম্বা সংস্থার কাছে দাখিল করবেন।

সম্পত্তি দান যজ্ঞের মূল কথা—সব সম্পত্তি ভগবানের। তুলসীদাস বলেছেন—'সব সম্পতি রঘুপতি কৈ আহী।' ভূদানে দাতা ভূমি দিয়েই খালাস, কিন্তু সম্পত্তি দানে দান ক'রেই খালাস হওয়া যায় না, দাতাকে তার হিসেবপত্রও রাখতে হয়।

বিনোবা বলেন—"ভূদান যেন মেয়ের বিয়ে দেওয়া, আর সম্পত্তি-দান যেন নিজে বিয়ে করা।" ভূদান ত্যাগ করায়, সম্পত্তিদান বাঁধে। কিন্তু এতো মুক্তির বাঁধন।

বিনোবাজী একদা উপনিষদের এক রাজার গল্প ক'রে বললেন—

রাজা বলেন, আমার রাজ্যে কোন চোর নেই, কৃপণও নেই। কৃপণ যে সে-ই তো চোরের জন্ম দেয়। চোরকে আমরা পুরি গারদে, কিন্তু তাদের জন্মদাতাকে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দিই। এমন কি তাঁরা সম্মান আর শ্রদ্ধাও পান সমাজে, এই কি ন্যায় বিচার?

"সম্পত্তি দান করে সম্পত্তিহীন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। এ এক এমন সরকার হবে, যার আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য চাইতে হবে না, নাসিকের মুদ্রাযন্ত্র থেকে কাগজের টাকা ছাপতে হবে না। প্রতিটি ভারতবাসীর ঘরই হবে তার ব্যাঙ্ক। মানুষ সমস্ত দুশ্চিন্তা সমস্ত উদ্বেগ সমাজের উপর ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্বেগ হয়ে জীবন যাপন করবে।"

তিনি বলেন—"আমার প্রথম ধাপ ভূদান, দ্বিতীয় ধাপ সম্পত্তিদান। আর তৃতীয় ধাপে আমি আরও অগ্রসর হব, সে হবে গরীবের স্বার্থে সব কিছু সমর্পণ, দারিদ্র্য গ্রহণ, যাতে সবাই সমভাবে ভগবানের ঐশ্বর্যের শরিক হওয়া যায়।"

বিনোবা বলেন,—"কেবল ভূদানই গ্রামকে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। জমির বণ্টন তো করতে হবেই। জমিতে চাষীকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপরে গ্রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। খাদির প্রবর্তন করতে হবে, গ্রামশিল্পের গুঞ্জন তুলতে হবে, নঈ তালিমের শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে। তবেই ভারতের গ্রামগুলি আবার স্বকীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে।"

বিনোবাজী চান জনশক্তির উদ্বোধন। তিনি বলেন, জনতা তো জনার্দন। জনার্দন ঘুমিয়ে আছেন, তাঁকে জাগাতে হবে।

তিনি সরকারের শক্তি দিয়ে ভূমিহীনকে ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান না। আইন যদি তৈরী করেন সরকার, তা করুন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তো তাতে সিদ্ধ হবে না। আইনে নানা প্রদেশে জমিদারীর উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু ভূমিহীন তো ভূমি পায়নি। তাছাড়া আইন পারে মালিকানার একটা সীমারেখা টানতে। মালিকানা-মুক্তি আইনের দ্বারা সম্ভবপর নয়। আইনের পথে গিয়ে দেখা যায় জমি পায় না জমিহীন চাষী, যদি বা পায়—সে অতি নিকৃষ্ট জমি। আর যদি বা আইন সব সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, ভূমিবণ্টন হয়তো হবে, ভূদান-যজ্ঞ তো সম্পূর্ণ হবে না। শুধু ভূমির হস্তান্তরই তো উদ্দেশ্য নয়, তিনি চান প্রেমের পথে ভূমির হস্তান্তর। সারা ভারতে একটি প্রেমময় সমাজ গ'ড়ে উঠুক এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা। বিনোবাজী বলেন,—মানুষের মনে এই শুভবুদ্ধি, এই পারস্পরিক বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে। মানুষ জানে, অন্তরে-অন্তরে জানে, আমাদের শুধু তাদের জাগিয়ে দিতে হবে।

তিনি বলেন,—"প্রত্যেক মানুষের মনের ভিতরটা সৎ। বাঁধা কপির উপরের পাতাটি খারাপ হলেও, ভিতরের পাতাগুলো বেশ পরিষ্কারই থাকে। তাই উপরের পরতে যদি পারিপার্শিকতার জন্য কিছুটা দোষ লেগেও যায় তবুও ভিতরের স্তরগুলো ভালই থাকে। মানুষেরও তাই।"

তিনি আরো বলেন,—"জনগণের শক্তি হিংসার শক্তি নয়। রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে তার বিরোধ নেই, কিন্তু বিভেদ আছে। আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যাব, এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করব, যাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার করার আর প্রয়োজনই হবে না। তাহ'লেই আমাদের সম্পর্কে একথা বলা চলবে, আমরা আমাদের স্বধর্ম সার্থক করেছি। অন্য দিকে, আমরা যদি রাষ্ট্র ক্ষমতার পিছনে ছুটে যাই, যদি এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের মনে দেখা দেয় যে, মানুষকে সেবা করবার সেইটিই একমাত্র পথ, তাহ'লে মানুষ আমাদের উপর যে আশা রাখে তা পূর্ণ করবার যোগ্যতা

আমরা হারিয়ে ফেলব এবং আমরা জনগণের সেবক না হয়ে বোঝা হয়েই দাঁড়াব।"

এই জনশক্তির জয়যাত্রাই তাদের শ্রেণীহীন, বর্ণহীন, শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজে পৌছে দেবে। ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন জনগণকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যম, এই আন্দোলনই জনশক্তির উদ্বোধন করবে।

তিনি জনশক্তি গ'ড়ে তোলবার দুটি উপায় বাতলে দিয়েছেন। একটি বিচার শাসন আর একটি কর্তৃত্ব বিভাজন।

দাদাভাই নৌরজী একদা ভারতের মুক্তির কামনার নাম দিয়েছিলেন স্বরাজ। লোকমান্য তিলক-বলেছিলেন—স্বরাজ আমাদেরর জন্মগত অধিকার, আমরা তা অবশ্যই পাব। তিনিই জনতাত্মার কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন সর্বপ্রথম। গান্ধীজী স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে তার অহিংস সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। ভগবানকে তিনি দরিদ্রনারায়ণ ব'লে পূজা করেছিলেন।

তিনি ইংরেজের স্বাধীনতা, রুশ স্বাধীনতা বা জার্মানীর স্বাধীনতার কথা বলেননি—তিনি চেয়েছিলেন ভারতের স্বরাজ—রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তার অর্থ বিশুদ্ধ নৈতিক ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষের সার্বভৌম অধিকার। আজ বিনোবাজী ভারতের মানুষের সেই আকাংক্ষাকে রূপ দিচ্ছেন ভূদান-গ্রামদান আন্দোলনের মাধ্যমে।

গ্রামে গ্রামে বিকেন্দ্রিত হবে ক্ষমতা।

সর্বসাধারণের মালিকানার উপরে ন্যস্ত হবে ভূমি, ধন সম্পত্তি।

মাহিনা বা মজুরির বৈষম্য থাকবে না।

এই গ্রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে বিনোবাজী চলেছেন ভারতের গ্রাম থেকে গ্রামে। ভূদানের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন স্বাধীন সার্বভৌম গ্রামরাজ্য। ভূদান গড়বে সেই গ্রামরাজ্যের বুনিয়াদ আর তার উপরে গড়ে উঠবে গ্রাম রাজ্যের ইমারৎ। কিন্তু একাজে

চাই জনশক্তির উদ্বোধন। গ্রামরাজ্যে থাকবেনা কোন অর্থনীতিক ও সামাজিক বৈষম্য। মানুষ সকলে সমান হবে না, কিন্তু আকাশ পাতাল প্রভেদও থাকবে না। হাতের আঙুল যেমন ছোট-বড়ো আছে অথচ মিলেমিশে সব কাজ করে, তেমনি হবে। আর সেই নয়া অর্থনীতিক ব্যবস্থায়, মানুষ শরীরশ্রমকে অবহেলা করবে না। টাকা বসবে না সর্বময় কর্তা হয়ে। যে মানুষ অন্তর দিয়ে সমাজের সেবা করবে, সে পাবে জীবনধারণের উপযোগী মজুরি। আর রাষ্ট্রপতির মজুরিও হবে তাঁর জীবন ধারণের উপযোগী। মূলত কৃষক আর মেথরের সঙ্গে তাঁর মজুরিরও তফাত থাকবে না।

চরখা কিম্বা তকলী চলবে ঘরে ঘরে, সেগুলি হবে বস্ত্রপূর্ণা—বস্ত্রের অভাব দূর করবে। কিন্তু অন্নপূর্ণা হবে না—অন্নের জন্য তার উপর নির্ভর করলে চলবে না, সেজন্য থাকবে চাষের জমি। ধরিত্রী মাতাই দেবেন অন্ন।

বিনোবাজী বলেন, যন্ত্রের তিনি বিরোধী নন। তবে কোন্ যন্ত্র ক্ষতিকারক আর কোন্ যন্ত্র উপকারী তার পরীক্ষা করতে হবে। সেই পরীক্ষায় যে যন্ত্র পাশ করবে, সে-যন্ত্র ব্যবহার করা হবে।

গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ ধর্ম প্রবর্তিত হবে। পঞ্চায়েৎ ধর্মের মর্ম এই—ভগবান পঞ্চজনের মুখ দিয়ে কথা বলেন। পঞ্চায়েতের রায় তাই ভগবানেরই রায়।

বিনোবা আরো বলেন, আপনারা যদি আমাকে এই সংকল্প সাধনে সাহায্য করেন তো আমরা সফল হবই, আমরা প্রতিষ্ঠা করব 'সাম্যযোগ'।

অশান্ত পৃথিবী। আণবিক বোমার হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে চারিদিকে। শিবিরে শিবিরে যুদ্ধবাজ শক্তি অপেক্ষমান। শান্তির জন্য সবাই উন্মুখ। এমন কি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন পর্যন্ত শান্তির জন্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে রাজী ছিলেন না। তিনিও বলেছিলেন—আজ পৃথিবীকে উদ্ধার করতে চাই নৈতিক শক্তি, চাই মানবতার ভক্ত সেবক।

বিনোবাজী এই নৈতিক শক্তিই সৃষ্টি করতে চান। তিনিও ক্রান্তিতে বিশ্বাসী। তাঁর সে-বিশ্বাস অহিংসার পরিশুদ্ধ। তিনি চান শান্তির পথে ক্রান্তি, রক্তবিপ্লব নয়। জগতে আজ সকলেই শান্তির কথা বলছেন, শান্তির জন্য চেষ্টাও চলছে। কিন্তু কোন শক্তিই অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানুষের নৈতিক শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না।

বিনোবাজী সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন—

যদি শান্তি চাও তো প্রথমে তোমার পড়শীকে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস হ'ল প্রাথমিক জিনিস। অস্ত্র-সমর্পণ, আত্মনির্ভরতা তারপরের কথা। আরও পরে আসবে অর্থনীতিক বিন্যাসের কথা। বিশ্বশান্তির এই হ'লা ভিত্তি। বিনোবাজী এই কথাই বোঝাতে চান জনগণকে। পারস্পরিক বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ ক'রে তিনি জনশক্তি গ'ড়ে তুলছেন। বর্তমান বিশ্বের শান্তির উদ্গাতা তিনি।

অধিক সংখ্যকের মঙ্গল বিনোবাজীর আদর্শ নয়, তাঁর আদর্শ সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল। এরই নাম সর্বোদয়। তিনি এই সর্বোদয় সমাজ সৃষ্টি করতে চান সমগ্র বিশ্বে।

এ সমাজের উপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না কোনো শক্তি। এখানে শুভচিন্তার শৃঙ্খলাই একমাত্র শৃঙ্খলা, বিবেকের শাসনই হবে একমাত্র অনুশাসন।

ব্যক্তির সর্বগুণ সমাজের জন্য উৎসর্গীত হবে, এবং সমাজকে ব্যক্তির বিকাশ সাধনের সুযোগ দিতে হবে।

সবরকম পেশার নৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক মূল্য হবে সমান। সাম্যযোগে যে-ই কাজ করবে, সে-ই জীবনধারণের অধিকারী হবে; বুদ্ধির শ্রম আর কায়িক শ্রমে সেখানে প্রভেদ থাকবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা সেখানে বিকেন্দ্রিত হবে, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রতি গ্রামই হবে এক-একটি রাষ্ট্র। কেন্দ্রের কর্তৃত্ব নামমাত্র থাকবে তাদের

উপর। তারপরে ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থা আসবে, যখন আর কোনো কর্তৃত্বেরই প্রয়োজন থাকবে না, তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

জাতিবিচার, বর্ণবিচার সাম্যযোগে থাকবে না। কোন পেশাই এখানে উচ্চ ব'লে গণ্য হবে না। ব্রাহ্মণের কাজের সঙ্গে মেথর বা ধাঙড়ের কাজের নৈতিক এবং আর্থিক মূল্যের তফাত থাকবে না। এই তো প্রকৃত স্বরাজ, সত্যিকারের স্বাধীনতা।

বিনোবাজী সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন—

"আমাকে আপনারা সাহায্য করুন। এই আমার আবেদন। আমি ক্রান্তির কাজ আরম্ভ করেছি। আমি চিন্তাধারায় বিপ্লব আনতে চাই, পন্থায়ও বিপ্লব আনতে চাই। ঋষিরা বলেন, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন তরুণ। নয়া পৃথিবী-সৃষ্টি করতে হবে, এক নতুন আদর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি তার দুয়ার খুলে দিয়েছি।"

আচার্য্য-বাণী

আদর্শ রাজ্য

আদর্শ রাজ্যের চারটি নিদর্শন ঃ—

১. যারা কর্মঠ, তারা জনগণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করবে।
২. ব্যক্তি হবে স্বাবলম্বী, পরস্পরকে সাহায্য করবে।
৩. তাদের সহযোগিতার ভিত্তি হবে অহিংসা।
৪. আবার যখনই অসহযোগ কিম্বা প্রতিরোধের প্রয়োজন দেখা দেবে—তখনও অহিংসাই হবে তাদের একমাত্র হাতিয়ার।

সেবা ধর্ম

বুদ্ধি বৃত্তির কাজ মানুষের জীবনকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা। শারীরিক শক্তির কাজ জনগণের মঙ্গলের জন্য সাহসিকতার সঙ্গে কার্য করা। ধনের কাজ উৎপাদন শক্তির উন্নতি এবং সমবন্টন। যে-কোন কর্মক্ষম মানুষ যদি এই শক্তির প্রয়োগ না করে তবে সে জনগণের কাছে এবং আইনের চক্ষেও অপরাধী হবে।

কৃপণতা ও চৌর্যবৃত্তি

চোর আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র নয়, কৃপণ আর মুনাফালোভীরও ঐ দশা হওয়া উচিত। চোর যেমন আইনের চক্ষে অপরাধী, তেমনি কৃপণকেও অপরাধী করতে হবে। যেমন সৎ পিতামাতা না ব'লে কিছু নেওয়াটা মস্ত অপরাধ ব'লে সন্তানকে শেখান, তেমনি তাঁদের এ কথাও শেখানো উচিত যে, কেউ অভাবে প'ড়ে চাইলে না দেওয়াটাও অপরাধ।

উপনিষদের রাজা অশ্বপতি তাঁর রাজ্যের মহিমা এক কথায় বর্ণনা করেছেন, আমার রাজ্যের মধ্যে চোরও নেই, কৃপণও নেই। দু'জনকেই

সমান পর্যায়ে ফেলে এই কথা এতে বিশুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রমতে বলা হয়েছে যে, কৃপণই চোরের জন্মদাতা, আর চোর কৃপণের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী।

বীর কে ?

সেই তো বীর যে, আত্মার শক্তিতে শক্তিমান এবং নির্ভাবনায় সমস্ত বিপদ আপদ বুক পেতে নেয়।

সেবক ও প্রভু

সরকারের লক্ষ টাকা ব্যয়ের দপ্তরগুলোকে বলা হয় সার্ভিসেস বা সেবা-দপ্তর। কিন্তু সেবার বহরে তাদের সেবাকর্মী সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী পান চার অঙ্কের মাইনে, আর যাদের সেবা করেন, সেই প্রভু সাধারণ মানুষদের রোজ আটআনাও রোজগার হয় না। যারা জাতির খাদ্য জোগায়, বস্ত্র জোগায়—তাদের এই অবস্থা !

সর্বোদয়ের চাবি

আমাদের কাছে একটি চাবি আছে, সর্বোদয়ের চাবি। এতে চারটি বিষয় আছে—

১। সর্বজনে প্রেম।

২। সাহস—আমি কাউকে ভয় করব না।

৩। পশ্চাত্তাপ—যা হবার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যা হবে তা ন্যায় ভাবে গ্রহণ করব।

৪। ক্ষমা—ন্যায়ের সঙ্গে ক্ষমাও থাকা দরকার—যেমন দুধের সঙ্গে থাকে মাখন।

মানব জীবনরূপ অট্টালিকা

আমি প্রায়ই বলি যে, প্রত্যেক মানুষের জীবন অট্টালিকার মত। প্রতি গৃহেই দরজা, জানালা ও দেওয়াল থাকে। গরীবের কুটীরেও অন্তত একটি দরজা থাকেই। ধনীর প্রাসাদে অসংখ্য দরজা জানালা থাকতে

পারে, কিন্তু সেখানেও দেওয়াল থাকে। দেওয়ালের পরিমাণ অট্টালিকায় কম-বেশি থাকতে পারে, কিন্তু প্রতি গৃহেরই অন্ততঃ একটি প্রবেশদ্বার থাকা চাই এবং সেই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হ'লে আমাদের দরজার দিকেই যেতে হবে। দেওয়ালের দিকে গেলে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হবো। মানুষের এই ত্রুটিগুলোই তার 'দেওয়াল,' আর গুণগুলো তার 'দরজা'। আমরা যদি লোকের দোষত্রুটির মধ্য দিয়ে কোন ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ করতে চাই তবে সংঘাত অনিবার্য। অপর পথে আমরা যদি গুণের রাস্তায় চলি, তবে আমরা ঐ ব্যক্তির জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারি এবং তার হৃদয়কেও স্পর্শ করতে পারি।

বন্দুক-প্রসঙ্গে

যেদিন বন্দুকের ব্যবহার আরম্ভ হ'ল সেইদিন থেকেই বন্দুকের সংখ্যা ছাগলের বংশের মতোই বাড়তে শুরু করল।

যেমন জিনিস হাতে থাকে, বুদ্ধিও তেমনই হয়। বন্দুক হাতে আসলেই মারবার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

শক্তির উৎস

পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই শক্তির উৎস।

হিন্দী ভাষা সম্পর্কে

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা, উহা অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত। কিন্তু কেবল অন্যে হিন্দী শিখলেই যথেষ্ট নয়, হিন্দী ভাষাভাষীদেরও অন্য ভাষা শিখে নেওয়া চাই।... এমনিভাবে আমরা মিলেমিশে কাজ করতে শিখলে, অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারব এবং এই পথেই ভারতের শক্তি অনেক বাড়বে।

হিংসার পথে শান্তি

হিংসার দ্বারা শান্তি স্থাপনের চেষ্টা বহুবার বিফল হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কেবল বিফলই হবে না সমগ্র মানবতাকেই নিষ্ফল করবে।

শান্তির ভিত্তি

বিশ্বাসই শান্তির ভিত্তি হতে পারে, অবিশ্বাস নয়।

শান্তির পথ দুর্বলের পথ নয়।

ক্রান্তি ও সরকার

ক্রান্তি আরম্ভ হ'লে তা নীচুতে আরম্ভ হ'য়ে উঁচুতে পৌঁছায়। সরকারের কাজ উপর থেকে নীচে আসে। সেইজন্য সরকারের দ্বারা ক্রান্তি হয় না। ক্রান্তির জন্য যে কাজ তা নীচু থেকে আরম্ভ হয়ে উপরের দিকে যাবে।

গ্রাম ও ভূমি

সমগ্র গ্রাম একটি পরিবার। সমস্ত ভূমিই গ্রামের। গ্রামের উন্নতি ও পরিবারের উন্নতি তখনি হওয়া সম্ভবপর, যখন গ্রামের লোক সকলে মিলে সমস্ত গ্রামকে এক-পরিবার ব'লে মনে করবে। একমাত্র গ্রামদানের দ্বারাই এ সম্ভবপর।

যদি গ্রামের সমস্ত ভূমি ও সম্পত্তি গ্রামেরই হয়ে যায়, তবে জগত তার নৈতিক মান উন্নয়নের একটি পথ খুঁজে পাবে।

এই বিজ্ঞানের যুগে আমরা খণ্ড খণ্ড হ'য়ে থাকতে পারি না।

সরকারী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে

কিছু লোক হাতের কাজ করবে আর কিছু লোক বুদ্ধির কাজ করবে—ভগবানের যদি এমনি ইচ্ছে হ'ত তবে ভগবান কিছু লোককে কেবল হাত দিতেন, আর কিছু লোককে কেবল বুদ্ধি দিতেন, হাত দিতেন না। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনা এমনই। সেইজন্য তা সকলের সুখ বিধান করতে পারে না। তা সকলের উন্নতি সাধন করতে সক্ষম নয়।

গণিতশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র

গণিতশাস্ত্র মনুষ্য সৃষ্ট নয়, গণিতশাস্ত্র নিয়ামক শাস্ত্র। কিন্তু অর্থশাস্ত্র তেমন নয়, কারণ তা মানুষ সৃষ্টি করেছে। এইজন্য তা মানুষের মাথার উপর চেপে বসতে পারে না। গণিতশাস্ত্র না মেনে পারা যায় না; অর্থশাস্ত্র তেমন নয়। আমরা অর্থশাস্ত্র রচনা করতে পারি, পরিবর্তনও করতে পারি।

গ্রামের কর্তৃত্ব

একটি সুতো দিয়ে পৃথক পৃথক সুগন্ধী ফুলের মালা তৈরী করা হয়। এখানে সুতোর কাজ বিভিন্ন ফুলকে গ্রথিত করা। ঐ সুতোর নিজের কোন সুগন্ধ নেই। ফুলের সুগন্ধে সুতো সুগন্ধিত হয়। তেমনি কর্তৃত্ব থাকবে গ্রামে আর কেন্দ্র তার কাছ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করবে।

গ্রামরাজ ও রামরাজ

যে-ক্ষেত্রে গ্রামের মতভেদ গ্রামেই সর্বসম্মতিতে মীমাংসিত হয়, সেখানে হয় গ্রামরাজ। যে-অবস্থায় গ্রামে মতভেদ বা বিবাদের উদ্ভবই হয় না তা হয়—'রামরাজ'।

সমাজ-দেবতা

যে-নৈবেদ্য এখন মন্দিরে সমর্পণ করা হয়, তা সরাসরি সমাজ-দেবতাকে সমর্পণ করতে হবে। এ কোন নতুন বিচার নয়, মূল প্রাচীন গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কিন্তু সে-যুগে এই আদর্শে সমাজ-গঠন করার চেষ্টা করলেও তা করা যেত না। এখন বিজ্ঞান সে-সুযোগ এনে দিয়েছে। এজন্য এখন ভগবৎ উপাসনার স্বরূপই বদলে যাবে।

দেশের দৃষ্টি

দেশের এক নম্বর দৃষ্টি কৃষির দিকে দেওয়া উচিত, এবং দু' নম্বর দৃষ্টি পল্লীশিল্পের দিকে, আজ দেশের পক্ষে এই দুটি জিনিষই অনিবার্য।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে গ্রামদান ও গ্রামীণ পরিকল্পনাই এক 'ডিফেন্স্ মেজার' (প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা)। একথা সকলের স্মরণ রাখা উচিত।

আত্মরক্ষার কথাও উঠবে বই কি, অন্তঃসংঘর্ষও হতে পারে। আবার বাইরের আক্রমণেরও আশঙ্কা আছে। তাই সবাই মিলে আত্মরক্ষা করতে হবে, শান্তি সেনা গড়ে তুলতে হবে। অহিংস অসহযোগ হবে তাদের অস্ত্র।

গ্রামরাজ্যে সমাজ হবে এক মহাধারা, একে অপরের দুঃখ আর সুখের অংশীদার হবে। যদি বিবাদ দেখা দেয়, নিজেরাই তা মিটিয়ে নেবে। যে-গ্রামে নিজেদের বিবাদ নিজেরা মিটিয়ে নেয়, সেইখানেই গ্রাম-রাজ্য বসেছে। যেখানে কোন বিবাদই দেখা দেয় না, সেখানে তো, রাম-রাজ্য।

বুদ্ধিজীবী ও মৃতজীবী

বুদ্ধিজীবী কে? একজন গৌতম বুদ্ধ, একজন সক্রেটিস্, একজন শংকরাচার্য বা জ্ঞানেশ্বর—চৈতন্যময় অন্তর-জীবনের (বুদ্ধি-জীবনের) জ্যোতিকে উদ্বোধিত ক'রে তোলেন। গীতায় বুদ্ধিগ্রাহ্য জীবনের অর্থ অতীন্দ্রিয় জীবন বলা হয়েছে। যে ইন্দ্রিয়ের দাস, যে দেহাসক্তিতে পূর্ণ, সে বুদ্ধিজীবী নয়। বুদ্ধির অধিপতি আত্মা, যে বুদ্ধি আত্মাকে পরিত্যাগ ক'রে দেহের দাসত্ব অবলম্বন করেছে, সে বুদ্ধি ব্যাভিচারী বুদ্ধি। এই ব্যাভিচারী বুদ্ধির জীবনই মরণ। আর যে ব্যক্তি এই ব্যভিচারী বুদ্ধি-দ্বারা জীবন ধারণ করে সে-ই মৃতজীবী, যারা কেবল শিক্ষকতারই উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকেন তাঁরাও বিশেষ অর্থে মৃতজীবী।

আচার্য

আচার্যের অর্থ আচারবান। যিনি নিজের আদর্শ-জীবনের প্রভাব দ্বারা সমাজের সকলকে অনুরূপ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেন, তিনিই আচার্য। এই আচার্যদের পুরুষকার দ্বারাই রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত হয়েছে।

বাঁচার শিক্ষা

জীবন জীনে দো।

জীবনের মধ্যেই জীবন যাপন করতে দাও।

কাজের মধ্য দিয়ে ব্যবহারিক জীবনে যেমন বহুলোকের শিক্ষালাভ হয়ে থাকে, তেমনিভাবেই ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষার সুযোগ পাওয়া চাই।

শিক্ষা কর্তব্য কর্মের আনুষঙ্গিক ফল। যিনি কর্তব্য অনুযায়ী কাজ করেন, তিনিই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শিক্ষালাভ ক'রে থাকেন।

পারিবারিক পাঠশালা

আমাদের পারিবারিক শিক্ষা এমন হোক যাতে ঘরে-ঘরে কার্যদক্ষ বুদ্ধিমান প্রেমিক মানুষ গ'ড়ে উঠতে পারে। আর শিক্ষা-ব্যবস্থাও এমন হোক যাতে বিদ্যালয়গুলি পারিবারিক পাঠশালাতে পরিণত হ'তে পারে।

প্রকৃত জ্ঞান

আমার আত্মা কখনও বিকৃত হয় না, কখনও মলিন হয় না। আমি এই বিকারশীল এবং মলিন শরীরকে বিকার-রহিত ও মালিন্যমুক্ত করতে পারি। আমার এই যে শক্তি রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি যখন স্থির-নিশ্চয় হব, তখনই আমার প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হবে।

শিক্ষা থেকে লাভ

এক সের উপ্ত শস্য যেমন পঁচিশ সের ফসল দেয়, তেমনি শিক্ষার্থীর চিত্তক্ষেত্রে উপ্ত চিন্তাবীজ দশ-বিশগুণ হয়ে প্রকাশিত হওয়া চাই।

বোধের দ্বারা ক্রান্তি

বোধের দ্বারাই ক্রান্তি সংঘটিত হয়। এই ক্রান্তি কোন রাষ্ট্রক্ষমতা দ্বারা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা

বুনিয়াদী শিক্ষা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। এতে সকল প্রকারের বিচার ধারা প্রবেশ করে, যেমন সকল নদী সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে মেশে। এই শিক্ষায় স্ত্রী পুরুষে পার্থক্য নেই, শহর ও গ্রামীণ শিক্ষার পার্থক্যও এ-শিক্ষা দ্বারা মিটে যায়।

প্রকৃতি গুরু

ছাত্রের চারদিক প্রকৃতি ঘিরে আছে। এই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আনন্দের উপলব্ধি এবং বিশুদ্ধ রসবোধের সাধনায় সিদ্ধ হওয়াই সুন্দর চিত্রকলার উদ্দেশ্য। ...প্রকৃতি কামধেনুর মতো, দুধ তো দেয়ই, দুধপান করার জন্য পাত্রও দেয়; কেবল হাত পেতে নেবার অপেক্ষা।

সঙ্গীত ও চিত্রকলার উদ্দেশ্য

বালকোবা কিছুদিন আগে জিজ্ঞেস করেছিল—

সঙ্গীত ও চিত্রকলার উদ্দেশ্য কি? আমি উত্তরে বলেছিলাম—এই সংসারে ভগবান শুধু তাঁর নাম ও রূপ প্রকাশ করেছেন, তাছাড়া তিনি তো অব্যক্ত হয়েই আছেন। সঙ্গীতের দ্বারা তাঁর নাম গান করা আর চিত্রকলার দ্বারা তাঁর রূপ চিত্রিত করা যায়।

ব্রহ্মবিদ্যা

ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তরুণদের আত্মজ্ঞান লাভ হবে, শরীর মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব করার শক্তি জন্মাবে। সব মানুষকে ভালবাসতে শিখবে, আত্মপরভেদ মিটে যাবে। ...ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নিরহঙ্কার থাকেন। তিনি বলেন—এই যে জমি, এই যে ঘর, এই যে সম্পত্তি—এসব সকলের।

যিনি ভ্রান্ত বিদ্যার অধিকারী তিনি বলেন—এসব আমার।

সম্পত্তি-সংগ্রহ

সম্পত্তির সংগ্রহ হোক, কিন্তু তা সমাজে হোক, ঘরে নয়।

বিস্থার লয়

বিস্থালয়ের দুই অর্থ হ'তে পারে। এক অর্থে বিস্থালয় সেইস্থান যেখানে বিস্থার লয় অর্থাৎ লোপ হয়। আর দ্বিতীয় অর্থে বিস্থালয় হ'ল এমন স্থান যা বিস্থার ঘর, আলয় বা বাসস্থান।

ইতিহাস

একটি গাছে যত পাতা আছে, তত রাজা এ পর্যন্ত হয়েছে। তাদের ইতিহাস প'ড়ে কি হবে? ইতিহাসের নামে জনগণের মনকে এক ছাঁচে ঢেলে গড়বার মতলবই সিদ্ধ হয়।

ইতিহাস একদেশদর্শী হয়। তার উপরে এ যে কতটা সত্য তাও বলা শক্ত। আর সত্য হ'লেও এর প্রভাব আমাদের উপর পড়বার কোন দরকার নেই। কারণ আমাদের জন্ম হয়েছে নব-সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের জন্য।

লিখিত ইতিহাস থেকে অলিখিত ইতিহাসের গুরুত্ব বেশি। ...মানবতার অভিব্যক্তি ইতিহাসে লেখা থাকে না। মানবতার উপর যত আঘাত হানা হয়েছে, সে সবের উল্লেখই ইতিহাসে পাওয়া যায়। এই কারণে মানব স্বভাবের জ্ঞান আমরা ইতিহাস থেকে পাইনে। মানব স্বভাব-বিরোধী ঘটনা ইতিহাসে সংগ্রহ করা হয় ব'লে ইতিহাসের যেখানেই দৃষ্টি দেওয়া যায়, সেখানেই কেবল হিংসার প্রাবল্য চোখে পড়ে।

বিস্থার্থী

বিস্থার্থীকে আমি নাগরিকরূপে দেখতে চাই, আর যিনি নাগরিকরূপে গণ্য তাঁকে বিস্থার্থী ব'লে মনে করতে চাই।

অহিংসার তিন অর্থ

প্রথম অর্থ—নির্ভয়, নির্ভর হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ—ভালবাসা ও সহযোগিতা করা। তৃতীয় অর্থ—গঠনমূলক কাজে শ্রদ্ধা রাখা।

'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লাইফ'

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াবার লক্ষণ কি রক্তশূন্যতা? একদিকে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে লিপস্টিকে ঠোঁট রাঙানো হচ্ছে। আমরা বাইরের রং বাড়াতে চাই নে, ভিতরের রং বাড়াতে চাই। প্রত্যেকের শরীর সতেজ হোক, সুন্দর সুঠাম হোক।

বুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্য

বাতির শিখা হ'ল বুদ্ধি আর তেল ব্রহ্মচর্য।

জনতার শক্তি

কেবল ভোটের অধিকার পেলে কি হবে? ভোট তো কেনাও যায়। সত্যিকারের শক্তি জনতার হাতে তখনি আসবে যখন কেন্দ্রীয় শক্তির কবল থেকে তারা মুক্তি পাবার চেষ্টা করবে এবং বিকেন্দ্রীত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে সক্ষম হবে।

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতার অর্থ—আমরা কারুর দ্বারা দমিত হব না, কাউকে দাবাবার চেষ্টাও করব না।

কর্মের সৌন্দর্য

তুষ্ট পরমেশ্বর কর্মের পিঠে যখন প্রেমের হাত বুলান তখনই তাতে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। সৌন্দর্য মানে পবিত্র শ্রমের প্রাপ্য ভগবৎপ্রসাদ।

পন্থা

কিছু লোক নিজেকে দক্ষিণপন্থী বলে, কিছু লোক বামপন্থী। আমি বলি, আমি আছি মাঝখানে। এরা আমার দুই হাত। আমার কর্তব্য হচ্ছে এদের মিলিয়ে দেওয়া এবং দু'জনের সহযোগিতায় কাজ করিয়ে নেওয়া।

ফুলের মাতা

ফুল তো খুব সুন্দর, কিন্তু ফুলের মাতা আরও সুন্দর। আমি ফুল চাই না। ফুল ভগবানকে অর্পণ করুন। আমাকে মাটি দিন।

গণরাজ্য ও গণতন্ত্র

গণরাজ্যে প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার থাকে। ...

গণতন্ত্রে বেশির ভাগ লোকের মতে রাজত্ব চলে। একদিকে একান্ন জন আর অপর দিকে উনপঞ্চাশজন হ'লেও একান্নজনেরই রাজত্ব চলে। আবার ঐ উনপঞ্চাশজনও নিজেদের মত সমর্থন করাবার চেষ্টা করেন। সফলকাম হ'লে তাঁদেরই রাজত্ব চলে।

পুরানো রাজ্য ব্যবস্থায় যেমন একজনের পর আর একজনের রাজত্ব হ'ত এরও তেমনি পরিবর্তন হ'তে থাকে। এইজন্য একে গণরাজ্য বলা যায় না।

অগ্রসর কে ?

কোন কোন লোকের ধারণা য়ুরোপের জনগণ এগিয়ে আছে, আমরা পিছিয়ে আছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেখানকার মজুরেরা সমস্ত দিন ক্লান্তির পর মদ খায়, আর আমাদের মজুরেরা কীর্তন করে। এ থেকে বুঝা যায় কারা এগিয়ে আছে।

সর্বোদয় সমাজের বাণী

আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র। এই সংসারে যে সামান্য কয়েকদিন আমাদের থাকতে হবে তা সকলের সেবায় ও সকলের ভালবাসা পাওয়ার চেষ্টায় ব্যয় করা উচিত। ...ভাই সব, সকলকে ভালবাস ও সকলের ভালবাসা অর্জন কর—ইহাই সর্বোদয় সমাজের বাণী।

আমরা সন্মার্গগামী

আমরা সকলকে সৎপথের কথা জানাই এবং বলি যে মালিকানাকে পাপ মনে ক'রে ফেলে দাও এবং প্রেমের সঙ্গে ভাই-ভাই হয়ে বাস কর।

রাজনীতি ও লোকনীতি

আমাদের রাজনীতি হবে বিশ্বব্যাপক রাজনীতি। তাকেই আমি বলি লোকনীতি। এ এমন ব্যাপক ও বিশাল রাজনীতি যাতে সমগ্র বিশ্ব এক এবং আমরা সকলে তার নাগরিক। এতে কেউ কারুর ওপর অনুশাসন চালাতে পারবে না, প্রত্যেকেরই অনুশাসন চলবে নিজের উপর। এরকম রাজনীতি ও এরকম সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। বিশ্বমানব গ'ড়ে তোলবার যে রাজনীতি তাকে রাজনীতি বললে ঠিক হবে না, তাহ'ল লোকনীতি।

সাহিত্য ও জীবন

শব্দ হ'ল সাহিত্য আর অর্থ হ'ল জীবন। এ দুটি একে অপরের অভাবে থাকতে পারে না। বাণীর প্রভাবে জীবনে দীপ্তি পরিব্যাপ্ত হয়। তাদের পরস্পরের সম্বন্ধ সূর্য ও কিরণের মতো। দু'-ই অভিন্ন, তবু কিরণই প্রচারকের কাজ করে। সাহিত্য জীবনের দীপ্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

জয় হিন্দ্ থেকে জয় জগৎ

জয়হিন্দ্ ধ্বনি পনের বছর পূর্বে আরম্ভ হয় এবং এই পনের বছরে 'জয়হিন্দ' ধ্বনি 'জয় জগৎ' এ পেঁাছে গেছে। জগতে বিচার দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছে, আর ধীরে ধীরে দেশের সীমাও ভেঙ্গে পড়বার মতো হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব এক পরিবারে পরিণত হবার ভাবনা দৃঢ় হচ্ছে।

'জয় জগৎ' ধ্বনি নহে, বরং সংস্কৃতে যাকে মন্ত্র বলা হয়, তাই। যেমন গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্র, তেমনি 'জয় জগৎ' ও একটি মন্ত্র।

জয়গ্রাম

জয় জগতের জন্য প্রথমে 'জয় গ্রাম' হওয়া দরকার। সারা গ্রাম যখন এক-হৃদয়, এক-পরিবার হবে, তখনই জয়গ্রাম হবে। এজন্য সেবা

করতে হবে গ্রামের আর কল্পনা রাখতে হবে জগতের। পা থাকবে মাটিতে আর দৃষ্টি থাকবে বিশাল আকাশে। যদি পায়ের মত চক্ষুও মাটিতে থাকে, তবে দৃষ্টি সংকুচিত হবে। তাহ'লে উন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য একদিকে গ্রামদান, গ্রাম স্বরাজ্য ও শান্তি সেনার কাজ চলতে থাকবে, আর অন্যদিকে বিশ্বশান্তির প্রক্রিয়াও শুরু হবে।

ধর্মের মূলতত্ত্ব

প্রাক্তন ধর্মমত এবং নীতিবাদ যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, তার কোনটিই সংশোধন না ক'রে গ্রহণ করা চলতে পারে না। এজন্য আমাদের নবধর্ম স্থষ্টি করতে হবে। সেই নূতন স্থষ্টির আধার হবে সত্য ও অহিংসা—ধর্মের মূলতত্ত্ব ইহাই।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

নয়া দিল্লীতে ব'সে ব'সে কর্তৃপক্ষ ভারতের পাঁচলক্ষ গ্রামের জন্য ভেবে মরছেন, তাঁরা মোটা মোটা কেতাব ঘাঁটছেন।...তাঁরা প্রত্যেক দেশ থেকে কতগুলো পরিকল্পনা নিয়ে এবং সেগুলো সংযোজনা ক'রে ভারতবর্ষের জন্য এক পরিকল্পনা খাড়া করছেন। তারপর রাজ্য সরকারগুলোর কাছে সেই খসড়া পরিকল্পনা পাঠাচ্ছেন। রাজ্য সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান যে, তাঁরা পরিকল্পনার এই অংশ কার্যকরী করতে পারবেন—এই অংশ পারবেন না। তারপর সেই প্ল্যানটি গ্রামগুলোর কাঁধে চাপানো হয়। জনসাধারণ সেই পরিকল্পনাটি অনুমোদন করুক বা না করুক, তাদের উপর তার দরুণ আরো নানা-রকমের করের বোঝা চাপানো হয়।

স্ত্রীলোকের অলঙ্কার

স্ত্রীলোকের হাতে অস্ত্র নেই, কিন্তু অলঙ্কার আছে, এই অলঙ্কারই তাঁদের ভীরু করে রেখেছে। আমি চাই যে মহিলাগণ যেন ভীরুতা বর্জন করেন। এজন্য তাঁদের অলংকার বর্জন করা উচিত।

আল্লা

আমি গীতা, জপুজী, কোরাণ শরীফ ও বাইবেল পড়ি। লোকে আমাকে বলে—তুমি একটি গ্রন্থ অনুসরণ কর। আমি বলি যে, আমি কেবল একটি গ্রন্থ ধ'রে থাকি না। আমি আল্লাকেই ধ'রে থাকি। সব বস্তুতেই তিনি আছেন। আমি ধর্মীয় দালালদের চক্রের মধ্যে পড়তে চাই না। আমি সোজা আল্লার কাছে পৌছুতে চাই।

আকাশের বাণী

আকাশ জ্ঞানীদের শব্দে ভরপূর। মূর্খদের আওয়াজ তাদের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত ও সমাধিস্থ হয়। আমাদের কানের ভিতর আর একটি কান আছে। সেই ভিতরের কানে আকাশের বাণী শুনা যায়,—যার ফলে অন্তর প্রসারিত হয়, মস্তিষ্ক সতেজ হয়।

আকাশ সেবন থেকে অনেক নূতন নূতন বিচার পাওয়া যায়।

মূঢ়শক্তি

ক্রুশ্চেভ বলেছেন যে, সমাজতন্ত্র যদি ভাল জিনিস হয় তবে জগতে তার প্রভাব আপনা আপনিই পড়বে, না পড়ে পারবে না। তিনি আজ সহ-অস্তিত্বের কথা বলছেন। তিনি কি উপনিষদ বা বাইবেল পড়েছেন? তিনি কেন এরকম মনে করলেন? তিনি দেখেছেন হিংসার শক্তি মুর্খের শক্তি। তার কারণ তা প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারে না যে, আমরা সজ্জনদের হাতেই থাকব, দুর্জনদের হাতে থাকব না। যদি বলতে পারে যে, আমি অমুকের হাতে থাকব, তবে আমিও হয় তো হিংসার পক্ষে যাব। কিন্তু তা মূর্খের শক্তি, যে-কোন লোকের কাছে চলে যেতে পারে। উহা ব্যাভিচারিণী, যে-কোন লোকের কাছে চলে যায়, চলে যেতে পারে। এ শিবশক্তি নয়, মূঢ়শক্তি।

বিজ্ঞান ও অহিংসা

বিজ্ঞান যদি অহিংসার সঙ্গে মিলে যায় তবে সৈন্যশক্তি ধ্বংস হতে পারে, বিজ্ঞানের অহিংসার সঙ্গে মিলে যাওয়া উচিত—তবেই জগতে শান্তি আসবে। আধ্যাত্মিকতা যেন জীবন-মোটরের ষ্টীয়ারিং হুইল আর বিজ্ঞান তার একসিলেরেটর—গতি নির্ধারক যন্ত্র। এই দুটি মিললে তবে জীবন মোটর অবাধে চলতে থাকবে।

রাষ্ট্র বিলুপ্তি

State with wither away—একথা বলেছেন মহামুনি মার্কস্। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু মার্কস্‌বাদীগণ আজ বলছেন যে, রাষ্ট্রের বিলোপ হবে কাল, আজ তাকে মজবুত করতে হবে। আমি বলি, রাষ্ট্র একদিন লোপ পাবেই, তবে তার বিলুপ্তির কাজ আজ থেকেই আরম্ভ হোক্।

জগত নির্মাণে তিনশক্তি

বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও সাহিত্য

একভাষা ও একলিপি

সমগ্র দেশকে একত্র করবার জন্য এও এক শক্তি। সকলের জন্য একটি সাধারণ ভাষা ও সকল ভাষার জন্য একটি সাধারণ লিপি। হিন্দীভাষা সকলের সাধারণ ভাষা আর নাগরী লিপি সকল ভাষার সাধারণলিপি হ'তে পারে।

বিশ্বমানব

ঋগ্বেদে বিশ্ব মানবের কথা বলা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের মানুষ এক, আমাদের 'বিশ্ব মানব' হতে হবে।

শিষ্যদের প্রতি

তোমরা জনগণের কাছে যাচ্ছ তাদের কাছে ভূমি চাইছ, যদি না দেয় বা সামান্য দেয়, তোমরা বিরক্ত হও।

তোমরা স্থির ক'রে নাও, এরা দুর্জন। আমি কিন্তু এই স্থির করি যে, আমরা নিজেরাই পবিত্র নই, ধীর নই, বিনয়ী নই।

যেমন ক'রে প্রার্থনা কর, তেমনি ক'রে চাইবে। দিতে না চাইলে তাও ভগবানের বিচার ব'লে মেনে নেবে।

দানের জন্য যে প্রতিবেশীর কাছে যাবে, তার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে চেষ্টা করবে। যদি তাঁকে দেখতে পাও, তাহ'লে তাঁর করুণায় সন্তুষ্ট থেকো। বাকী যা তা তো উপরি পাওনা।

মাটি শক্ত, যদি তাকে একটা বল দিয়ে আঘাত কর, বল ফিরে আসবে। কিন্তু মাটি লোহার আঘাত সইবে, লাঙলের আঘাতও সইবে। যদি তুমি ফাঁপা হও, বলের মত বাতাসে ভরা হও, মাটি তোমাকে ছুড়ে ফেলে দেবে।

শুভবুদ্ধির আলো

আলো অন্ধকার দেখতে পায় না; কারণ যার দিকে সে তাকায় তাই-ই আলোময় হয়ে যায়। তেমনি যে লোক ভাল, সে শুধু চারদিকে ভালই দেখে। সে সর্বত্র মঙ্গলই দেখতে চায়—তার জন্যে সে মঙ্গলের বীজ ছড়ায় এবং মঙ্গলেরই ফসল সংগ্রহ করে।

॥ সমাপ্ত ॥

লেখকের অন্যান্য বই

১। রাষ্ট্রভাষা প্রবেশ (৯ম সংস্করণ) ১·৮০
২। বংগলা ভাষা প্রবেশ (৩য় সংস্করণ) ১·৫০
৩। Learn Bengali yourself (2nd Edition) ২·৫০
৪। Learn Hindi yourself ৩·০০
৫। হিন্দী-বাংলা কথোপকথন শিক্ষা ·৮৫
৬। বাংলা-হিন্দী-ইংরাজী-ত্রিভাষা শব্দবোধ ·৮৫
৭। হিন্দীলিপি লিখন ও পঠন ·৪০
৮। রাষ্ট্রভাষা পাঠমালা (১ম—৫ম ভাগ)